

ফেলুদার রহস্য অ্যাড ভেঞ্জার



U have downloaded this book from

<http://doridro.com>

সোনার কেলা



ফেলুদা হাতের বইটা সশব্দে বন্ধ করে টক্ টক্ দুটো তুড়ি মেরে বিরাট হাই তুলে বলল, 'জিয়োমেট্রি।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এতক্ষণ কি তুমি জিয়োমেট্রির বই পড়ছিলে?'

বইটায় একটা খবরের কাগজের মলাট দেওয়া, তাই নামটা পড়তে পারিনি। এটা জানি যে, ওটা সিধু জ্যাঠার কাছ থেকে ধার করে আনা। সিধু জ্যাঠার খুব বই কেনার বাতিক, আর বইয়ের খুব যত্ন। সবাইকে বই ধার দেন না, তবে ফেলুদাকে দেন। ফেলুদাও সিধু জ্যাঠার বই বাড়িতে এনেই আগে সেটায় একটা মলাট দিয়ে নেয়।

একটা চারমিনার ধরিয়ে পর পর দুটো ধোঁয়ার রিং ছেড়ে ফেলুদা বলল, 'জিয়োমেট্রির বই বলে আলাদা কিছু নেই। যে-কোনো বই-ই জিয়োমেট্রির বই হতে পারে, কারণ সমস্ত জীবনটাই জিয়োমেট্রি। লক্ষ করলি নিশ্চয়ই—ধোঁয়ার রিংটা যখন আমার মুখ থেকে বেরোল তখন ওটা ছিল পার্ফেক্ট সার্কল। এই সার্কল জিনিসটা কীভাবে ছড়িয়ে আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সেটা একবার ভেবে দ্যাখ। তোর নিজের শরীরে দ্যাখ। তোর চোখের মণিটা একটা সার্কল। এই সার্কলের সাহায্যে তুই দেখতে পাচ্ছিস আকাশের চাঁদ তারা সূর্য। এগুলোকে ফ্ল্যাটভাবে কল্পনা করলে সার্কল, আসলে গোলক—এক-একটা সলিড বুদ্ধ, অর্থাৎ জিয়োমেট্রি। সৌরজগতের গ্রহগুলো আবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে এলিপটিক কার্ভে। এখানেও জিয়োমেট্রি। তুই যে একটু আগে জানালা দিয়ে থুক করে রাস্তায় থুতু ফেললি—অবিশ্যি ফেলা উচিত নয়—ওটা আনহাইজিনিক—নেক্সট টাইম ফেললে গাঁট্রা খাবি—ওই থুতুটা গেল কিন্তু একটা প্যারাবোলিক কার্ভে—জিয়োমেট্রি। মাকড়সার জাল জিনিসটা ভালো করে দেখেছিস কখনো? কী জটিল জিয়োমেট্রি রয়েছে তাতে জানিস? একটা সরল চতুষ্কোণ দিয়ে শুরু

U have downloaded this book from
<http://doridro.com>

হয় জাল বোনা। তারপর সেটাকে দুটো ডায়াগন্যাল টেনে চারটে ত্রিকোণে ভাগ করা হয়। তারপর সেই ডায়াগন্যাল দুটোর ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট থেকে শুরু হয় স্পাইর্যাল জাল; আর সেটাই ক্রমশ বাড়তে বাড়তে পুরো চতুষ্কোণটাকে ছেয়ে ফেলে। ব্যাপারটা এমন তাজ্জব যে ভাবলে কুলকিনারা পাবি না।...

রবিবারের সকাল। আমরা দু'জনে আমাদের বাড়ির একতলার বৈঠকখানায় বসে আছি। বাবা তাঁর রবিবারের নিয়ম মতো ছেলেবেলার বন্ধু সুবিমল কাকার বাড়িতে আড্ডা মারতে গেছেন। ফেলুদা সোফায় বসে তার পা দুটো সামনের নিচু টেবিলটার উপর তুলে দিয়েছে। আমি বসেছি তক্তপোশে, দেয়ালের সঙ্গে তাকিয়াটা লাগিয়ে তাতে ঠেস দিয়ে। আমার হাতে রয়েছে প্লাস্টিকের তৈরি একটা গোলকধাঁধার ভিতর ছোট্ট লোহার দানা। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে সেই দানাগুলোকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গোলকধাঁধার মাঝখানে আনবার চেষ্টা করছি। বুঝলাম যে, এ-ও একটা কঠিন জিয়োমেট্রির ব্যাপার।

কাছেই নীহার-পিণ্ডুদের বাড়িতে পুজোর প্যাভেলে 'কাটি পতঙ্গ' ছবির 'ইয়ে জো মহব্বৎ হায়' গানটা বাজছে। গোল গ্রামোফোন রেকর্ডে মিহি স্পাইর্যাল প্যাঁচ। অর্থাৎ জিয়োমেট্রি।

'কেবল চোখে দেখা যায় এমন জিনিস না,' ফেলুদা বলে চলল, 'মানুষের মনের ব্যাপারটাও জিয়োমেট্রির সাহায্যে বোঝানো যায়। সাদাসিধে মানুষের মন স্ট্রেট লাইনে চলে; প্যাঁচালো মন সাপের মতো ঠেকেবেঁকে চলে, আবার পাগলের মন যে কখন কোন দিকে চলবে তা কেউ বলতে পারে না—একেবারে জটিল জিয়োমেট্রি।'

ফেলুদার দৌলতে অবিশ্যি আমার সোজা-বাঁকা পাগল-ছাগল অনেক রকম লোকের সঙ্গেই আলাপ হবার সুযোগ হয়েছে। ফেলুদা নিজে কীরকম জ্যামিতিক নকশার মধ্যে পড়ে সেটাই এখন ভাবছিলাম। ওকে জিগ্যেস করাতে বলল, 'একটা মেনি-পয়েন্টেড স্টার বা জ্যোতিষ্ক বলতে পারিস।'

'আর আমি কি সেই জ্যোতিষ্কের স্যাটলাইট?'

'তুই একটা বিন্দু যেটাকে অভিধানে বলে পরিমাণহীন স্থাননির্দেশক চিহ্ন।'

আমার নিজেকে স্যাটলাইট বলে ভাবতে ভালোই লাগে। তবে সব সময় স্যাটলাইট থাকা সম্ভব হয় না এই যা আপসোস!। গ্যাংটকে গুগুগোলের ব্যাপারে অবিশ্যি ওর সঙ্গেই ছিলাম, কারণ তখন আমার ছুটি ছিল। তার পরের দুটো তদন্তের ব্যাপারে—একটা ধলভূমগড়ে খুন, আরেকটা পাটনায় একটা জাল উইলের ব্যাপারে—এই দুটোতে আমি বাদ পড়ে গেছি। এখন পুজোর ছুটি। ক'দিন থেকেই ভাবছি এই সময় একটা কেস এলে মন্দ হয় না, কিন্তু সেটা যে সত্যিই এসে পড়বে তা ভাবতে পারিনি। ফেলুদা অবিশ্যি বলে, যে-কোনো

জিনিস মনে মনে খুব জোর দিয়ে চাইলে অনেক সময় আপনা থেকেই এসে পড়ে মোট কথা আজ যেটা ঘটল সেটা আমার এই চাওয়ার ফল বলে ভেবে নিতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

পিণ্ডুদের বাড়ির লাউডস্পীকারে সবেমাত্র 'জনি মেরা নাম'-এর একটা গান দিয়েছে, ফেলুদা অ্যাশ-ট্রেতে ছাই ফেলে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড কাগজটা হাতে নিয়েছে, আমি একবার রাস্তায় বেরোব কিনা ভাবছি, এমন সময় আমাদের বাইরের দরজার কড়াটা কে যেন সজোরে নেড়ে উঠল। বাবা বারোটার আগে ফিরবেন না, তাই বুঝলাম এ অন্য লোক। দরজা খুলে দেখি ধুতি আর নীল সার্ট পরা একজন নিরীহ গোছের ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন।

'এ বাড়িতে প্রদোষ মিস্তির বলে কেউ থাকেন?'

লাউডস্পীকারের জন্য প্রশ্নটা করতে ভদ্রলোককে বেশ চাঁচাতে হল। নিজের নাম শুনে ফেলুদা সোফা ছেড়ে দরজার দিকে এগিয়ে এল।

'কোথেকে আসছেন?'

'আজ্ঞে, আমি আসছি সেই শ্যামবাজার থেকে।'

'ভেতরে আসুন।'

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে এলেন।

'বসুন। আমিই প্রদোষ মিস্তির।'

'ওঃ! আপনি এত ইয়ং সেটা আমি ঠিক...'

ভদ্রলোক গদগদ ভাব করে সোফার পাশের চেয়ারটায় বসে পড়লেন। তাঁর হাসি কিন্তু বসার পরেই মিলিয়ে গেল।

'কী ব্যাপার?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

ভদ্রলোক গলা খাঁকরিয়ে বললেন, 'কৈলাস চৌধুরী মশায়ের কাছ থেকে আপনার অনেক সুখ্যাতি শুনেছি। তিনি, মানে, আমার একজন খদ্দের আর কী। আমার নাম সুধীর ধর। আমার একটা বইয়ের দোকান আছে কলেজ স্ট্রীটে—ধর অ্যান্ড কোম্পানি—দেখে থাকতে পারেন হয়ত।'

ফেলুদা ছোট্ট করে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বুঝিয়ে দিল। তারপর আমায় বলল, 'তোপসে—জানলাটা বন্ধ করে দে তো।'

রাস্তার দিকের জানলাটা বন্ধ করতে গানের আওয়াজটা একটু কমল আর তার ফলে ভদ্রলোকও আরেকটু স্বাভাবিকভাবে বাকি কথাগুলো বলতে পারলেন।

'দিন সাতেক আগে খবরের কাগজে একটা খবর বেরিয়েছিল আমার ছেলের বিষয়ে—আপনি কি...,?'

'কী খবর বলুন তো?'

'ওই জাতিস্মর... মানে...'

‘ওই মুকুল বলে ছেলেটি?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ।’

‘খবরটা তাহলে সত্যি?’

‘মানে, ও আপনার যে ধরনের কথাবার্তা বলে তাতে তো...’

জাতিস্মর ব্যাপারটা আমি জানতাম। এক-একজন থাকে, তাদের নাকি হঠাৎ পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে যায়। তাদের বলে জাতিস্মর।

অবিশ্যি পূর্বজন্ম বলে কিছু আছে কিনা সেটা ফেলুদাও নাকি জানে না।

ফেলুদা চারমিনারের প্যাকেটটা খুলে ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিল। ভদ্রলোক একটু হেসে মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন তিনি খান না। তারপর বললেন, ‘বোধহয় মনে থাকবে, আমার এই ছেলেটি—আট বছর মাত্র বয়স—একটা জায়গার বর্ণনা দেয়, সেখানে নাকি সে গেছে। অথচ তেমন জায়গায়—আমার ছেলে তো দূরের কথা—আমার বা আমার পূর্বপুরুষদের কারুর কখনো যাবার সৌভাগ্য হয়নি। ছা-পোষা লোক, বুঝতেই তো পারছেন। দোকান দেখি, এদিকে বইয়ের বাজার দিনে দিনে—’

‘একটা দুর্গের কথা বলে না আপনার ছেলে?’ ফেলুদা ভদ্রলোককে কতকটা বাধা দিয়েই বলল।

‘আজ্ঞে হ্যাঁ। বলে—সোনার কেলা। তার মাথায় কামান বসানো আছে, যুদ্ধ হচ্ছে, লোক মরছে—সে সব নাকি সে দেখেছে। সে নিজে পাগড়ি পরে উটের পিঠে চড়ে বালির উপর বেড়াত। বালির কথা খুব বলে। হাতী ঘোড়া এসব অনেক কিছু বলে। আবার ময়ূরের কথা বলে। ওর হাতে একটা দাগ আছে কনুইয়ের কাছে। সেটা জন্মে অবধি আছে। আমরা তো জন্মদাগ বলেই জানতাম। ও বলে যে একবার নাকি একটা ময়ূর ওকে ঠোকর মেরেছিল, এটা নাকি সেই ঠোকরের দাগ।’

‘কোথায় থাকত সেটা পরিষ্কার ভাবে বলে?’

‘না—তবে তার বাড়ি থেকে নাকি সোনার কেলা দেখা যেত। মাঝে মাঝে কাগজে হিজিবিজি কাটে পেনসিল দিয়ে। বলে—এই দ্যাখো আমার বাড়ি। দেখে তো বাড়ির মতোই মনে হয়।’

‘বই-টইয়ের মধ্যে এমন কোনো জায়গার ছবি সে দেখে থাকতে পারে না? আপনাদের তো বইয়ের দোকান আছে...’

‘তা অবিশ্যি পারে। কিন্তু ছবির বই তো অনেক ছেলেই দেখে—তাই বলে কি তারা অষ্টপ্রহর এইভাবে কথা বলে? আপনি আমার ছেলেকে দেখেননি তাই। সত্যি বলতে কী—তার মনটাই যেন পড়ে আছে অন্য কোথাও। নিজের বাড়ি, নিজের ভাই-বোন বাপ-মা আত্মীয়স্বজন—এর কোনোটাই যেন তার আপন নয়।’

আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে কথাই বলে না সে ছেলে।’

‘কবে থেকে এইসব বলতে শুরু করেছে?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘তা মাস দুয়েক। ওই ছবি আঁকা দিয়েই শুরু জানেন। সেদিন খুব জল হয়েছে, আমি দোকান থেকে সবে ফিরিচি, আর সে আমায় এসে ছবি দেখাচ্ছে। গোড়ায় গা করিনি। ছেলেবয়সে তো কত রকম পাগলামিই থাকে! কানের কাছে ভ্যানর ভ্যানর করেছে, কান পাতিনি। আমার গিন্নীই প্রথম খেয়াল করে। তারপর ক’দিন ধরে তার কথা শুনে-টুনে, তার হাবভাব দেখে, আমার আরেক খন্দের



আছে—নাম শুনেছেন কি?—ডাক্তার হেমাঙ্গ হাজরা...’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ। প্যারাসাইকলজিস্ট। শুনেছি বইকি। তা তিনি তো আপনার ছেলেকে নিয়ে বাইরে কোথায় যাবেন বলে কাগজে বেরিয়েছে।’

‘যাবেন না, চলে গেছেন অলরেডি। তিন দিন এলেন আমার বাড়িতে। বললেন, এ তো রাজপুতানার কথা বলছে বলে মনে হচ্ছে। আমি বললুম হতে পারে। শেষটায় বললেন কী, তোমার ছেলে জাতিস্মর; এই জাতিস্মর নিয়ে আমি রিসার্চ করছি। আমি তোমার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে রাজপুতানায় যাবো। ঠিক জায়গায় গিয়ে ফেলতে পারলে তোমার ছেলের নিশ্চয়ই আরো অনেক কথা মনে পড়বে। তাতে আমার খুব সুবিধে হবে। ওর খরচাও আমি দেবো, খুব যত্নে রাখব, তোমার কিছু ভাবতে হবে না।’

‘তারপর?’ ফেলুদার গলার স্বর আর তার এগিয়ে বসার ভঙ্গিতে বুঝলাম সে বেশ ইন্টারেস্ট পেয়েছে।

‘তারপর আর কী—মুকুলকে নিয়ে চলে গেলেন?’

‘ছেলে আপত্তি করেনি?’

ভদ্রলোক একটা শুকনো হাসি হেসে বললেন, ‘কোথায় আছেন আপনি? যেই বললে সোনার কেলা দেখাবে অমনি এক কথায় রাজী হয়ে গেল। আপনি তো দেখেননি আমার ছেলেকে। ও, মানে, ঠিক আর পাঁচটা ছেলের মতো নয়। একেবারেই নয়। রাত তিনটের সময় উঠে বসে আছে। গুন-গুন করে গান গাইছে। ফিলিমের গানটান নয় মশাই—গেয়ো গেয়ো সুর—তবে বাংলাদেশের গাঁ নয় এটা জানি। আমি আবার একটু হারমোনিয়াম-টারমোনিয়াম বাজাই, বুঝেছেন...’

ভদ্রলোক এত কথা বললেন, কিন্তু ফেলুদার কাছে কেন এলেন, গোয়েন্দার কেন প্রয়োজন হতে পারে তাঁর, সেটা এখনো পর্যন্ত কিছুই বললেন না। হঠাৎ ফেলুদার একটা কথাতেই যেন ব্যাপারটা একটা অন্য চেহারা নিয়ে নিল।

‘আপনার ছেলে তো কী সব গুপ্তধনের কথা বলছে না?’

ভদ্রলোক হঠাৎ কেমন যেন মুষড়ে পড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘সেইখানেই তো গণ্ডগোল মশাই। আমায় বলেছে, কিন্তু কাগজের রিপোর্টারের সামনে কথাটা বলেই তো সর্বনাশ করেছে।’

‘কেন, সর্বনাশ বলছেন কেন?’ প্রশ্নটা করেই ফেলুদা আমাদের চাকর শ্রীনাথকে হাঁক দিয়ে চা আনতে বলল।

ভদ্রলোক বললেন, ‘কেন, সেটা বুঝতেই পারবেন। গতকাল সকালে তুফান এল্লপ্রেসে হেমান্দ্রবাবু আমার ছেলেকে নিয়ে রাজস্থান রওনা দিয়েছেন, আর—’

ফেলুদা বাধা দিয়ে বলল, ‘রাজস্থানের কোন জায়গায় গেছেন সেটা জানেন?’

সুধীরবাবু বললেন, ‘যোধপুর বলেই তো বললেন। বললেন, যখন বালির কথা বলছে, তখন উত্তর-পশ্চিম দিকটা দিয়ে শুরু করব। তা সে যাক গে—এখন কথা হচ্ছে কী, কালই সন্ধ্যায় আমাদের পাড়া থেকে একটি মুকুলের বয়সী ছেলেকে কে বা কারা যেন ধরে নিয়ে যায়।’

‘আপনার ধারণা তাকে আপনার ছেলে বলে ভুল করে?’

‘সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। দুজনের চেহারাতেও বেশ মিল আছে। শিবরতন মুখুজ্যে সলিসিটরের বাড়ি আছে আমাদের পাড়ায়, এটি সে বাড়িরই ছেলে, নাম নীলু, মুখুজ্যে মশায়ের নাতি। তাদের বাড়িতে, বুঝতেই পারছেন, কান্নাকাটি পড়ে গেসল। পুলিশ-টুলিস অনেক হাঙ্গামা। এখন অবিশ্যি তাকে ফিরে পেয়ে সব ঠাণ্ডা।’

‘এর মধ্যেই ফেরত দিয়ে দিল?’

‘আজই ভোরে। কিন্তু তাতে কী হল মশাই! আমার তো এদিকে মাথা খরাপ হয়ে গিয়েছে। যারা কিডন্যাপ করেছিল তারা তো বুঝেছে ভুল ছেলে এনেছে। কিন্তু সে ছেলে যে এদিকে তাদের বলে দিয়েছে যে মুকুল যোধপুর গেছে। এখন ধরুন যদি সে গুণ্ডারা গুপ্তধনের লোভে রাজস্থানে ধাওয়া করে তাহলে তো বুঝতেই পারছেন...’

ফেলুদা চুপ করে ভাবছে। তার কপালে চারটে চেউ-খেলানো দাগ। আমার বুকের ভিতর টিপটিপানি। সেটা আর কিছু নয়—এই সুযোগে যদি পুজোয় রাজস্থানটা ঘুরে আসা যায়, সেই আশায় আর কী। যোধপুর, চিতোর, উদয়পুর—নামগুলো শুনেছি কেবল, আর ইতিহাসে পড়েছি। আর অবনী ঠাকুরের রাজকাহিনীতে—যেটা আমার নরেশ কাকা আমাকে জন্মদিনে দেয়।

শ্রীনাথ চা এনে রাখল টেবিলের উপর। ফেলুদা সুধীরবাবুর দিকে একটা পেয়ালা এগিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক এবার একটা কিন্তু-কিন্তু ভাব করে বললেন, ‘আপনার বিষয়কেলাসবাবু যা বলেছিলেন, তাতে তো আপনাকে খুবই ইয়ে বলে মনে হয়। তাই ভাবছিলুম, যদি ধরুন, আপনি যদি রাজস্থানটা যেতে পারতেন। অবিশ্যি গিয়ে যদি দেখেন ওরা নিরাপদে আছে, তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু যদি ধরুন গিয়ে কিছু গোলমাল দেখেন! মানে, আপনার সাহসের কথাও অনেক শুনিচি। অবিশ্যি আমি নেহাত ছা-পোষা লোক। আপনার কাছে আসাটাই আমার পক্ষে একটা ধৃষ্টতা। কিন্তু যদি ধরুন আপনি যেতে রাজীই হন, তাহলে আপনার, মানে, যাতায়াতের খরচটা আমি আপনাকে নিশ্চয়ই দেবো।’

ফেলুদা কপালে ভুকুটি নিয়ে আরো অন্তত মিনিট খানেক ওইভাবে চুপ করে বসে রইল। তারপর বলল, ‘আমি কী স্থির করি সেটা আপনাকে কাল জানাব। আপনার ছেলের একটা ছবি বাড়িতে আছে নিশ্চয়ই? কাগজে যেটা বেরিয়েছিল সেটা তেমন স্পষ্ট নয়।’

সুধীরবাবু চায়ে একটা বড় রকম চুমুক দিয়ে বললেন, ‘আমার খুড়তুতো ভাই ছবিটাই তোলে—সে একটা তুলেছিল মুকুলের ছবি। আমার গিন্নীর কাছে আছে।’

‘ঠিক আছে।’

ভদ্রলোক বাকি চা-টা শেষ করে হাত থেকে কাপ রেখে উঠে পড়লেন।

‘আমার দোকানে অবিশ্যি টেলিফোন আছে—৩৪-৫১১৬। দশটা থেকে আমি দোকানে থাকি।’

‘আপনি এমনিতে থাকেন কোথায়?’

‘মেছোবাজার। সাত নম্বর মেছোবাজার স্ট্রীট। মেন রোডের উপরেই।’

ভদ্রলোক চলে যাবার পর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ফেলুদাকে বললাম, 'আচ্ছা, একটা কথার কিন্তু মানে বুঝতে পারলাম না !'

'প্যারাসাইকলজিস্ট তো ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ !'

ফেলুদা বলল, 'মানুষের মনের কতগুলো বিশেষ ধরনের ধোঁয়াটে দিক নিয়ে যারা চর্চা করে তাদের বলে প্যারাসাইকলজিস্ট । যেমন টেলিপ্যাথি । একজন লোক আরেকজন লোকের মনের কথা জেনে ফেলল । কিংবা নিজের মনের জোরে আরেকজনের চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দিল । অনেক সময় এমন হয় যে, তুই ঘরে বসে আছিস, হঠাৎ একজন পুরানো বন্ধুর কথা মনে পড়ল—আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সে বন্ধু তোকে টেলিফোন করল । প্যারাসাইকলজিস্টরা বলে যে ব্যাপারটা আকস্মিক নয় । এর পেছনে আছে টেলিপ্যাথি । আরো আছে । যেমন এক্সট্রা সেন্সরি-পারসেপশন—যাকে সংক্ষেপে বলে ই এস্ পি । ভবিষ্যতে কী ঘটতে যাচ্ছে সেটা আগে থেকে জেনে ফেলা । বা এই যে জাতিস্মর—পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে যাওয়া । এগুলো সবই হচ্ছে প্যারাসাইকলজিস্টদের গবেষণার বিষয় ।'

'এই হেমাঙ্গ হাজরা বুঝি খুব বড় প্যারাসাইকলজিস্ট ?'

'যে ক'টি আছেন, তাদের মধ্যে তো বেশ নামকরা বলেই জানি । বিদেশে-টিদেশে গেছেন, লেকচার-টেকচার দিয়েছেন, বোধ হয় একটা সোসাইটিও করেছেন ।'

'তোমার এসব জিনিসে বিশ্বাস হয় বুঝি ?'

'আমি যেটা বিশ্বাস করি সেটা হল এই যে, প্রমাণ ছাড়া কোনো জিনিস বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করাটা বোকামো । মনটা খোলা না রাখলে যে মানুষকে বোকা বনতে হয়, তার প্রমাণ ইতিহাসে অজস্র আছে । এককালে লোকে পৃথিবীটা ফ্ল্যাট বলে মনে করত জানিস ? আর ভাবত যে একটা জায়গায় গিয়ে পৃথিবীটা ফুরিয়ে গেছে, যার পর আর যাওয়া যায় না । কিন্তু ভূপর্যটক ম্যাগেলান যখন এক জায়গা থেকে রওনা হয়ে ভূপ্রদক্ষিণ করে আবার সেই জায়গাতেই ফিরে এলেন, তখন ফ্ল্যাটওয়ালারা সব মাথা চুলকোতে লাগলেন । আবার লোকে এটাও বিশ্বাস করেছে যে, পৃথিবীটাই স্থির, গ্রহ-নক্ষত্র-সূর্য তাকে প্রদক্ষিণ করছে । এক সময় একদল আবার ভাবত যে, আকাশটা বুঝি একটা বিরাট উপুড়-করা বাটি, যার গায়ে তারাগুলো সব মণিমুক্তোর মতো বসানো আছে । কোপারনিকাস প্রমাণ করলেন যে সূর্যই স্থির, আর সূর্যকে ঘিরেই পৃথিবী সমেত সৌরজগতের সব কিছু ঘুরছে । কিন্তু কোপারনিকাস ভেবেছিলেন যে, এই ঘোরাটা বুঝি বৃত্তাকারে । কেপলারএসে প্রমাণ করলেন ঘোরাটা আসলে এলিপটিক কক্ষে । তারপর আবার

গ্যালিলিও... যাক গে, তোকে এত জ্ঞান দিয়ে লাভ নেই । তোর নাবালক মস্তিষ্কে এসব ঢুকবে না ।'

ফেলুদা এতবড় গোয়েন্দা হয়েও বুঝতে পারল না যে আমাকে এখন খোঁচা-টোঁচা দিয়ে আমার ফুটিটা মাটি করা সহজ হবে না, কারণ আমার মন অলরেডি বলছে যে এবার ছুটিটা রাজস্থানেই কাটবে, আর নতুন দেশ দেখার সঙ্গে সঙ্গে চলবে নতুন রহস্যের জট ছাড়ানো । দেখা যাক আমার টেলিপ্যাথির দৌড় কদম্বর !

॥ ২ ॥

ফেলুদা যদিও একদিন সময় চেয়েছিল, সুধীরবাবু চলে যাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই ও রাজস্থান যাওয়া ঠিক করে ফেলল । কথাটা আমাকে বলতে আমি বললাম, 'যাচ্ছি তো ?'

ফেলুদা বলল, 'এক মিনিটের মধ্যে রাজস্থানের পাঁচটা কেলাওয়ালা শহরের নাম করতে পারলে চাপ আছে ।'

'যোধপুর, জয়পুর, চিতোর, বিকানির আর... আর... বুঁদির কেলা !'

রিস্টওয়াচের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে তড়াক করে সোফা থেকে উঠে পড়ে সাড়ে তিন মিনিটের মধ্যে পায়জামা পাঞ্জাবি ছেড়ে প্যান্ট-সার্ট পরে নিয়ে ফেলুদা বলল, 'আজ রোববার—দুটো পর্যন্ত ফেয়ারলি প্লেস খোলা—চট করে রিজার্ভেশনটা করে আসি ।'

একটার মধ্যে ফেলুদা কাজ সেরে বাড়ি ফিরে এসে প্রথমেই ডিরেক্টরি খুলে নম্বর বার করে ডক্টর হেমাঙ্গ হাজরার বাড়িতে একটা টেলিফোন করল । যে লোকটা নেই, তাকে ফোন করা হচ্ছে কেন জিজ্ঞেস করাতে বলল, 'সুধীরবাবু লোকটা সত্যি কথা বলেছে কিনা সেটার প্রমাণের দরকার ছিল ।'

'পেলে প্রমাণ ?'

'হ্যাঁ !'

দুপুরবেলাটা ফেলুদা বুকুর তলায় বালিশ নিয়ে উপুড় হয়ে তার খাটে শুয়ে এক সঙ্গে পাঁচখানা বই ঘাঁটাঘাঁটি করল । দুটো বই পেলিক্যানের—সেগুলো প্যারাসাইকলজি সম্বন্ধে । এগুলো নাকি ফেলুদা তার কলেজের পুরানো বন্ধু অনুতোষ বটব্যালের কাছ থেকে ধার করে এনেছে । অন্য তিনটির মধ্যে একটা হল টড সাহেবের লেখা রাজস্থানের বই, আরেকটা হল গাইড টু ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, বার্মা অ্যান্ড সিলোন, আর আরেকটা হল ভারতবর্ষের ইতিহাস, কার লেখা ভুলে গেছি ।

বিকলে চা খাবার পর ফেলুদা বলল, 'তৈরি হয়ে নে। একবার সুধীরবাবুর বাড়ি যাওয়া দরকার।'

এখানে বলে রাখি যে, বাবাকে রাজস্থান যাচ্ছি বলাতে উনি খুব খুশি হলেন। উনি নিজে দাদুর সঙ্গে ছেলেবেলায় দু'বার রাজস্থান ঘুরে এসেছেন। বললেন, 'চিতোরটা মিস করিস না। চিতোরের কেলা দেখলে গায়ে কাঁটা দেয়। রাজপুত্রা যে কত বড় বীর যোদ্ধা ছিল সেটা তাদের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।'

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ আমরা সাত নম্বর মেছোবাজার স্ট্রীটে গিয়ে হাজির হলাম। ফেলুদা যেতে রাজী হয়েছে শুনে সুধীরবাবুর মুখে আবার সেই গদগদ ভাব ফুটে উঠল।

'কী বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো আপনাকে তা বুঝতে পারছি না।'

ফেলুদা বলল, 'এখনো সেটার প্রয়োজন আসেনি সুধীরবাবু। এখন ধরে নিন আমরা এমনি বেড়াতে যাচ্ছি, আপনার অনুরোধে যাচ্ছি না!'

'সময় খুব কম। আমরা কালই রওনা হচ্ছি। কিন্তু তার আগে দুটো কাজ আছে। এক হচ্ছে—আপনার ছেলের একটা ছবি চাই। আর দুই—যদি সম্ভব হয়, তাহলে সেই নীলু ছেলেটির সঙ্গে একবার দেখা করব—সেই যাকে কিডন্যাপ করেছিল।'

সুধীরবাবু বললেন, 'এমনিতে সে ছেলে বিকলে বাড়িতে থাকে না। তাছাড়া পুজোর বাজার, বুঝতেই তো পারছেন। তবে আজ বোধহয় তাকে আর বেরোতে দেবে না। দাঁড়ান, আগে ছবিটা এনে দিই আপনাকে।'

সুধীরবাবুর বাড়ির তিনটে বাড়ি পরে একই ফুটপাথে হল সলিসিটার শিবরতন মুখার্জির বাড়ি। ভদ্রলোক বাড়িতেই ছিলেন; সামনে বৈঠকখানায় তক্তপোশে একজন মুখে শ্বেতীর দাগওয়ালা লোকের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছিলেন। সুধীরবাবুর কথা শুনে বললেন, 'আপনার ছেলের দৌলতে আমার নাতিরও যে খ্যাতি বেড়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি।—বসুন আপনারা। মনোহর!'

চাকর এলে পর শিবরতনবাবু বললেন, 'ঐদের তিনজনের জন্য চা কর। আর দেখ তো নীলু আছে কিনা—বল আমি ডাকছি।'

আমরা একটা বড় টেবিলের পাশে তিনটে চেয়ারে বসেছিলাম। আমাদের দু'পাশের দেয়ালের সামনে সিলিং পর্যন্ত উঁচু আলমারি মোটা মোটা বইয়ে ঠাসা। ফেলুদা বলে যে আইনের ব্যাপারে যত বই লাগে, অন্য কিছুতেই নাকি তত লাগে না।

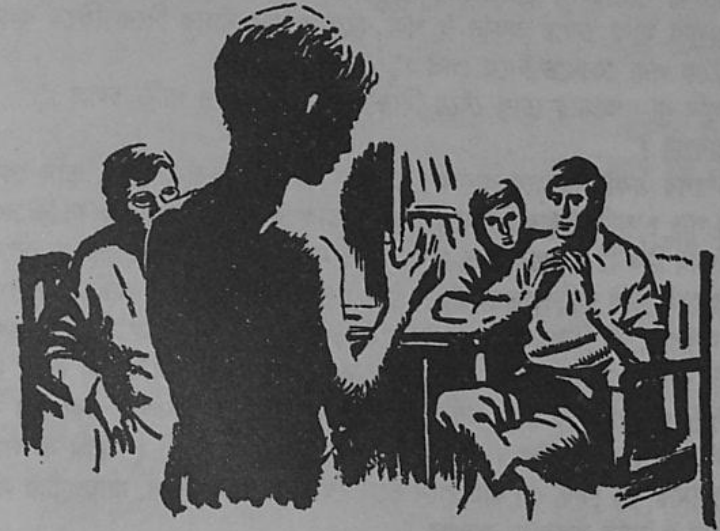
আমি এই ফাঁকে একবার মুকুলের ফোটোটা ভালো করে দেখে নিলাম। বাড়ির ছাতে তোলা ছবি। ছেলেটি রোদে ভুরু কঁচকে গম্ভীর মুখ করে সোজা ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

শিবরতনবাবু বললেন, 'নীলুকে আমরাও অনেক কিছু জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করেছি। গোড়ার দিকে তো কথাই বলছিল না; নার্ভাস শকে গুম মেরে গিয়েছিল। বিকলের দিক থেকে একটু নরম্যাল মনে হচ্ছে।'

'পুলিসে খবর দেওয়া হয়নি?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'ধরে নিয়ে যাবার পর দেওয়া হয়েছিল। তবে তারা কিছু করবার আগেই তো দেখছি ফেরত এসে গেল।'

এইবার নীলু ছেলেটি এসে চাকরের সঙ্গে ঘরে ঢুকল। সত্যিই, ছবিতে মুকুলের যে চেহারা দেখছি, তার সঙ্গে বেশ মিল আছে। দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে



ছেলেটির এখনো ভয় কাটেনি। সে সন্দেহের ভাব করে আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছে।

ফেলুদা হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, 'তোমার হাতে বুঝি ব্যথা পেয়েছ নীলু?'

শিবরতন কী জানি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ফেলুদা তাঁকে ইশারা করে থামিয়ে দিল। নীলু নিজেই প্রশ্নটার জবাব দিল—

'ওরা যখন আমার হাত ধরে টানল, তখন আমার হাতে ভীষণ জ্বালা করল।' কবজির কিছু ওপরে কাটা দাগটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

ফেলুদা বলল, 'ওরা বলছ—তার মানে একজনের বেশি লোক ছিল বুঝি?'

'একজন লোক আমার চোখটা আর মুখটা চেপে ধরলে, আর কোলে তুলে

নিয়ে গাড়িতে উঠল। আর আরেকজন তো গাড়ি চালালো। আমার খুব ভয় করছিল।

‘আমারও ভয় করত’, ফেলুদা বলল, ‘তোমার চেয়েও বেশি। তুমি খুব সাহসী। তা তোমাকে যখন ধরল, তখন তুমি কী করছিলে?’

‘আমি ঠাকুর দেখতে যাচ্ছিলাম। মতিদের বাড়িতে পূজা হয়। মতি আমার ক্লাসে পড়ে।’

‘রাস্তায় তখন বেশি লোকজন ছিল না বুঝি?’

শিবরতনবাবু বললেন, ‘এদিকটায় পরশু একটা গোলমাল হয়ে গেছে। বোম্বাটোমা পড়েছিল। তাই কাল সন্দের দিকে লোক চলাচলটা একটু কমেছে।’

ফেলুদা মাথা নেড়ে একটা হুঁ শব্দ করে আবার নীলুর দিকে ফিরে বলল, ‘তোমাকে ওরা কোথায় নিয়ে গেল?’

‘জানি না। আমার চোখ বেঁধে দিয়েছিল। অনেকক্ষণ গাড়ি চলল।’

‘তারপর?’

‘তারপর একটা চেয়ারে বসাল। তারপর বসিয়ে একজন বলল, তুমি কোন ইন্সুলে পড়? আমি ইন্সুলের নাম বললাম। তারপর বলল, ‘তোমাকে যা জিজ্ঞেস করছি তার ঠিক ঠিক উত্তর দাও, তাহলে তোমার ইন্সুলের সামনে নামিয়ে দেবো, আর তাহলে তুমি বাড়ি যেতে পারবে তো? আমি বললাম, হ্যাঁ পারব। তারপর আমি বললাম, কী জিজ্ঞেস করবে তাড়াতাড়ি কর, দেরি হলে মা বকবে। তখন লোকটা বলল, সোনার কেলা কোথায়? তখন আমি বললাম, আমি জানি না, আর মুকুলও জানে না; ও খালি সোনার কেলা জানে। তখন ওরা সব কী ইংরিজিতে বলল, মিসটেক। তারপর বলল, তোমার নাম কী? আমি বললাম, মুকুল আমার বন্ধু কিন্তু সে রাজস্থানে চলে গেছে। তখন বলল, জায়গাটার নাম তুমি জান? আমি বললাম, জয়পুর।’

‘জয়পুর বললে?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘না না, যোধপুর। হ্যাঁ, যোধপুর বললাম।’

নীলু একটু থামল। আমরাও সকলে চুপ। চাকর চা আর মিষ্টি এনে রেখে গেছে, কিন্তু কারুরই সে দিকে দৃষ্টি নেই। ফেলুদা বলল, ‘আর কিছু মনে পড়ছে?’

নীলু একটু ভেবে বলল, ‘একজন লোক সিগারেট খাচ্ছিল। না না, চুরুট।’

‘তুমি চুরুটের গন্ধ জান?’

‘আমার মেসোমশাই খায় যে।’

‘সেই রাতে তুমি ঘুমোলে কোথায়?’ ফেলুদা প্রশ্ন করল।

নীলু বলল, ‘জানি না তো।’

‘জান না? জান না মানে?’

‘আমাকে একবার বলল, দুধ খাও। তারপর একটা খুব ভারী গলাসে দুধ দিল আর আমি খেলাম। আর তারপর তো আমি ঘুমিয়ে পড়লাম বসে বসেই।’

‘তারপর? ঘুম ভাঙল কখন?’

নীলু একটু বেচারা-বেচারা ভাব করে শিবরতনবাবুর দিকে তাকাল। শিবরতনবাবু হেসে বললেন, ‘ওর ঘুম ভাঙে বাড়িতে আসার পর। ওকে ওর স্কুলের সামনে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। তখন ও ঘুমন্ত। বোধহয় ভোর রাত্তির দিকে। তারপর আমাদের বাড়িতে যে লোকটা খবরের কাগজ দেয়, সে ভোরে সাইকেল করে ওখান দিয়ে যাবার সময় দেখতে পায়। ও-ই এসে আমাদের বাড়িতে খবর দেয়। তারপর আমি আর আমার ছেলে গিয়ে ওকে নিয়ে আসি। ডাক্তার বললে যে, কোনো ঘুমের ওষুধ একটু হেভি ডোজে খাইয়ে দিয়েছিল আর কি।’

ফেলুদা গভীর। চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে চাপা গলায় একবার শুধু বলল, ‘স্কাউন্ড্রেলস্!’ তারপর নীলুকে পিঠ চাপড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘থ্যাঙ্ক ইউ নীলুবাবু। এবার তুমি যেতে পার।’

শিবরতনবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় বেরোবার পর সুধীরবাবু বললেন, ‘চিন্তার কারণ আছে বলে মনে করছেন কি?’

ফেলুদা বলল, ‘কয়েকজন অত্যন্ত লোভী এবং বেপরোয়া লোক যে আপনার ছেলের ব্যাপারে একটু বেশি মাত্রায় কৌতূহলী হয়ে পড়েছে সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তবে তারা রাজস্থান পর্যন্ত যাবে কিনা সেটা বলা মুশকিল। ভালো কথা, আপনি বরং আমাকে একটা চিঠি দিয়ে দিন। ডক্টর হাজরা তো আর আমাকে চেনেন না। আপনি আমাকে ইনট্রোডিউস করে দিলে সুবিধে হবে।’

চিঠিটা দেবার পর সুধীরবাবু আরেকবার ফেলুদাকে রাজস্থানের ভাড়াটা অফার করলেন। ফেলুদা তাতে কানই দিল না। বাসস্টপের কাছাকাছি এসে ভদ্রলোক বললেন, ‘গিয়ে অন্তত একটা খবর দেবেন স্যার। বড্ড চিন্তায় থাকব। অবিশ্যি ডাক্তারবাবু লিখবেন চিঠি, নিজেই কথা দিয়েছেন। কিন্তু যদি নাও লেখেন, আপনি অন্তত একখানা...’

বাড়িতে ফিরে এসে গোছগাছ করার আগে ফেলুদা তার বিখ্যাত নীল খাতা ভলিউম সিন্ধু খুলে খাটে বসে বলল, ‘কতগুলো তারিখের হিসেব বল তো দেখি—লিখে নি। ডক্টর হাজরা মুকুলকে নিয়ে রাজস্থান রওনা হয়েছেন কবে?’

‘গতকাল ৯ই অক্টোবর।’

‘নীলুকে কিডন্যাপ করেছিল কবে?’

‘কালই। সন্কেবেলা।’

‘ফেরত দিয়েছে আজ সকালে, অর্থাৎ ১০ই। আমরা রওনা হচ্ছি কাল ১১ই সকালে। আগ্রা পৌঁছাব ১২ই। সেদিনই বিকেলে ট্রেনে চড়ে সেদিনই রাতে পৌঁছাব বান্দিকুই। বান্দিকুই থেকে রাত ১২টায় গাড়ি, মারওয়াড় পৌঁছাব সেদিনই—অর্থাৎ ১৩ই সন্ধ্যাবেলা, ১৩ই...১৩ই...’

এইভাবে ফেলুদা কিছুক্ষণ আপন মনে বিড়বিড় করে কী জানি ক্যালকুলেট করল। তারপর বলল, ‘জিয়োমেট্রি। এখানেও জিয়োমেট্রি। একটা বিন্দু—সেই বিন্দুর দিকে কনভার্জ করছে কতগুলো লাইন। জিয়োমেট্রি...’

॥ ৩ ॥

আমরা আধঘণ্টা হল আগ্রা ফোর্ট স্টেশন থেকে বান্দিকুইয়ের ট্রেনে চেপেছি। আগ্রায় হাতে তিন ঘণ্টা সময় ছিল। সেই ফাঁকে দশ বছর বাদে আরেকবার তাজমহলটা দেখে নিলাম, আর ফেলুদাও আমাকে তাজের জিয়োমেট্রি সম্পর্কে একটা ছোটখাট লেকচার দিয়ে দিল।

গতকাল কলকাতা ছাড়ার আগে একটা জরুরী কাজ সেরে নিয়েছিলাম—সেটার কথা এখানে বলে রাখি। তুফান এক্সপ্রেস ছাড়বে সকাল সাড়ে নটায়, তাই আমরা ঘুম থেকে উঠেছিলাম খুব ভোরে। ছ’টা নাগাদ চা খাবার পর ফেলুদা বলল, ‘একবার তোর সিধু জ্যাঠার ওখানে টু মারতে হচ্ছে। ভদ্রলোকের কাছ থেকে কিছু তথ্য জোগাড় করতে পারলে সুবিধে হবে।’

সিধু জ্যাঠা থাকেন সদরী শঙ্কর রোডে। আমাদের তারা রোড থেকে হেঁটে যেতে লাগে পাঁচ মিনিট। এখানে বলে রাখি, সিধু জ্যাঠা জীবনে নানারকম ব্যবসা করে অনেক টাকা রোজগারও করেছেন, আবার অনেক টাকা খুইয়েছেন। আজকাল আর কাজকর্ম করেন না। বইয়ের ভীষণ শখ, তাই গুচ্ছের বই কেনেন, কিছুটা সময় সেগুলো পড়েন, বাকি সময়টা একা একা বই দেখে দাবা খেলেন, আর খাওয়া নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেন। এক্সপেরিমেন্টটা হচ্ছে এক খাবারের সঙ্গে আরেক খাবার মিশিয়ে খাওয়া। উনি বলেন দইয়ের সঙ্গে অমলেট মেখে খেতে নাকি অমৃতের মতো লাগে। আসলে সম্পর্কে আমাদের কিছুই হন না উনি। আমাদের যে পেতুক গ্রাম (আমি যাইনি কক্ষনো) উনি সে গ্রামেরই লোক, আর আমাদের বাড়ির পাশেই গুঁর বাড়ি ছিল। উনি তাই আমার বাবার দাদা আর আমার জ্যাঠামশাই।

গুঁর বাড়িতে পৌঁছে দেখি সিধু জ্যাঠা দরজার ঠিক মুখটায় একটা মোড়ার উপর বসে নাপিতকে দিয়ে চুল ছাঁটাচ্ছেন, যদিও মাথার পিছন দিকে ছাড়া আর কোথাও চুল নেই তাঁর। আমাদের দেখে মোড়াটা পাশ করে বললেন, ‘বোসো।

নারায়ণকে হাঁক দিয়ে বলো চা দেবে।’

একটা তক্তপোশ, দুটো চেয়ার, আর ইয়া বড় বড় তিনটে বইয়ের আলমারি ছাড়া ঘরে আর কিছু নেই। তক্তপোশটারও অর্ধেকটা বইয়ে বোঝাই। আমরা জানতাম ওই খালি জায়গাটাই সিধু জ্যাঠার জায়গা, তাই আমরা চেয়ার দুটোতে বসলাম। ফেলুদা তার ধার-করা মলাট দেওয়া বইটা সঙ্গে এনেছিল, সেটা একটা আলমারির একটা তাকের ফাঁকে গুঁজে দিল।

চুল কাটতে কাটতেই সিধু জ্যাঠা বললেন, ‘ফেলু যে গোয়েন্দাগিরি করছ, ক্রিমিন্যাল ইনভেসটিগেশনের ইতিহাসটা একবার ভালো করে পড়ে নিয়েছ তো? যে কাজেই স্পেশলাইজ কর না কেন, তার ইতিহাসটা জানা থাকলে কাজে আনন্দ আর কনফিডেন্স দুটোই পাবে বেশি।’

ফেলুদা নরম সুরে বলল, ‘আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো বটেই।’

‘এই যে আঙুলের ছাপ দেখে ক্রিমিন্যাল ধরার পদ্ধতি, এটার আবিষ্কর্তা কে জান?’

ফেলুদা আমার দিকে চোখ টিপে বলল, ‘ঠিক মনে পড়ছে না; পড়েছিলাম বোধহয়।’

আমি বুঝলাম ফেলুদার দিব্যি মনে আছে, কিন্তু সে সিধু জ্যাঠাকে খুশি করার জন্য ভুলে যাওয়ার ভান করছে।

‘হুঁ! জিজ্ঞেস করলে অনেকেই দেখবে ফস করে বলে বসবে আলফোঁস বেতিয়োঁ। কিন্তু সেটা ভুল। কারেক্ট নামটা হচ্ছে ছয়ান ভুকেটিচ। মনে রেখো। আর্জেন্টিনার লোক। বুড়ো আঙুলের ছাপের ওপর ইনিই প্রথম জোরটা দেন। আর সে ছাপকে চারটে ক্যাটেগরিতে ভাগ করেন উনিই। অবিশ্যি তার কয়েক বছর পরে ইংল্যান্ডের হেনরি সাহেব আরো মজবুত করেন এই সিস্টেমকে।’

ফেলুদা আর বেশি সময় নষ্ট না করে ঘড়ি দেখে বলল, ‘আপনি উস্তুর হেমাঙ্গ হাজারার নাম শুনেছেন বোধহয়। যিনি প্যারাসাইকলজি নিয়ে—’

‘পাড়া-ছাই-চলো-যাই?’

এটা সিধু জ্যাঠার একটা বাতিক। একেকটা ইংরিজি কথাকে উনি এইভাবেই বেঁকিয়ে বাংলা করে বলেন। Exhibition হল ইস্-কি ভীষণ, Impossible হল আম-পচে-বেল, Dictionary হল দ্যাখস-নাড়ী, Governor হল গোবরনাড়—এই রকম আর কী।

‘শুনেছি বইকি!’ বললেন সিধু জ্যাঠা। ‘এই তো সেদিনও কাগজে নাম দেখলাম ওর। কেন—তাকে নিয়ে আবার কী? কিছু গোলমাল করেছে নাকি? ও তো গোলমাল করার লোক নয়। বরং উপেটা। অন্যদের বুজরুকি ধরে দিয়েছে ও।’

‘তাই বুঝি?’ ফেলুদা বুঝেছে যে একটা ইন্টারেস্টিং খবরের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

‘সে জান না বুঝি? বছর চারেক আগের ব্যাপার। কাগজে বেরিয়েছিল তো। শিকাগোতে এক বাঙালী ভদ্রলোক—ভদ্র আর বলি কী করে, চরম ছোটলোক—এক আধ্যাত্মিক চিকিৎসালয় খুলে বসেছিল। খাস শিকাগো শহরে। তরতর করে আমেরিকান খন্দের জুটে যায়, বুঝেছ। হুজুগে জাত তো, আর পয়সা অটেল। হিপনটিজম অ্যাপ্লাই করে দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে দেবো বলে ক্রম করেছিল। এইটিনথ্ সেঞ্চুরিতে ইউরোপে আনটন মেসমার যা করে। এর বেলা দু-একটা ছুটছাট লেগেও গিয়েছিল বোধহয়—যেমন হয় আর কী। সেই সময় হাজার শিকাগোতে বক্তৃতা দিতে যায়। সে জানতে পেরে ব্যাপারটা চাক্ষুষ করতে যায়; গিয়ে ভগামি ধরে ফেলে। সে এক স্ক্যান্ডাল। শেষ পর্যন্ত লোকটাকে দেশছাড়া করে ছেড়েছিল আমেরিকান সরকার। হ্যাঁ হ্যাঁ—নাম নিয়েছিল ভবানন্দ;... হাজারা খুব সলিড লোক। অন্তত লেখাটেখা পড়ে তো তাই মনে হয়। খান দুয়েক লেখা তো আমার কাছেই রয়েছে। বাঁ দিকের আলমারির তলার তাকে ডান কোণে দেখ তো। প্যারাসাইকলজিক্যাল সোসাইটির তিনখানা জার্নাল পাবে...’

ফেলুদা ম্যাগাজিন তিনটে ধার করে নেয়। এখন ট্রেনে বসে ও সেগুলোই উন্টপাণ্টে দেখছে। আমি জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছি। উত্তর প্রদেশ পেরিয়ে রাজস্থানে ঢুকেছি কিছুক্ষণ আগেই।

‘এখানে রোদের তেজই আলাদা। সাথে কী আর লোকগুলো এত পাওয়ারফুল!’

কথাটা এল আমাদের সামনের বেঞ্চি থেকে। ফোর-বার্থ কম্পার্টমেন্ট, আর যাত্রীও আছি সবসুদ্ধ চারজন। যিনি কথাটা বললেন তিনি দেখতে অত্যন্ত নিরীহ, রীতিমত রোগী, আর হাইটে নিষাতি আমার চেয়েও অন্তত দু’ ইঞ্চি কম। আমার তো তাও বয়স মাত্র পনেরো, তাই বাড়ার বয়স যায়নি। ইনি কমপক্ষে পঁয়ত্রিশ, কাজেই যেমন আছেন তেমনই থাকবেন। ইনি যে বাঙালী সেটা এতক্ষণ বুঝতে পারিনি, কারণ বৃশ সার্ট আর প্যান্ট থেকে বোঝা খুব শক্ত। ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, ‘অনেকক্ষণ থেকে আপনাদের কথা শুনি। দূর দেশে এসে জাতভাইয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা? আমি তো ধরেই নিয়েছিলুম এই একটা মাস মাতৃভাষাটাকে একরকম বাধ্য হয়েই বয়কট করতে হবে।’

ফেলুদা হয়ত খানিকটা ভদ্রতার খাতিরেই জিজ্ঞেস করল, ‘কন্দূর যাবেন?’
‘যোধপুরটা তো পৌঁছই, তারপর দেখা যাবে। আপনারা?’

‘আমরাও আপাতত যোধপুর।’

‘বাঃ—চমৎকার হল। আপনিও কি লেখেন-টেখেন নাকি?’

‘আজ্ঞে না।’ ফেলুদা হাসল। ‘আমি পড়ি। আপনি লেখেন?’

‘জটায়ু নামটা চেনা লাগচে কি?’

‘জটায়ু? সেই যে সব রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস লেখেন? আমি তো পড়েওছি তার দু-একটা বই—সাহারায় শিহরন, দুর্ধর্ষ দুশমন—আমাদের স্কুলের লাইব্রেরি থেকে নিয়ে।’

‘আপনিই জটায়ু?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘আজ্ঞে হ্যাঁ—ভদ্রলোকের দাঁত বেরিয়ে গেল, ঘাড় নুয়ে পড়ল—এই অধমের ছদ্মনামই জটায়ু। নমস্কার।’

‘নমস্কার। আমার নাম প্রদোষ মিত্তির। ইনি শ্রীমান তপেশরঞ্জন।’

ফেলুদা হাসি চেপে রেখেছে কী করে? আমার তো সেই যাকে বলে পেট থেকে ভসভসিয়ে সোডার মতো হাসি গলা অবধি উঠে এসেছে। ইনিই জটায়ু। আর আমি ভাবতাম, যেরকম গল্প লেখেন, চেহারা নিশ্চয়ই হবে একেবারে জেমস বন্ডের বাবা।

‘আমার আসল নাম লালমোহন গাঙ্গুলী। অবিশ্যি বলবেন না কাউকে। ছদ্মনামটা, মানে, ছদ্মবেশের মতোই—ধরা পড়ে গেলে তার আর কোনো ইয়ে থাকে না।’

আমরা আশ্রয় থেকে কিছু গুলাবী রেউড়ি নিয়ে এসেছিলাম, ফেলুদা ঠোঙাটা ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, ‘আপনি তো বেশ কিছুদিন থেকেই ঘুরছেন বলে মনে হচ্ছে।’

ভদ্রলোক ‘হ্যাঁ, তা—’ বলে একটা রেউড়ি তুলে নিয়েই কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। ফেলুদার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললেন, ‘আপনি জানলেন কী করে?’

ফেলুদা হেসে বললেন, ‘আপনার ঘড়ির ব্যান্ডের তলা দিয়ে আপনার গায়ের চামড়ার রোদে-না-পোড়া আসল রংটা মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ছে।’

ভদ্রলোক চোখ গোল গোল করে বললেন, ‘ওরেব্বাসরে, আপনার তো ভয়ঙ্কর অবজারভেশন মশাই। ঠিকই ধরেছেন দিল্লী, আশ্রা, ফতেপুর সিক্রি—এইসব একটু ঘুরে দেখলুম আর কী। দিন দশেক হল বেরিয়েছি। অ্যাডিন স্রেফ বাড়িতে বসে বসে দেশ-বিদেশের গল্পো লিখি। থাকি ভদ্রেস্বরে। এবার তাই ভাবলুম—একটু ঘুরে দেখা যাক, লেখার সুবিধে হবে। আর অ্যাডভেঞ্চারের গল্পো এইসব দিকেই জমে ভালো, বলুন! দেখুন না কীরকম সব রক্ষ পাহাড়, বাইসেপ-ট্রাইসেপের মতো ফুলে ফুলে রয়েছে।’

বাংলাদেশের—এক হিমালয় ছাড়া—মাস্‌ল নেই মশাই। সমতলভূমিতে কি অ্যাডভেঞ্চার জমে ?'

আমরা তিনজনে রেউড়ি খেতে লাগলাম। জটায়ু দেখি মাঝে মাঝে আড়চোখে ফেলুদার দিকে দেখছেন। শেষটায় বললেন, 'আপনার হাইট কত মশাই ? কিছু মনে করবেন না।'

'প্রায় ছয়', ফেলুদা বলল।

'ওঃ, দারুণ হাইট। আমার হিরোকেও আমি ছয় করিচি। প্রখর রুদ্র—জানেন তো ? রাশিয়ান নাম—প্রখর, কিন্তু বাঙালীকেও কিরকম মানিয়ে গেছে বলুন ! আসলে নিজে যা হতে পারলুম না, বুঝেছেন, হিরোদের মধ্যে দিয়ে সেই সব আশ মিটিয়ে নিচ্ছি। কম চেষ্টা করিচি মশাই হবার জন্যে ? সেই কলেজে থাকতে চার্লস অ্যাটলাসের বিজ্ঞাপন দেখতুম বিলিতি ম্যাগাজিনে। বুক চিতিয়ে মাস্‌ল ফুলিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কী হাতের গুলি, কী বুকের ছাতি, কোমরখানা একেবারে সিংহের মতো। চর্বি নেই এক ফোঁটা সারা শরীরে। মাথা থেকে পা অবধি ঢেউ খেলে গেছে মাস্‌লের। বলছে—একমাসের মধ্যে আমার মতো চেহারা হয়ে যাবে, আমার সিস্টেম ফলো করে। ওদের দেশে হতে পারে মশাই। বাংলাদেশে ইমপসিবল। বাপের পয়সা ছিল, কিছু নষ্ট করলুম, লেসন আনালুম, ফলো করলুম—কিস্যু হল না। যেই কে সেই। মামা বললেন—পর্দার রড ধরে বুলবি রোজ, দেখবি একমাসের মধ্যে হাইট বেড়ে যাবে। কোথায় একমাস ! বুলতে বুলতে একদিন মশাই রড সুদু খসে মাটিতে পড়ে হাঁটুর হাড় ডিসলোকেট হয়ে গেল, অথচ আমি সেই পাঁচ সাড়ে তিন সেই পাঁচ সাড়ে তিনই রয়ে গেলাম। বুঝলুম, টাগ অফ ওয়ারের দড়ির বদলে আমাকে ধরে টানলেও লম্বা আমি হব না। শেষটায় ভাবলুম—দুগ্তোরি, গায়ের মাস্‌লের কথা আর ভাববো না, তার চেয়ে ব্রেনের মাস্‌লের দিকে অ্যাটেনশন দেওয়া যাক। আর মেন্টাল হাইট। শুরু করলাম রোমাঞ্চ উপন্যাস লেখা। লালমোহন গাংগুলী নাম তো আর চলে না, তাই নিলুম ছদ্মনাম—জটায়ু। ফাইটার। কী ফাইটটা দিয়েছিল রাবণকে বলুন তো !'

ট্রেনটাকে ফাস্ট প্যাসেঞ্জার বললেও কাছাকাছির মধ্যে এত স্টেশন পড়ছে যে পনেরো-কুড়ি মিনিটের বেশি একটানা গাড়ি চলতেই পারছে না। ফেলুদা প্যারাসাইকলজিক্যাল পত্রিকা ছেড়ে এখন রাজস্থানের বিষয়ে একটা বই পড়তে শুরু করেছে। রাজস্থানের কেবল্লার সব ছবি রয়েছে এ বইতে। সেগুলো সে খুব খুঁটিয়ে দেখছে আর মন দিয়ে তাদের বর্ণনা পড়ছে। আমাদের সামনে আপার বার্ধে আরেকজন ভদ্রলোক রয়েছেন, তাঁর গৌঁফ আর পোশাক দেখলেই বোঝা যায় তিনি বাঙালী নন। ভদ্রলোক একটার পর একটা কমলালেবু খেয়ে চলেছেন, আর

তার খোসা আর ছিবড়ে ফেলছেন সামনে পাতা একটা উর্দু খবরের কাগজের উপর।

ফেলুদা পকেট থেকে একটা নীল পেনসিল বার করে হাতের বইটাতে দাগ দিচ্ছিল, এমন সময় লালমোহনবাবু বললেন, 'কিছু মনে করবেন না—আপনি কি মশাই গোয়েন্দা জাতীয় কিছু ?'

'কেন বলুন তো ?'

'না, মানে, যেভাবে ফস করে তখন আমার ব্যাপারটা বলে দিলেন...'

'আমার ও ব্যাপারে ইন্টারেস্ট আছে।'

'বাঃ ! তা আপনারাও তো ষোধপুরেই যাচ্ছেন বলে বললেন।'

'আপাতত।'

'কোনো রহস্য আছে নাকি ? যদি থাকে তো আমি কিন্তু আপনাদের সঙ্গে বুলে পড়ব—ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড। এমন সুযোগ আর আসবে না।'

'আপনার উটের পিঠে চড়তে আপত্তি নেই তো ?'

'আরেকবাস, উট ! ভদ্রলোক চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। 'শিপ অফ দি ডেজার্ট ! এ তো আমার স্বপ্ন মশাই। আমার আরক্ত আরব উপন্যাসে আমি বেদুইনের কথা লিখেছি যে ! তাছাড়া সাহায্য শিহরনেও আছে। অদ্ভুত জীব। নিজের ওয়াটার সাপ্লাই নিজের পাকস্থলীর মধ্যে নিয়ে বালির সমুদ্র দিয়ে সার বেঁধে চলেছে। কী রোমান্টিক—ওঃ !'

ফেলুদা বলল, 'পাকস্থলীর ব্যাপারটা কি আপনার বইয়ে লিখেছেন নাকি ?'

লালমোহনবাবু থতমত খেয়ে বললেন, 'ওটা ঠিক নয় বুঝি ?'

ফেলুদা মাথা নেড়ে বলল, 'জল আসে উটের কুঁজ থেকে। কুঁজটা আসলে চর্বি। ওই চর্বিকে অক্সিডাইজ করে উট জল করে নেয়। এক নাগাড়ে দশপনেরো দিন ওই চর্বির জোরে জল না খেয়ে থাকতে পারে। অবিশ্যি একবার জলের সন্ধান পেলে দশ মিনিটে পঁচিশ গ্যালনও খেয়ে নেয় বলে শোনা গেছে।'

লালমোহনবাবু বললেন, 'ভাগ্যিস বললেন। নেস্ট এডিশনে ওটা কারেন্ট করে দেবো।'

এখানকার ট্রেন টিমে হলেও, বেশি যে লেট করছে না এটাই ভাগ্যি। গাড়ি বদল করার ব্যাপার যেখানে থাকে, সেখানে লেট করলে অনেক সময় ভারী মুশকিল হয়।

ভরতপুর স্টেশনে এসে আমরা প্রথম ময়ূর দেখলাম। প্ল্যাটফর্মের উল্টোদিকে তিনটে ময়ূর দিব্যা লাইনের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফেলুদা বলল, 'কলকাতায়

যেমন কাক-চড়ুই দেখিস সর্বত্র, এখানে তেমনি দেখবি ময়ূর আর টিয়া ।
লোকজন যা দেখা যাচ্ছে, তাদের মধ্যে পাগড়ি আর গালপাট্রার সাইজ ক্রমেই বেড়ে চলেছে । এরা সবাই রাজস্থানী। এদের পরনে খাটো ধুতি হাঁটু অবধি তোলা, আর একপাশে বোতামওয়ালা জামা । এ ছাড়া পায়ে আছে ভারী নাগরা, আর অনেকের হাতেই একটা করে লাঠি ।

বান্দিকুই স্টেশনের রিফ্রেশমেন্ট রুমে বসে রুটি আর মাংসের ঝোল খেতে-খেতে লালমোহনবাবু বললেন, 'এই যে সব লোক দেখছেন, এদের মধ্যে এক-আধটা ডাকাত থাকার সম্ভাবনা কিন্তু খুব বেশি । আরাবল্লী পাহাড় হল গিয়ে ডাকাতদের আস্তানা, জানেন তো ? আর এ সব ডাকাত কীরকম পাওয়ারফুল হয় সেটা নিশ্চয়ই আপনাকে বলে দিতে হবে না । জানালার লোহার শিক দু-হাতে দু-দিকে টেনে ফাঁক করে জেলখানা থেকে পালায় মশাই এরা ।'

ফেলুদা বলল, 'জানি । আর কারুর উপর ক্ষেপে গেলে এরা কীভাবে শাস্তি দেয় বলুন তো ?'

'মেরে ফেলে নিশ্চয়ই ?'

'উঁহ । ওইখানেই তো মজা । সে লোক যেখানেই থাকুক না কেন, তাকে খুঁজে বের করে তলোয়ার দিয়ে নাকটা কেটে ছেড়ে দেয় ।'

লালমোহনবাবুর হাতের মাংসের টুকরোটা আর মুখে পোরা হল না ।

'নাক কেটে ?'

'তাই তো শুনেছি ।'

'এ যে সেই পৌরাণিক যুগের সাজার মতো মনে হচ্ছে মশাই । কী সাংঘাতিক !'

মাঝরাতিরে মারওয়াড়ের ট্রেনে ওঠার সময় অন্ধকারে একটু হ্যাঁচোড় প্যাঁচোড় করতে হলেও, জায়গা পেতে অসুবিধা হল না। রাত্রে ঘুমও হল ভালো । সকালে ঘুম থেকে উঠে চলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে একটা পাহাড়ের মাথায় একটা পুরানো কেলা দেখতে পেলাম । তার এক মিনিটের মধ্যেই গাড়ি কিষণগড় স্টেশনে এসে থামল । ফেলুদা বলল, 'জায়গার নামে গড় আছে দেখলেই বুঝবি কাছাকাছির মধ্যে কোথাও এরকম একটা পাহাড়ের উপর একটা কেলা আছে ।'

কিষণগড় স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে নেমে চা খেলাম । এখানকার চায়ের ভাঁড়গুলো দেখলাম বাংলাদেশের ভাঁড়ের চেয়ে অনেক বেশি বড় আর মজবুত । চায়ের স্বাদও একটু অন্য রকম । ফেলুদা বলল যে, উটের দুধ দিয়ে তৈরি । সেটা শুনেই বোধহয় লালমোহনবাবু পর পর দু'ভাঁড় চা খেলেন ।

চা খেয়ে প্ল্যাটফর্মের কলে চট করে দাঁতটা মেজে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে গাড়িতে ফিরে এসে দেখি, বিরাট পাগড়ি মাথায় একটা রাজস্থানী লোক নাক

অবধি চাদর ঢেকে বেঞ্চির উপর পা তুলে হাঁটুর উপর খুতনি ভর করে লালমোহনবাবুর বেঞ্চির একটা পাশ দখল করে বসে আছে । চাদরের ফাঁক দিয়ে ভেতরের জামার রংটা দেখলাম টকটকে লাল ।

লালমোহনবাবু কামরায় ঢুকে তাকে দেখেই সটান নিজের জায়গা ছেড়ে আমাদের বেঞ্চির একটা কোণে বসে পড়লেন । ফেলুদা 'তোরা আরাম করে বোস' বলে একেবারে সেই রাজস্থানীটার পাশেই বসে পড়ল ।

আমি লোকটার পাগড়িটা লক্ষ করছিলাম । কত অজস্র প্যাঁচ আছে ওই পাগড়িতে সেটা ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছিলাম না । লালমোহনবাবু চাপা গলায়



ফেলুদাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'পাওয়ারফুলি সাস্পিশাস্ । এরকম চাষাভুষোর মতো পোশাক অথচ দিব্যি প্রথম শ্রেণীতে উঠে বসে আছে । কত হীরেজহরত আছে ওই পুঁটলিটার মধ্যে কে জানে !'

পুঁটলিটা পাশেই রাখা ছিল । ফেলুদা খালি একটু হাসল, মুখে কিছু বলল না ।

গাড়ি ছেড়ে দিল । ফেলুদা তার ঝোলার ভিতর থেকে রাজস্থানের বইটা বার করে নিল । আমি নিউম্যানের ব্র্যাডশ টাইম-টেবলটা খুলে সামনে কী কী স্টেশন পড়বে দেখতে লাগলাম । অদ্ভুত নাম এখানকার সব স্টেশনের—গালোট্টা, তিলাওনিয়া, মাক্কেরা, ভেসানা, সেন্দ্রা । কোথেকে এল এসব নাম কে জানে । ফেলুদা বলে জায়গার নামের মধ্যে নাকি অনেক ইতিহাস লুকোনো থাকে । কিন্তু সে সব ইতিহাস খুঁজে বার করবে কে ?

গাড়ি ঘটর ঘটর করে চলেছে, আমি রাজকাহিনীর শিলাদিত্য বাপ্পাদিত্যের কথা

ভাবছি, এমন সময় বুঝতে পারলাম আমার সার্টির পাশটায় একটা টান পড়ছে। পাশ ফিরে দেখি লালমোহনবাবুর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। চোখাচোখি হতেই তিনি ঢোক গিলে শুকনো গলায় ফিস ফিস করে বললেন, 'ব্রাদ !'

ব্রাদ ? লোকটা বলে কী ?

তারপর তার দৃষ্টি ঘুরে গেল সামনের রাজস্থানী লোকটার দিকে। লোকটা মাথা পিছন দিকে হেলিয়ে মুখ হাঁ করে ঘুমিয়ে আছে। এবার তার বেঞ্চির উপরে তোলা পা দুটোর দিকে চোখ গেল। দেখলাম, বুড়ো আঙুলের পাশটা ছাল উঠে রক্ত জমে রয়েছে। তারপর বুঝলাম এতক্ষণ কাপড়ে যেগুলোকে মাটির দাগ বলে মনে হচ্ছিল, সেগুলো আসলে শুকনো লালচে রক্ত।

ফেলুদার দিকে চেয়ে দেখি, ও দিব্যি একমনে বই পড়ে চলেছে।

লালমোহনবাবুর পক্ষে বোধ হয় ফেলুদার নিশ্চিত ভাবটা সহ্য হলে না। তিনি হঠাৎ সেই শুকনো গলাতেই বলে উঠলেন, মিস্টার মিটার, সাস্পিশাস্ ব্রাদ-মার্কস্ অন আওয়ার নিউ কো-প্যাসেঞ্জার।'

ফেলুদা বই থেকে চোখ তুলে একবার ঘুমন্ত লোকটার দিকে দেখে নিয়ে বলল, 'প্রব্যাবলি কজড বাই বাগস্।'

রক্তের কারণ ছারপোকা হতে পারে জেনে জটায়ু কেমন জানি মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ভয় যে কটল না সেটা তাঁর জড়োসড়ো ভাব আর বার বার ভুরু কঁচকে আড়চোখে ঘুমন্ত লোকটার দিকে চাওয়া থেকে বুঝতে পারছিলেন।

দুপুর আড়াইটার সময় গাড়ি মারওয়াড় জংশনে পৌঁছাল। খাওয়াটা স্টেশনের রিফ্রেশমেন্ট রুমে সেরে ঘণ্টাখানেক প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করে সাড়ে তিনটেয় যোধপুরের গাড়িতে ওঠার সময় আর সেই লাল জামা পরা লোকটাকে দেখতে পেলাম না।

আড়াই ঘণ্টার জার্নির মধ্যে ঘন ঘন উটের দল চোখে পড়ায় লালমোহনবাবু বার বার উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন। যোধপুরে পৌঁছলাম ছাঁটা বেজে দশ মিনিটে। ট্রেনটি কুড়ি মিনিট লেট করেছে। কলকাতা হলে এতক্ষণে সূর্য ডুবে যেত, কিন্তু এদিকটা পশ্চিমে বলে এখনো দিব্যি রোদ রয়েছে।

আমাদের বুকিং ছিল সার্কিট হাউসে। লালমোহনবাবু বললেন তিনি নিউ বসে লজে থাকছেন। 'কাল সকাল সকাল এসে পড়ব, একসঙ্গে ফোটে যাওয়া যাবে' বলে ভদ্রলোক টাঙ্গার লাইনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

আমরা একটা ট্যান্ড্রি নিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়লাম। শুনলাম সার্কিট হাউসটা খুব কাছেই। যেতে যেতে বাড়ির ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে লক্ষ করছিলাম একটা বিরাট পাথরের পাঁচিল—প্রায় একটা দোতলা বাড়ির সমান উঁচু! ফেলুদা

বলল, এককালে পুরো যোধপুর শহরটাই নাকি ওই পাঁচিলটা দিয়ে ঘেরা ছিল। ওটার সাত জায়গায় নাকি সাতটা ফটক আছে। বাইরে থেকে সৈন্য আক্রমণ করতে আসছে জানলে ওই ফটকগুলো বন্ধ করে দেওয়া হত।

আরেকটা রাস্তার মোড় ঘুরতেই ফেলুদা বলল, 'ওই দ্যাখ্ বাঁ দিকে।'

চেয়ে দেখি শহরের বাড়ির মাথার উপর দিয়ে দূরে দেখা যাচ্ছে বিরাট থমথমে এক কেলা। বুঝলাম ওটাই হল বিখ্যাত যোধপুর ফোর্ট। আমি জানতাম এখানকার রাজারা মোগলদের হয়ে লড়াই করেছে।

কখন কেলাটা কাছ থেকে দেখতে পাবো সেটা ভাবতে ভাবতেই সার্কিট হাউসে পৌঁছে গেলাম। গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকে একটা বাগানের পাশ দিয়ে গিয়ে একটা পোর্টিকোর তলায় আমাদের ট্যান্ড্রি দাঁড়াল। মালপত্তর নামিয়ে ট্যান্ড্রির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আমরা ভিতরে ঢুকলাম। একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এসে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন আমরা কলকাতা থেকে আসছি কিনা আর ফেলুদার নাম মিস্টার মিটার কিনা। ফেলুদা 'হ্যাঁ' বলাতে ভদ্রলোক বললেন—আপনাদের জন্য একতলায় একটা ডাবল রুম বুক করা আছে। খাতায় নাম সই করার সময় আমাদের নামের কয়েক লাইন উপরেই পর পর দুটো নাম চোখে পড়ল—ডক্টর এইচ এম হাজারা আর মাস্টার এম ধর।

সার্কিট হাউসের প্ল্যানটা খুব সহজ। ঢুকেই একটা বড় খোলা জায়গা, বাঁ দিকে রিসেপশন কাউন্টার আর ম্যানেজারের ঘর, সামনে দোতলার সিঁড়ি, ডাইনে আর বাঁয়ে দু-দিকে লম্বা বারান্দার পাশে পর পর লাইন করে ঘর। বারান্দায় বেতের চেয়ার পাতা রয়েছে। একজন বেয়ারা এসে আমাদের মাল তুলে নিল, আমরা তার পিছন পিছন ডান দিকের বারান্দা দিয়ে রওনা দিলাম তিন নম্বর ঘরের দিকে। একজন সফ গৌফওয়াল মাঝবয়সী ভদ্রলোক একটা বেতের চেয়ারে বসে একজন মারওয়াড়ি টুপি পরা ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন; আমরা তার পাশ দিয়ে যাবার সময় পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'বাঙালী মনে হচ্ছে?' ফেলুদা হেসে 'হ্যাঁ' বলল। আমরা তিন নম্বর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

বেশ বড় ঘর। দুটো পাশাপাশি খাট, তাতে আবার মশারির ব্যবস্থা রয়েছে। একপাশে একটা দু'জন-বসার আর দুটো একজন বসার সোফা, আর একটা গোল টেবিলের উপর একটা অ্যাশ-ট্রে। এ ছাড়া ড্রেসিং টেবিল, আলমারি আর খাটের পাশে দুটো ছোট টেবিলে জলের ফ্লাস্ক, গেলাস আর বেড-সাইড ল্যাম্প। ঘরের সঙ্গে লাগা বাথরুমের দরজাটা বাঁ দিকে।

ফেলুদা বেয়ারাকে চা আনতে বলে পাখাটা খুলে দিয়ে সোফায় বসে বলল, 'খাতায় নাম দুটো দেখলি?'

আমি বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু ওই চাড়া-দেওয়া গৌফওয়াল লোকটা আশা করি

ডক্টর হাজরা নন।’

‘কেন? হলে ক্ষতি কী?’

ক্ষতি যে কী সেটা অবিশ্যি আমি চট কর ভেবে বলতে পারলাম না। ফেলুদা আমার ইতস্তত ভাব দেখে বলল, ‘তোমার আসলে লোকটাকে দেখে ভালো লাগেনি। তুই মনে মনে চাইছিস যে ডক্টর হাজরা লোকটা খুব শান্তশিষ্ট হাসিখুশি অমায়িক হন—এই তো?’

ফেলুদা ঠিকই ধরেছে। এ লোকটাকে দেখলে বেশ সেয়ানা বলেই মনে হয়। তা ছাড়া বোধহয় বেশ লম্বা আর জাঁদরেল। ডাক্তার বলতে যা বোঝায় তা মোটেই নয়।

ফেলুদা একটা সিগারেট শেষ করতে না করতেই চা এসে গেল, আর বেয়ারা ঘর থেকে বেরোতে না বেরোতেই দরজায় টোকা পড়ল। ফেলুদা ভীষণ বিলিতি কায়দায় বলে উঠল, ‘কাম ইন!’ পর্দা ফাঁক করে ভেতরে ঢুকলেন মিলিটারি গোর্ফ।

‘ডিসটার্ব করছি না তো?’

‘মোটাই না। বসুন। চা খাবেন?’

‘নাঃ। এই অল্পক্ষণ আগেই খেয়েছি। আর ফ্র্যাঙ্কলি স্পীকিং—চা-টা এখানে তেমন সুবিধের নয়। শুধু এখানে বলছি কেন, ভারতবর্ষ হল খাস চায়ের দেশ, অথচ ক’টা হোটলে ক’টা ডাকবাংলোয় ক’টা সার্কিট হাউসে ভালো চা খেয়েছেন আপনি বলুন তো? অথচ বাইরে যান, বিদেশে যান—অ্যালবেনিয়ার মতো জায়গায় গিয়ে ভালো চা খেয়েছি জানেন? ফার্স্ট ক্লাস দার্জিলিং টি। আর ইউরোপের অন্য বড় শহরে তো কথাই নেই। একমাত্র খারাপ যেটা লাগে সেটা হল কাপড়ের থলিতে চায়ের পাতার ব্যাপারটা—যাকে টি-ব্যাগস বলে। কাপে থাকবে গরম জল, আর একটা সুতো বাঁধা কাপড়ের থলিতে থাকবে চায়ের পাতা। সেইটে জলে ডুবিয়ে লিকার তৈরি করে নিতে হবে আপনাকে। তারপর তাতে আপনি দুধ দিন কী লেবু কচলে দিন সেটা আপনার রুচি। লেমন টি-টাই আমি বেশি প্রেফার করি। তবে তার জন্যে চাই ভালো লিকার। এখানকার চা খুব আর্ডিনারি।’

‘আপনার তো অনেক দেশ-টেশ ঘোরা আছে বুঝি?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘ওইটেই তো করেছি সারা জীবন ধরে’, ভদ্রলোক বললেন। ‘আমি হল্যাম যাকে বলে গ্লোব-ট্রটার। তার সঙ্গে আবার শিকারের শখও আছে। সেটা অবিশ্যি আফ্রিকায় থাকতেই হয়েছিল। আমার নাম মন্দার বোস।’

গ্লোব-ট্রটার উমেশ ভট্টচার্যের নাম শুনেছি, কিন্তু ঐর নাম তো শুনিনি। ভদ্রলোক যেন আমার মনের কথাটা আন্দাজ করেই বললেন, ‘অবিশ্যি আমার নাম

আপনাদের শোনার কথা নয়। যখন প্রথম বেরিয়েছিলাম, তখন কাগজে নামটাম বেরিয়েছিল। তারপর এই ছত্রিশ বছর পরে মাস তিনেক হল সবে দেশে ফিরেছি।’

‘সে অনুপাতে আপনার বাংলার উপর দখলটা তো ভালো আছে বলতে হবে।’

‘দেখুন মশাই, সেটা এন্টায়ারলি আপনার ইচ্ছে অনিচ্ছের ওপর নির্ভর করে। আপনি যদি বিদেশে বাংলা ভুলবেন বলে ইচ্ছে করেন, তা হলে তিন মাসে ভুলে যেতে পারেন। আর তা যদি ইচ্ছে না করেন, তা হলে ত্রিশ বছরেও ভোলবার কোনো চান্স নেই। অবিশ্যি আমি আবার বাঙালীর সঙ্গও পেয়েছি যথেষ্ট। কিনিয়াতে একবার হাতির দাঁতের ব্যবসা শুরু করেছিলাম, তখন আমার সঙ্গে একটি বাঙালী ছিলেন। আমরা এক সঙ্গে ছিলাম প্রায় সাত বছর।’

‘সার্কিট হাউসে আপনি ছাড়া আর কেউ বাঙালী আছেন কি?’

এটা অনেকবার লক্ষ করেছি, বাজে কথায় সময় নষ্ট করার লোক ফেলুদানয়!

ভদ্রলোক বললেন, ‘আছে বইকি। সেটাই তো আশ্চর্য লাগছে আমার। আসলে কলকাতায় বাঙালীদের আর সোয়াস্তি নেই সেটা বেশ বুঝতে পারছি। তাই সুযোগ পেলেই এদিকে ওদিকে গিয়ে ঘুরে আসছে। অবিশ্যি দিস ম্যান হাজ কাম উইথ এ পারপাস। ভদ্রলোক সাইকলজিস্ট। তবে গোলমলে ব্যাপার বলে মনে হয়। সঙ্গে একটি ছেলে আছে বছর আষ্টেকের, সে নাকি জাতিস্মর। পূর্বজন্মে রাজস্থানে কোনো কেল্লার কাছে নাকি জন্মেছিল। ভদ্রলোক ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে সেই কেল্লা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ডাক্তারটি বুজরুক না ছেলেটি ধাঙ্গা দিচ্ছে বোঝা শক্ত। এমনিতেও ছেলেটির হাবভাব সাস্পিশাস্। কারুর সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না। কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয় না। ভেরি ফিশি। অনেক তো দেখলুম ভণ্ডামি এই ত্রিশ বছরে, আবার এখানে এসেও যে সেই একই জিনিস দেখতে হবে তা ভাবিনি।’

‘আপনি কি এখানেও ট্রটিং করতে এসেছেন নাকি?’

ভদ্রলোক হেসে সোফা ছেড়ে উঠে পড়ে বললেন, ‘টু টেল ইউ দ্য টুথ—নিজের দেশটা ভালো করে দেখাই হয়নি এখনো। বাই দ্য ওয়ে—আপনার পরিচয়টা তো পাওয়া গেল না!’

ফেলুদা নিজের আর আমার পরিচয় দিয়ে বলল, ‘আমি আবার আমার দেশের বাইরে কোথাওই যাইনি।’

‘আই সী। ওয়েল—সাড়ে আটটা নাগাদ যদি ডাইনিং রুমে আসেন তো আবার দেখা হবে। আমার আবার আর্লি টু বেড, আর্লি টু রাইজ...’

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমরাও দু’জনে বাইরের বারান্দায় এলাম। এসে দেখলাম, গেট দিয়ে একটা ট্যাক্সি চুকছে। সেটা এসে সার্কিট হাউসের সামনে থামল, আর

সেটা থেকে নামল একটি বছর চল্লিশের মাঝারি হাইটের ভদ্রলোক আর একটা রোগা ফরসা বাচ্চা ছেলে। বোঝাই গেল যে এরাই হচ্ছে ডক্টর হেমাঙ্গ হাজরা এবং জাতিস্মর শ্রীমান মুকুল ধর।

॥ ৫ ॥

মিস্টার বোস ডক্টর হাজরাকে গুড ইভনিং বলে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন। ডক্টর হাজরা ছেলেটির হাত ধরে বারান্দা দিয়ে আমাদের দিকেই এগিয়ে এসে, বোধহয় হঠাৎ দু'জন অচেনা বাঙালীকে দেখে কেমন যেন একটু থতমত খেয়ে গেলেন। ফেলুদা হেসে নমস্কার করে বলল, 'আপনিই বোধ হয় ডক্টর হাজরা?'

'হ্যাঁ—কিন্তু আপনাকে তো—?'

ফেলুদা পকেট থেকে তার একটা কার্ড বার করে ডক্টর হাজরাকে দিয়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল। সত্যি বলতে কী, আমরা আপনার খোঁজেই এসেছি। সুধীরবাবুর অনুরোধে। সুধীরবাবু একটা চিঠিও দিয়ে দিয়েছেন আপনার নামে।'

'ও। আই সী। মুকুল, তুমি ঘরে যাও, আমি ঐদের সঙ্গে একটু কথা বলে আসছি, কেমন?'

'আমি বাগানে যাব।'

ছেলেটির গলা বাঁশির মতো মিষ্টি, যদিও কথাটা বলল, একেবারে নেড়াভাবে, এক সুরে। প্রায় যেন একটা যন্ত্রের মানুষের ভেতর থেকে কথা বেরোচ্ছে। ডক্টর হাজরা বললেন, 'ঠিক আছে, বাগানে যাও, তবে লক্ষ্মী হয়ে থাকো, গেটের বাইরে যেও না, কেমন?'

ছেলেটি আর কিছু না বলে বারান্দা থেকে এক লাফে নুড়িফেলা জায়গাটায় নামল। তারপর একটা ফুলের লাইন টপকে বাগানের ঘাসের উপর পৌঁছে চুপ করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। ডক্টর হাজরা আমাদের দিকে ফিরে কেমন যেন একটু অপ্ৰস্তুত হাসি হেসে বললেন, 'কোথায় বসবেন?'

'আসুন আমাদের ঘরে।'

ডক্টর হাজরার কানের চুলে পাক ধরেছে। চোখ দুটোয় বেশ একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ আছে। কাছ থেকে দেখে মনে হল বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। আমরা তিনজনে সোফায় বসলাম। ফেলুদা ডক্টর হাজরাকে সুধীরবাবুর চিঠিটা দিয়ে তাঁকে একটা চারমিনার অফার করল। ভদ্রলোক একটু হেসে 'ও রসে বঞ্চিত' বলে চিঠিটা পড়তে লাগলেন।

পড়া হলে পর ডক্টর হাজরা চিঠিটা ভাঁজ করে খামে পুরে রাখলেন।

ফেলুদা এবার নীলুকে কিডন্যাপ করার ঘটনা বলে বলল, 'সুধীরবাবু ভয় পাচ্ছিলেন যে ওই লোকগুলো হয়ত মুকুলকে ধাওয়া করে একেবারে ঘোষণাপুর পর্যন্ত চলে এসেছে। সেই কারণেই উনি বিশেষ চিন্তিত হয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। আমি খানিকটা তাঁর অনুরোধে পড়ে এসেছি। অবিশ্যি দুর্ঘটনা যদি কোনো না ঘটে তাহলেও আমাদের আসাটা যে একেবারে ব্যর্থ হবে তা নয়, কারণ রাজস্থান দেখার শখটা অনেক দিনের।'

ডক্টর হাজরা একটুক্ষণ ভেবে বললেন, 'দুশ্চিন্তার কারণ যাকে বলে সে রকম অবিশ্যি এখনো পর্যন্ত কিছু ঘটেনি। তবে ব্যাপারটা কী জানেন, খবরের কাগজের রিপোর্টারদের অতগুলো কথা না বললেও চলত। আমি সুধীরবাবুকে বলেছিলাম যে ইনভেস্টিগেশনটা সেরে নিই, তারপর আপনি যত ইচ্ছা রিপোর্টার ডাকতে চান ডাকতে পারেন। বিশেষ করে যেখানে গুপ্তধনের কথাটা বলছে। আমি না হয় জানি যে কোনো কথাটারই হয়ত ভিত্তি নেই, কিন্তু কিছু লোক থাকে যারা সহজেই প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে।'

'জাতিস্মর ব্যাপারটা সম্বন্ধে আপনি কী মনে করেন?'

'মনে যা করি সেটাকে তো এখনো পর্যন্ত অন্ধকারে ঢিল মারা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। অথচ ঢিল না মেরেই বা কী করি বলুন। জাতিস্মর যে আগেও এক-আধটা বেরোয়নি তা তো নয়। আর তাদের অনেক কথাই তো ছবছ মিলে গেছে। সেই জন্যেই যখন এই মুকুল ছেলেটির খবর পাই, তখনই ঠিক করি যে একে নিয়ে একটা থরো ইনভেস্টিগেশন করব। যদি দেখি যে এর কথার সঙ্গে সব ডিটেল মিলে যাচ্ছে, তখন সেটাকে একটা প্রামাণ্য ঘটনা হিসেবে ধরে তার উপর গবেষণা চালাব।'

'কিছুদূর এগিয়েছেন কি?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'এইটে অন্তত বুঝেছি যে, রাজস্থান সম্বন্ধে কোনো ভুল করিনি। এখানকার মাটিতে পা দেওয়ার পর থেকে মুকুলের হাবভাব বদলে গেছে। বুঝতেই তো পারছেন, বাপ-মা-ভাই-বোনকে এই প্রথম ছেড়ে একজন অচেনা লোকের সঙ্গে চলে এল, অথচ এই ক'দিনে একটুবার তাদের নাম পর্যন্ত করল না।'

'আপনার সঙ্গে সম্পর্ক কেমন?'

'কোনো গোলমাল নেই। কারণ, বুঝতেই তো পারছেন, আমি ওকে ওর স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে চলেছি। ওর সমস্ত মনটাই তো পড়ে আছে ওর সোনার কেলায় দেশে, আর এখানে এসে কেলা দেখলেই ও লাফিয়ে উঠছে।'

'কিন্তু সোনার কেলা দেখেছে কি?'

ডক্টর হাজরা মাথা নাড়লেন।

‘না। তা দেখিনি। আসবার পথে কিষণগড় দেখিয়ে এনেছি। গতকাল সন্ধ্যায় এখানকার ফোর্টটা দেখেছি বাইরে থেকে। আজ বারমের নিয়ে গিয়েছিলাম। প্রতিবারই বলে—এটা নয়—আরেকটা দেখবে চলো। এ ব্যাপারে ধৈর্য লাগে মশাই। অথচ চিতোর উদয়পুরের দিকটা গিয়ে কোনো লাভ নেই, কারণ ওদিকে বালি নেই। বালির কথা ও বার বার বলে, আর বালি বলতে এদিকটাতেই আছে, আর আগেও তাই ছিল। কাল তাই ভাবছি বিকানিরটা দেখিয়ে আনব।’

‘আমরা আপনার সঙ্গে গেলে আপত্তি নেই তো?’

‘মোটাই না। আর শুধু তাই না। আপনি সঙ্গে থাকলে কিছুটা নিশ্চিত হতে পারব, কারণ... একটা ঘটনা...’

ভদ্রলোক চূপ করলেন। ফেলুদা সিগারেটের প্যাকেটটা পকেট থেকে বার করেছিল, কিন্তু সেটা আর খুলল না।

‘কাল সন্ধ্যায় একটা টেলিফোন এসেছিল,’ ডক্টর হাজরা বললেন।

‘কোথায়?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘এই সার্কিট হাউসে। আমি তখন কেব্লা দেখতে গেছি। কেউ একজন ফোন করে জানতে চেয়েছিল, কলকাতা থেকে একজন ভদ্রলোক একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে কিনা। ম্যানেজার ন্যাচারেলি হ্যাঁ বলে দিয়েছে।’

ফেলুদা বলল, ‘কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে কলকাতার কাগজের খবরটা এখানে কেউ কেউ হয়ত জানে, এবং সেই জন্যেই সেটাকে ভেরিফাই করার জন্যে এখানে ফোন করেছে। যোধপুরে তো বাঙালীর অভাব নেই। এসব ব্যাপারে কৌতূহল জিনিসটা স্বাভাবিক নয় কি?’

‘বুঝলাম। কিন্তু সে লোক আমি এসেছি জেনেও আর খোঁজ করল না কেন? বা এখানে এল না কেন?’

‘হঁ...’ ফেলুদা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। ‘আমার মনে হয় আমি আপনার সঙ্গে থাকারাই ভালো। আর মুকুলকেও একা ছাড়বেন না বেশি।’

‘পাগল!’

ডক্টর হাজরা উঠে পড়লেন।

‘কালকের জন্যে একটা ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করা আছে। আপনারা তো মাত্র দু’জন, তাই একটা ট্যাক্সিতেই হয়ে যাবে।’

ভদ্রলোক যখন দরজার দিকে এগোচ্ছেন তখন ফেলুদা হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসল—

‘ভালো কথা—শিকাগোতে আপনাকে জড়িয়ে একবার কোনো ঘটনা ঘটেছিল কি? এই বছর চারেক আগে?’

ডক্টর হাজরা ভুরু কঁচকোলেন।

‘ঘটনা? শিকাগোতে আমি গেছি বটে...’

‘একটা আধ্যাত্মিক চিকিৎসালয় সংক্রান্ত ব্যাপার...?’

ডক্টর হাজরা হো হো করে হেসে উঠলেন—‘ওহো—সেই স্বামী ভবানন্দের ব্যাপার? যাকে আমেরিকানরা বলত ব্যাব্যানাভা! ঘটেছিল বটে, কিন্তু কাগজে যেটা বেরিয়েছিল সেটা অতিরঞ্জিত। লোকটা ভণ্ড ঠিকই, কিন্তু সে রকম ভণ্ড অনেক হাতুড়ে, অনেক টোটকাওয়ালাদের মধ্যে পাওয়া যায়। তার চেয়ে বেশি কিছু না। ওর বুজরুকি আসলে ধরে ফেলে ওর পেশেন্টরাই। খবরটা রটে যায়। প্রেস থেকে আমার কাছে আসে ওপিনিয়নের জন্য। আমি বরং ওর সম্বন্ধে খানিকটা মোলায়েম করেই বলেছিলাম। কাগজে তিলটাকে তাল করে ছাপায়। তারপর আমার ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয়ও হয়েছিল। আমি নিজেই ওর সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে নিই—অ্যান্ড উই পার্টেড অ্যাজ ফ্রেন্ডস।’

‘ধন্যবাদ। কাগজের রিপোর্ট দেখে আমার ধারণা অন্যরকম হয়েছিল।’

ডক্টর হাজরার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ঘর থেকে বেরোলোম। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পশ্চিমের আকাশটা এখনো লাল, তবে রাস্তার বাতি জ্বলে গেছে। কিন্তু মুকুল কোথায়? বাগানে ছিল সে, কিন্তু এখন দেখছি নেই। ডক্টর হাজরা চট করে একবার নিজের ঘরে ঝুঁজে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে এলেন।

‘ছেলেটা গেল কোথায়’ বলে ভদ্রলোক বারান্দা থেকে বাইরে নামলেন। আমরা তার পিছন পিছন গেলাম বাগানে। বাগানে যে নেই সে ছেলে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

‘মুকুল!’ ডক্টর হাজরা ডাক দিলেন। ‘মুকুল!’

‘ও আপনার ডাক শুনেছে,’ ফেলুদা বলল। ‘ও আসছে।’

আবছা অন্ধকারে দেখলাম মুকুল রাস্তা থেকে গেট দিয়ে ঢুকল। আর সেই সঙ্গে দেখলাম উল্টো দিকের ফুটপাথ দিয়ে একটা লোক দ্রুত হেঁটে পুবদিকে নতুন প্যালেসের দিকটায় চলে গেল। লোকটার মুখ দেখতে পারলাম না বটে, কিন্তু তার গায়ের জামার টকটকে লাল রংটা এই অন্ধকারেও স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। ফেলুদা দেখেছে কি লোকটাকে?

মুকুল এগিয়ে এল আমাদের দিকে। ডক্টর হাজরা হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন। তারপর খুব নরম গলায় বললেন—

‘ওরকমভাবে বাইরে বেরোতে হয় না মুকুল!’

‘কেন?’ মুকুল ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল।

‘অচেনা জায়গা—কতরকম দুষ্ট লোক আছে এখানে।’

‘আমি তো চিনি।’

‘কাকে চেনো?’

মুকুল হাত বাড়িয়ে রাস্তার দিকে দেখাল—

‘ওই যে, যে লোকটা এসেছিল।’

হেমাঙ্গবাবু মুকুলের কাঁধে হাত দিয়ে ফেলুদার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘দ্যাটস্ দা-ট্রাবল। কাকে যে সত্যি করে চেনে আর কাকে যে পূর্বজন্মে চিনত তা বলা মুশকিল।’

লক্ষ করলাম মুকুলের হাতে কী জানি একটা কাগজের টুকরো চক চক করছে। ফেলুদাও দেখেছিল সেটা। বলল, ‘তোমার হাতের কাগজটা একবার দেখব?’

মুকুল কাগজটা দিল। একটা দু’ ইঞ্চি লম্বা আধ ইঞ্চি চওড়া সোনালি রাংতা।

‘এটা কোথায় পেলে মুকুল?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘এইখানে’, বলে মুকুল ঘাসের দিকে আঙুল দেখাল।

‘এটা আমি রাখতে পারি?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘না। ওটা আমি পেয়েছি।’ সেই একই সুর। একই ঠাণ্ডা গলার স্বর। অগত্যা ফেলুদা কাগজটা ফেরত দিয়ে দিল।

ডক্টর হাজরা বললেন, ‘চলো মুকুল, ঘরে যাই। হাত-মুখ ধুয়ে তারপর খেতে যাবো আমরা। চলি মিস্টার মিস্তির। কাল ঠিক সাড়ে সাতটায় আর্লি ব্রেকফাস্ট করে বেরোচ্ছি আমরা।’

খেতে যাবার আগেই ফেলুদা সুধীরবাবুকে পৌঁছ-খবর আর মুকুলের খবর দিয়ে একটা পোস্টকার্ড লিখে দিয়েছিল। স্নানটান সেরে যখন ডাইনিং রুমে পৌঁছেছি ততক্ষণে ডক্টর হাজরা আর মুকুল ঘরে চলে গেছেন। মন্দারবাবুকে দেখলাম উপেটা দিকের কোনায় সেই অবাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে পুডিং খাচ্ছেন। আমাদের সুপ আসতে আসতে তাঁরা উঠে পড়লেন। দরজার দিকে যাবার পথে মন্দার বোস হাত তুলে গুডনাইট জানিয়ে গেলেন।

দু’দিন ট্রেনে পথ চলে বেশ ক্লান্ত লাগছিল। ইচ্ছে ছিল, খেয়ে এসেই ঘুমিয়ে পড়ব, কিন্তু ফেলুদার জন্য একটুক্কণ জেগে থাকতে হল। ফেলুদা তার নীল খাতা নিয়ে সিগারেট ধরিয়ে সোফায় বসেছে, আর আমি খাটে গিয়ে শুয়েছি। সঙ্গে অ্যান্টি-মশা মলম ছিল বলে আর মশারি টাঙাতে দিইনি।

ফেলুদা ডট পেনের পেছনটা টিপে নিবটা বার করে নিয়ে বলল, ‘কার কার সঙ্গে আলাপ হল বল।’

বললাম, ‘কবে থেকে শুরু করব?’

‘সুধীর ধরের আসা থেকে।’

‘তাহলে প্রথমে সুধীরবাবু। তারপর শিবরতন। তারপর নীলু। তারপর

শিবরতনবাবুর চাকর—’

‘নাম কী?’

‘মনে নেই।’

‘মনোহর। তারপর?’

‘তারপর জটায়ু।’

‘আসল নাম কী?’

‘লালমোহন।’

‘পদবী?’

‘পদবী... পদবী... গাঙ্গুলী।’

‘গুড।’

ফেলুদা লিখে চলেছে। আমিও বলে চললাম।

‘তারপর সেই লাল জামা পরা লোকটা।’

‘আলাপ হয়েছিল তার সঙ্গে?’

‘না—তা হয়নি—’

‘ঠিক আছে। নেস্‌ট?’

‘মন্দার বোস। আর তার সঙ্গে যে লোকটা ছিল।’

‘আর মুকুল ধর, ডক্টর—’

‘ফেলুদা!’

আমার চিৎকারে ফেলুদার কথা থেমে গেল। আমার চোখ পড়েছে ফেলুদার বিছানার উপর। কী যেন একটা বিশ্রী জিনিস বালিশের তলা থেকে বেরোতে চেষ্টা করছে। আমি সেদিকে আঙুল দেখালাম।

ফেলুদা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে এসে বালিশটাকে সরিয়ে ফেলতেই একটা কাঁকড়া বিছে বেরিয়ে পড়ল। ফেলুদা বিছানার চাদরটা ধরে একটা ঝটকা টান দিয়ে বিছেটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে চটি দিয়ে তিনটে প্রচণ্ড চাপড় মেরে সেটাকে সাবাড় করল। তারপর একটা খবরের কাগজের টুকরো ছিড়ে নিয়ে খেঁতলানো বিছেটাকে তার মধ্যে তুলে বাথরুমে গিয়ে পিছনের দরজাটা খুলে কাগজটাকে পুঁটলি পাকিয়ে বাইরে ফেলে দিল। তারপর ফিরে এসে বলল, ‘জমাদারের আসার দরজাটা খোলা ছিল, তাই এ ব্যাটা ঢুকতে পেরেছে। নে, তুই এবার ঘুমিয়ে পড়। কাল ভোরে ওঠা আছে।’

আমার কিন্তু মোটেই অতটা নিশ্চিন্ত লাগছিল না। আমার মনে হচ্ছিল—নাঃ, থাক। যদি আমার টেলিপ্যাথির জোর থাকে, তাহলে হয়ত বিপদের কথা বেশি ভাবলেই বিপদ এসে পড়বে। তার চেয়ে ঘুমোনোর চেষ্টা দেখি।

পরদিন সকালে উঠে দাঁতটাত মেজে যেই ঘর থেকে বেরিয়েছি অমনি একটা চেনা গলায় শুনলাম, 'শুভ মর্নিং !' জটায়ু হাজির। ফেলুদা আগেই বারান্দায় বেরিয়ে বেতের চেয়ারে বসে চায়ের অপেক্ষা করছিল। লালমোহনবাবু চোখ গোল গোল করে বললেন, 'ওঃ—কী থ্রিলিং জায়গা মশাই! ফুল অফ পাওয়ারফুল সাস্পিশাস্ ক্যারেকটারস্ !'

'আপনি অক্ষত আছেন তো ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'কী বলছেন মশাই ! এখানে এসে দারুণ ফিট লাগছে। আজ আমাদের লজের ম্যানেজারকে পাঞ্জায় চ্যালেঞ্জ করেছিলুম। ভদ্রলোক রাজী হলেন না।' তারপর এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বললেন, 'আমার কাছে একটি অস্ত্র আছে সুটকেসে—'

'গুলাতি ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'নো স্যার ! একটি নেপালী ভোজালি। খাস কাটমুগুর জিনিস। কেউ অ্যাটাক করলে জয় মা বলে চালিয়ে দেবো পেটের মধ্যে, তারপর যা থাকে কপালে। অনেকদিনের শখ একটা ওয়েপনের কালেকশন করব, বুঝেছেন।'

আমার আবার হাসি পেলো, কিন্তু ক্রমেই সংযম অভ্যাস হয়ে আসছে, তাই সামলে গেলাম। লালমোহনবাবু ফেলুদার পাশের চেয়ারে বসে বললেন, 'আজকের প্ল্যান কী আমাদের ? ফোর্ট দেখতে যাচ্ছেন না ?'

ফেলুদা বলল, 'যাচ্ছি বটে, তবে এখানে নয়, বিকানির।'

'হঠাৎ আগেভাগে বিকানির ? কী ব্যাপার ?'

'সঙ্গী পাওয়া গেছে। গাড়ি যাচ্ছে একটা।'

বারান্দার পশ্চিম দিক থেকে আরেকটা শুভ মর্নিং শোনা গেল। গ্লোব-ট্রটার আসছেন। 'ঘুম হল ভালো ?'

লালমোহনবাবু দেখলাম মন্দার বোসের মিলিটারি গৌফ আর জাঁদরেল চেহারার দিকে বেশ প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখছেন। ফেলুদা দু'জনের আলাপ করিয়ে দিলেন।

'আরেকবাস ! গ্লোব-ট্রটার ?' লালমোহনবাবুর চোখ ছানাভড়া। 'আপনাকে তো তাহলে কালটিভেট করতে হচ্ছে মশাই। অনেক লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা আছে নিশ্চয়ই আপনার !'

'কোন রকমটা চাই আপনার ?' মন্দার বোস হেসে বললেন, 'এক ক্যানিবলের হাঁড়িতে সেন্দ্র হওয়াটাই বাদ ছিল, বাকি প্রায় সব রকমই হয়েছে।'

মুকুল যে কখন বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে তা টেরই পাইনি। এখন দেখলাম সে চুপচাপ একধারে দাঁড়িয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

এবার ডক্টর হাজরাও তৈরি হয়ে বেরিয়ে এলেন। তাঁর এক কাঁধে একটা ফ্লাস্ক, আরেকটায় একটা বাইনোকুলার, আর গলায় বুলছে একটা ক্যামেরা। বললেন, 'প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টার পথ। আপনাদের ফ্লাস্ক থাকলে সঙ্গে নিয়ে নেবেন। পথে কী পাওয়া যাবে ঠিক নেই। আমি হোটেল বলে দিয়েছি—চারটে প্যাকড লাঞ্চ দিয়ে দেবে।'

মন্দার বোস বললেন, 'কোথায় চললেন আপনারা সব ?'

বিকানিরের কথা শুনে ভদ্রলোক মেতে উঠলেন—

'যাওয়াই যদি হয় তাহলে সব এক সঙ্গে গেলেই হয় !'

'দি আইডিয়া !' বললেন জটায়ু।

ডক্টর হাজরা একটু কাচুমাচু ভাব করে বললেন, 'সবসুদ্ধ তাহলে ক'জন যাচ্ছি আমরা ?'

মন্দার বোস বললেন, 'এক গাড়িতে সবাই যাবার প্রশ্নই ওঠে না। আই উইল অ্যারেঞ্জ ফর অ্যানাদার ট্যাক্সি। আমার সঙ্গে মিস্টার মাহেশ্বরীও যাবেন বোধহয়।'

'আপনি যাবেন কি ?' লালমোহনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর হাজরা।

'গেলে শেষারে যাবো। কারুর স্কন্ধে চাপতে রাজী নই। আপনারা চারজন একটাতে যান। আমি মিস্টার গ্লোব-ট্রটারের সঙ্গে আছি।'

বুঝলাম, ভদ্রলোক মন্দারবাবুর কাছ থেকে গল্প শুনে গুঁর প্লটের স্টক বাড়তে চাচ্ছেন। অলরেডি উনি কম করে পঁচিশখানা অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস লিখেছেন। ভালোই হল ; এক গাড়িতে পঁচজন হলে একটু বেশি ঠাসাঠাসি হত। মন্দারবাবু ম্যানেজারকে বলে আরেকটা ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করে ফেললেন। লালমোহনবাবু নিউ বস্বে লজে তৈরি হতে চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, 'আমাকে কাইন্ডলি পিক আপ করে নেবেন। আমি হাফ অ্যান আওয়ারের মধ্যে রেডি হয়ে থাকছি।'

আগেই বলে রাখি—বিকানিরেরকেলাও মুকুল একবার দেখেই বাতিল করে দিয়েছিল। কিন্তু সেটাই আজকের দিনের আসল ঘটনা নয়। আসল ঘটনা ঘটল দেবীকুণ্ডে, আর সেটা থেকেই বুঝতে পারলাম যে, আমরা সত্যিই দুর্ধর্ষ দুশমনের পাল্লায় পড়েছি।

বিকানির যাবার পথে বিশেষ কিছু ঘটেনি, কেবল মাইল ষাটেক যাবার পর একটা বেদের দলকে দেখতে পেলাম রাস্তার ধারে সংসার পেতে বসেছে। মুকুল গাড়ি থামাতে বলে তাদের মধ্যে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে এসে বলল যে, তাদের চেনে।

এরপরে ফেলুদার সঙ্গে ডক্টর হাজারার কিছু কথাবার্তা হয়েছিল মুকুলকে নিয়ে, সেটা এখানে বলে রাখি। এইসব কথা মুকুল ড্রাইভারের পাশে বসে শুনতে পেয়েছিল কিনা জানি না; কিন্তু পেলেও তার হাবভাবে সেটা কিছুই বোঝা যায়নি।

ফেলুদা বলল, ‘আচ্ছা ডক্টর হাজারা, মুকুল তার পূর্বজন্মের কী কী ঘটনা বা জিনিসের কথা বলে সেটা একবার বলবেন?’

হাজারা বললেন, ‘যে জিনিসটার কথা বার বারই বলে সেটা হচ্ছে সোনার কেলা। সেই কেলায় আছেই নাকি ওর বাড়ি ছিল। সেই বাড়ির মেঝের তলায় নাকি ধনরত্ন পোঁতা ছিল। যেরকমভাবে বলে তাতে মনে হয় যে এই ধনরত্ন লুকিয়ে রাখার ব্যাপারটা ওর সামনেই ঘটেছিল। এ ছাড়া যুদ্ধের কথা বলে। বলে, অনেক হাতি, অনেক ঘোড়া, সৈন্য, কামান, ভীষণ শব্দ, ভীষণ চীৎকার। আর বলে উটের কথা। উটের পিঠে সে চড়েছে। আর ময়ূর। ময়ূরে নাকি ওর হাতে ঠোকর মেরেছিল। রক্ত বার করে দিয়েছিল। আর বলে বালির কথা। বালি দেখলেই কীরকম চঞ্চল হয়ে উঠছে সেটা লক্ষ করেননি?’

বিকানির পোঁছলাম সোনে বারোটায়। শহরে পোঁছবার কিছু আগে থেকেই রাস্তা ক্রমে চড়াই উঠেছে; এই চড়াইয়ের উপরেই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা শহর। আর শহরের মধ্যে সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো জিনিস হচ্ছে লালচে রঙের পাথরের তৈরি প্রকাণ্ড দুর্গ।

আমাদের গাড়ি একেবারে সোজা দুর্গের দিকে নিয়ে যাওয়া হল। লক্ষ করলাম, যতই কাছে যাচ্ছি ততই যেন দুর্গটাকে আরো বড় বলে মনে হচ্ছে। বাবা ঠিকই বলেছিলেন। রাজপুতরা যে দারুণ শক্তিশালী জাত ছিল সেটা তাদের দুর্গের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।

দুর্গের গেটের সামনে গিয়ে ট্যান্ডি থামার সঙ্গে সঙ্গেই মুকুল বলে উঠল, ‘এখানে কেন থামলে?’

ডক্টর হাজারা বললেন ‘কেলাটা কি চিনতে পারছ মুকুল?’

মুকুল গভীর গলায় বলল, ‘না। এটা বিচ্ছিরি কেলা। এটা সোনার কেলা না।’

আমরা সবাই গাড়ি থেকে নেমে বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। মুকুলের কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কোথেকে জানি একটা কর্কশ আওয়াজ শোনা গেল আর তৎক্ষণাৎ মুকুল দৌড়ে এসে ডক্টর হাজারাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরল। আওয়াজটা এল কেলায় উল্টোদিকের পার্কটা থেকে।

ফেলুদা বলল, ‘ময়ূরের ডাক। এরকম আগেও হয়েছে কি?’

ডক্টর হাজারা মুকুলের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, ‘কাল

যোধপুরেই হয়েছিল। হি কান্ট স্ট্যান্ড পীকক্স।’

মুকুল দেখলাম ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সে আবার সেই গভীর অথচ মিষ্টি গলায় বলল, ‘এখানে থাকব না।’

ডক্টর হাজারা ফেলুদাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘আমি বরং গাড়িটা নিয়ে এখানকার সার্কিট হাউসে গিয়ে অপেক্ষা করছি। আপনারা অ্যাদূর এসেছেন, একটু ঘুরেটুরে দেখে নিন। আমি গিয়ে গাড়িটা ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের দেখা হলে সার্কিট হাউসে চলে আসবেন। তবে দুটোর বেশি দেরি করবেন না কিন্তু, তাহলে ওদিকে ফিরতে রাত হয়ে যাবে।’

ডক্টর হাজারার উদ্দেশ্য সফল হয়নি ঠিকই কিন্তু আমার তাতে বিশেষ দুঃখ নেই। এই প্রথম একটা রাজপুত কেলায় ভিতরটা দেখতে পাব ভেবেই আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল।

কেলায় গেটের দিকে যখন এগোচ্ছি তখন ফেলুদা আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধে একটা চাপ দিয়ে বলল, ‘দেখলি?’

বললাম, ‘কী জিনিস?’

‘সেই লোকটা।’

বললাম ফেলুদা সেই লাল জামা পরা লোকটার কথা বলছে। কিন্তু ও যদিও তাকিয়ে রয়েছে সেদিকে কোনো লাল জামা দেখতে পেলাম না। অবিশ্যি লোকজন অনেক রয়েছে, কারণ কেলায় গেটের বাইরেটা একটা ছোটখাটো বাজার। বললাম, ‘কোথায় লোকটা?’

‘ইডিয়ট। তুই বুঝি লাল জামা খুঁজছিস?’

‘তবে কোন্ লোকের কথা বলছ তুমি?’

‘তোর মতো বোকসন্দের দুনিয়ায় নেই। তুই শুধু জামাই দেখেছিস, আর কিছুই দেখিসনি। ইট ওয়াস দ্য সেম ম্যান, চাদর দিয়ে নাক অবধি ঢাকা। কেবল আজ পরেছিল নীল জামা। আমরা যখন বেদেদের দেখতে নেমেছিলাম, সেই সময় একটা ট্যান্ডি যেতে দেখি বিকানিরের দিকে। তাতে দেখেছিলাম এই নীল জামা।’

‘কিন্তু এখানে কী করছে লোকটা?’

‘সেটা জানলে তো অর্ধেক বাজি মাত হয়ে যেত।’

লোকটা উধাও। মনে একটা উত্তেজনার ভাব নিয়ে কেলায় বিশাল ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। ঢুকেই একটা বিরাট চাতাল, সেটার ডানদিকে বুকের ছাতি ফুলিয়ে কেলায় দাঁড়িয়ে আছে। দেয়ালের খোপরে খোপরে পায়রার বাসা। বিকানির নাকি হাজার বছর আগে একটা সমৃদ্ধ শহর ছিল, যেটা বহুকাল হল বালির তলায় তলিয়ে গেছে। ফেলুদা বলল যে, কেলায় চারশো বছর আগে রাজা রায় সিং প্রথম তৈরি করতে শুরু করেন। ইনি নাকি আকবরের একজন

বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন।

আমার মনের ভিতরটা কিছুক্ষণ থেকে খচখচ করছে একটা কথা ভেবে। লালমোহনবাবু এখানে এলেন না কেন? তাদের কি তাহলে রওনা হতে দেরি হয়েছে? নাকি রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে? যাক গে। ওদের কথা ভেবে আশ্চর্য ঐতিহাসিক জিনিস দেখার আনন্দ নষ্ট করব না।

যে জিনিসটা সবচেয়ে অদ্ভুত লাগল সেটা হল কেল্লার অস্ত্রাগার। এখানে যে শুধু অস্ত্রই রয়েছে তা নয়, আশ্চর্য সুন্দর একটা রূপোর সিংহাসনও রয়েছে, যার নাম আলম আস্থালি। এটা নাকি মোগল বাদশাহদের উপহার। এ ছাড়া রয়েছে যুদ্ধের বর্ম শিরস্ত্রাণ ঢাল তলোয়ার বহুম ছোরা আর আরো কত কী! এক একটা তলোয়ার এত বিরাট আর এত তাগড়াই যে দেখলে বিশ্বাসই হয় না সেগুলো মানুষের হাতে নিয়ে চালাতে পারে। এগুলো দেখে জটায়ুর কথা যেই মনে পড়েছে, অমনি দেখি আমার টেলিপ্যাথির জোরে ভদ্রলোক হাজির। বিরাট কেল্লার বিরাট ঘরের বিরাট দরজার সামনে তাকে আরো খুঁদে আর আরো হাস্যকর মনে হচ্ছে।

লালমোহনবাবু আমাদের দেখতে পেয়ে এক গাল হেসে চারিদিকে চেয়ে শুধু বললেন, 'রাজপুত্র কি জায়েন্ট ছিল নাকি মশাই। এ জিনিস তো মানুষের হাতে ব্যবহার করার জিনিস নয়!'

যা ভেবেছিলাম তাই। সত্তর কিলোমিটারের মাথায় ওদের ট্যাক্সির একটা টায়ার পাংচার হয়। ফেলুদা বলল, 'আপনার সঙ্গে আর দু'জন কোথায়?'

'ওরা বাজারে কী সব কিনতে লেগেছে। আমি আর থাকতে না পেরে চুকে পড়লুম।'

আমরা ফুল মহল, গজ মন্দির, শীশ মহল আর গঙ্গা নিবাস দেখে যখন চিনি বুর্জে পৌঁছেছি, তখন মন্দার বোস আর মিস্টার মাহেশ্বরীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাঁদের হাতে খবরের কাগজের মোড়ক দেখে বুঝলাম তাঁরা কেনাকাটা করেছেন। মন্দার বোস বললেন, 'ইউরোপে মধ্যযুগের দুর্গটুগগুলোতে যে অস্ত্র দেখেছি, আর এখানেও যা দেখলাম, তাতে একটা জিনিসই প্রমাণ করে: মানুষ জাতটা দিনে দিনে দুর্বল হয়ে আসছে, আর আমার বিশ্বাস সেই সঙ্গে তারা আয়তনেও ছোট হয়ে আসছে।'

'এই আমার মতো বলছেন?' লালমোহনবাবু হেসে বললেন।

'হ্যাঁ। ঠিক আপনারই মতো', মন্দার বোস বললেন, 'আমার বিশ্বাস আপনার ডাইমেনশনের লোক ষোড়শ শতাব্দীর রাজস্থানে একটিও ছিল না। ওহো—বাই দ্য ওয়ে—' মন্দারবাবু ফেলুদার দিকে ফিরলেন, 'আপনার জন্য এইটে এসে পড়েছিল সার্কিট হাউসে রিসেপশন ডেস্কে।'

ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা খাম বার করে ফেলুদাকে দিলেন। তাতে

টিকিট নেই। বোঝাই যায় কোনো স্থানীয় লোক সেটা দিয়ে গেছে।

ফেলুদা চিঠি খুলতে খুলতে বলল, 'আপনাকে কে দিল?'

'আমরা যখন বেরোচ্ছি, তখন বাগরি বলে যে ছোকরাটা রিসেপশনে বসে, সেই দিল। বললে কে কখন রেখে গেছে জানে না।'

ফেলুদা 'এক্সকিউজ মি' বলে চিঠিটা পড়ে আবার খামে পুরে পকেটে রেখে দিল। তাতে কী লেখা আছে কিছুই বুঝতে পারলাম না, জিজ্ঞেসও করতে পারলাম না।

আরো আধঘণ্টা ঘোরার পর ফেলুদা ঘড়ি দেখে বলল, 'এবার সার্কিট হাউসে যেতে হয়।' কেল্লাটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু উপায় নেই।

কেল্লার বাইরে দুটো ট্যাক্সিই দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঠিক হল যে এবার আমরা একই সঙ্গে ফিরব। যখন ট্যাক্সিতে উঠছি, তখন ড্রাইভার বলল ডক্টর হাজরার নাকি সার্কিট হাউসে যাননি। ইয়ো যো লেডকা থা—ও নাকি বলেছে সার্কিট হাউসে যাবে না।

'তবে কোথায় গেছে ওরা?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

তাতে ড্রাইভার বলল, 'ওরা গেছে দেবীকুন্ডে। সেটা আবার কী জায়গা? ফেলুদা বলল, ওখানে নাকি রাজপুত্র যোদ্ধাদের স্মৃতিস্তম্ভ আছে।

পাঁচ মাইল পথ, যেতে লাগল দশ মিনিট। জায়গাটা সত্যিই সুন্দর, আর তেমনি সুন্দর স্মৃতিস্তম্ভগুলো। পাথরের বেদীর উপর পাথরের থাম, তার উপর পাথরের ছাউনি, আর মাথা থেকে পা অবধি সুন্দর কারুকর্ম। এই রকম স্মৃতিস্তম্ভ চারদিকে ছড়ানো রয়েছে কমপক্ষে পঞ্চাশটা। সমস্ত জায়গাটা গাছপালায় ভর্তি, সেই সব গাছে টায়ার দল জটলা করছে, এ-গাছ থেকে ও-গাছ ফুরুর ফুরুর করে উড়ে বেড়াচ্ছে আর ট্যাঁ ট্যাঁ করে ডাকছে। এত টিয়া একসঙ্গে আমি কখনো দেখিনি।

কিন্তু ডক্টর হাজরা কোথায়? আর কোথায়ই বা মুকুল?

লালমোহনবাবুর দিকে চেয়ে দেখি উনি উসখুস করছেন। বললেন, 'ভেরি সাস্পিশাস্ অ্যান্ড মিস্টিরিয়াস্।'

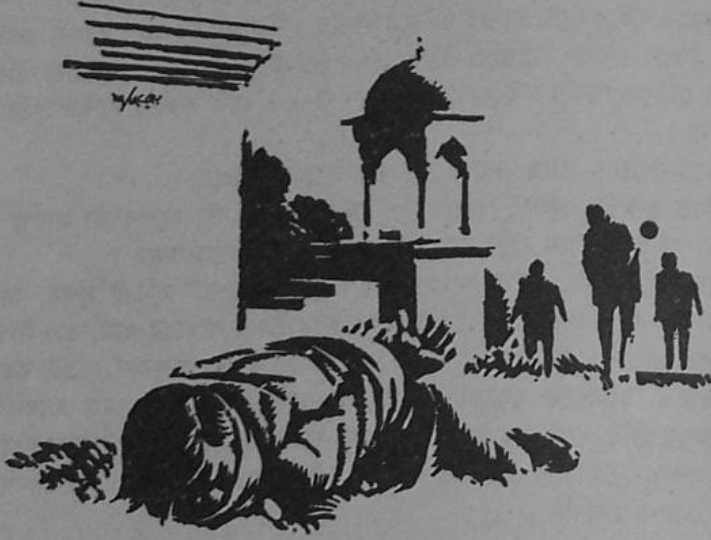
'ডক্টর হাজরা!' মন্দার বোস হঠাৎ এক হাঁক দিয়ে উঠলেন। তাঁর ভারী গলার চীৎকারে এক ঝাঁক টিয়া উড়ে পালাল, কিন্তু ডাকের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

আমরা ক'জনে খুঁজতে আরম্ভ করে দিলাম। স্মৃতিস্তম্ভে স্মৃতিস্তম্ভে জায়গাটা প্রায় একটা গোলকধাঁধার মতো হয়ে রয়েছে। তারই মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে ফেলুদাকে দেখলাম ঘাস থেকে দেশলাইয়ের বাস্ক কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে পুরল।

শেষকালে কিন্তু লালমোহনবাবুই আবিষ্কার করলেন ডক্টর হাজরাকে। তাঁর

চীৎকার শুনে আমরা দৌড়ে গিয়ে দেখি, একটা আমগাছের ছায়ায় শেওলাধরা বেদীর সামনে মুখ আর হাত পিছন দিকে বাঁধা অবস্থায় মাটিতে কুঁকড়ে পড়ে আছেন ডক্টর হাজরা। তাঁর মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত অসহায় গৌঁ গৌঁ শব্দ বেরোচ্ছে।

ফেলুদা হুমড়ি খেয়ে ভদ্রলোকের উপর পড়ে তাঁর হাতের বাঁধন আর মুখের গ্যাগ খুলে দিল। দেখেই মনে হল যেটা দিয়ে বাঁধা হয়েছে সেটা একটা পাগড়ি থেকে ছেঁড়া কাপড়।



মন্দার বোস বললেন, 'ব্যাপার কী মশাই, এমন দশা হল কী করে?'

সৌভাগ্যক্রমে ডক্টর হাজরা জখম হননি। তিনি মাটিতে ঘাসের উপরে বসে কিছুক্ষণ হাঁপালেন। তারপর বললেন, 'মুকুল বলল, সার্কিট হাউসে যাবে না। অগত্যা গাড়ি করে ঘুরতে লাগলাম। এখানে এসে তার জায়গাটা ভালো লেগে গেল। বলল—এগুলো ছত্রী। এগুলো আমি জানি। আমি নেবে দেখব।—নামলাম। ও এদিক ওদিক ঘুরছিল, আমি একটু গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় পেছন থেকে আক্রমণ। হাত দিয়ে মুখটা চেপে মাটিতে উপুড় করে ফেলে হাঁটুটা দিয়ে মাথাটা চেপে রেখে হাত দুটো পিছনে বেঁধে ফেলল। তারপর মুখে ব্যান্ডেজ।'

'মুকুল কোথায়?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল। তার গলার স্বরে উৎকর্ষা।
'জানি না। একটা গাড়ির আওয়াজ পেয়েছিলাম বটে আমাকে বাঁধবার কিছুক্ষণ পরেই।'

'লোকটার চেহারাটা দেখেননি?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

ডক্টর হাজরা মাথা নাড়লেন। 'তবে স্ট্রাগল-এর সময় তার পোশাকের একটা আন্দাজ পেয়েছিলাম। স্থানীয় লোকের পোশাক। প্যান্ট-সার্ট নয়।'

'দেয়ার হি ইজ!' হঠাৎ চৈঁচিয়ে উঠলেন মন্দার বোস।

অবাক হয়ে দেখলাম, একটা ছত্রীর পাশ থেকে মুকুল আপনমনে একটা ঘাস চিবোতে চিবোতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। ডক্টর হাজরা একটা হাঁপ ছাড়ার শব্দ করে 'থ্যাঙ্ক গড' বলে মুকুলের দিকে এগিয়ে গেল।

'কোথায় গিয়েছিলে মুকুল?'

কোনো উত্তর নেই।

'কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ?'

'ওইটার পিছনে।' মুকুল আঙুল দিয়ে একটা ছত্রীর দিকে দেখাল।

'ওরকম বাড়ি আমি দেখেছি।'

ফেলুদা বলল, 'যে লোকটা এসেছিল তাকে তুমি দেখেছিলে?'

'কোন লোকটা?'

ডক্টর হাজরা বললেন, 'ওর দেখার কথা নয়। এখানে এসেই ও দৌড়ে এক্সপ্লোর করতে চলে গেছে। বিকানির এসে এরকম যে একটা কিছু ঘটতে পারে সেটাও ভাবিনি, তাই আমিও ওর জন্য চিন্তা করিনি।'

তা সত্ত্বেও ফেলুদা আবার প্রশ্ন করল, 'তুমি দেখনি লোকটাকে—যে ডক্টর হাজরার হাত-মুখ বাঁধল?'

'আমি সোনার কেলা দেখব।'

বুঝলাম মুকুলকে কোনো প্রশ্ন করা বৃথা।

ফেলুদা হঠাৎ বলল, 'আর টাইম ওয়েস্ট করে লাভ নেই। একদিক দিয়ে ভালোইয়ে মুকুল আপনার সঙ্গে বা আপনার কাছাকাছি ছিল না। থাকলে হয়ত তাকে নিয়েই উধাও হত লোকটা। যদি সে লোক যোধপুর ফিরে গিয়ে থাকে তাহলে যথেষ্ট স্পীডে গাড়ি চালালে হয়ত এখনো তাকে ধরা যাবে।'

দু' মিনিটের মধ্যে আমরা গাড়িতে উঠে রওনা হয়ে গেলাম। লালমোহনবাবু এবার আমাদের সঙ্গে এলেন। বললেন, 'ও লোকগুলো বড্ড ড্রিস্ক করে। আমার আবার মদের গন্ধ সহ্য হয় না।'

পাঞ্জাবী ড্রাইভার হরমিত সিং যাট মাইল পর্যন্ত স্পীড তুলল গাড়িতে। এক জায়গায় রাস্তার মাঝখানে একটা ঘুঘু বসেছিল, সেটা উড়ে পালাতে গিয়ে

আমাদের গাড়ির উইন্ডস্ক্রীনে ধাক্কা খেয়ে মরে গেল। আমি আর মুকুল সামনে বসেছিলাম। একবার পিছন ফিরে দেখলাম, লালমোহনবাবু ফেলুদা আর ডক্টর হাজারার মাঝখানে কুকড়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। তাঁর মুখ ফ্যাকাশে হলেও ঠোঁটের কোণে একটা হাসি দেখে বুঝলাম, তিনি অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়েছেন; হয়ত তাঁর সামনের গল্লের প্লটও মাথায় এসে গেছে।

শ'খানেক মাইল আসার পর বুঝতে পারলাম যে, শয়তানের গাড়ি ধরতে পারার কোনো সম্ভাবনা নেই। সে গাড়িটাও যে নতুন নয়, আর তাতেও যে স্পীড ওঠে না, একথা ভাবলে চলবে কেন!

যোধপুর যখন পৌঁছলাম, তখন শহরের বাতি জ্বলে উঠেছে। ফেলুদা বলল, 'লালমোহনবাবু, আপনাকে নিউ বোসে লজে নামিয়ে দেব তো?'

ভদ্রলোক মিহি গলায় বললেন, 'তা তো বটেই—আমার জিনিসপত্তর তো সব সেখানেই রয়েছে; কিন্তু ভাবছিলুম খাওয়াদাওয়া করে যদি আপনাদের ওখানে... মানে...'

'বেশ তো', ফেলুদা আশ্বাসের সুরে বলল, 'জিঞ্জেস করে দেখব, সার্কিট হাউসে ঘর খালি আছে কিনা। আপনি বরং নটা নাগাদ একটা টেলিফোন করে জেনে নেবেন।'

আমি ভাবছি আজকের ঘটনার কথা। শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছি আমরা, সে কথা বেশ বুঝতে পারছি। এ লোকই কি সেই লাল জামা পরা লোক? যে আজ বিকানির গিয়েছিল নীল জামা পরে? জানি না। এখন পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় ফেলুদাও পারছে না। যদি পারত তাহলে ওর মুখের ভাবই অন্য রকম হয়ে যেতো। অ্যাড্বিন ওর সঙ্গে থেকে আর ওর তদন্তের কায়দাটা দেখে আমি এটা খুব ভালো করেই জেনেছি।

সার্কিট হাউসে পৌঁছে যে যার ঘরের দিকে গেলাম। তিন নম্বরে ঢোকান আগে ফেলুদা ডক্টর হাজারাকে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আমি এই কাপড়টা আমার কাছে রাখছি।' ডক্টর হাজারাকে যে কাপড়টা দিয়ে বাঁধা হয়েছিল সেটা ফেলুদা সঙ্গে নিয়ে নিয়েছিল।

হাজারা বললেন, 'স্বচ্ছন্দে।' তারপর ফেলুদার দিকে এগিয়ে এসে গলা নামিয়ে বললেন, 'বুঝতেই তো পারছেন প্রদোষবাবু, ব্যাপার গুরুতর। যেটা আশঙ্কা করা গিয়েছিল, সেটাই হতে চলেছে। আমি কিন্তু এতটা গোলমাল হবে সেটা অনুমান করিনি।'

ফেলুদা বলল, 'আপনি ভাবছেন কেন? আমি তো রয়েছি। আপনি নির্ভয়ে নিজের কাজ চালিয়ে যান। আমার বিশ্বাস, আপনি যদি আজ দেবীকুণ্ডে না গিয়ে সার্কিট হাউসে যেতেন তাহলে আপনাকে এতটা নাজেহাল হতে হত না।'

অবিশ্যি মুকুলকে যে কিডন্যাপ করতে পারেনি লোকটা এটাই ভাগ্য। এবার থেকে আমাদের কাছাকাছি থাকবেন, তাহলে দুযোগের ভয়টা অনেক কমবে।'

ডক্টর হাজারার মুখ থেকে দৃষ্টিভার ভাবটা গেল না। বললেন, 'আমি কিন্তু আমার নিজের জন্য ভাবছি না। বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ব্যাপারে অনেক রিস্ক নিতে হয়। ভাবছি আপনাদের দুজনের জন্য। আপনারা তো একেবারে বাইরের লোক।'

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'ধরে নিন আমিও একজন বৈজ্ঞানিক, আমিও গবেষণা করছি, আর সেই কারণে আমিও রিস্ক নিচ্ছি।'

মুকুল এতক্ষণ বারান্দার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পায়চারি করছিল, ডক্টর হাজারা এবার তাকে ডেকে নিয়ে আমাদের গুড নাইট জানিয়ে অনামনস্কভাবে তাঁর ঘরে চলে গেলেন। আমরাও আমাদের ঘরে ঢুকলাম। বেয়ারাকে ডেকে ঠাণ্ডা কোকাকোলা আনতে বলে ফেলুদা সোফায় বসে পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বার করে চিন্তিতভাবে সেগুলোকে টেবিলের উপর রাখল। তারপর অন্য পকেট থেকে বের করল একটা দেশলাই—যেটা দেবীকুণ্ডে কুড়িয়ে পেয়েছিল। টেকা-মার্কা দেশলাই। বাস্ক খালি। সেটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'এই যে রেলের আসতে এতগুলো স্টেশনে এতগুলো পান-সিগারেটওয়ালাকে দেখলি, তাদের কারুর কাছে টেকা দেশলাই ছিল কিনা লক্ষ করেছিলি?'

আমি সত্যি কথাটা বললাম। 'না ফেলুদা, লক্ষ করিনি।'

ফেলুদা বলল, 'পশ্চিম অঞ্চলের কোনো দোকানে টেকা দেশলাই থাকার কথা নয়। রাজস্থানে টেকা বিক্রি হয় না। এ দেশলাই রাজস্থানের বাইরে থেকে আনা।'

'তার মানে এটা সেই লাল জামা পরা লোকটার নয়?'

'তোর প্রশ্নটা খুবই কাঁচা হল। প্রথমত রাজস্থানী পোশাক পরলেই একটা লোক রাজস্থানী হয় না। ওটা যে-কেউ পরতে পারে। আর দ্বিতীয়ত, ওই লোক ছাড়াও আরো অনেকেই আজ দেবীকুণ্ডে গিয়ে কুকীর্তিটা করার সুযোগ পেয়েছে।'

'তা তো বটেই! কিন্তু তাদের তো কাউকেই আমরা চিনি না, কাজেই ও নিয়ে ভেবে কী লাভ?'

'এটাও খুব কাঁচা কথা হল। মাথা খাটাতে শিখলি না এখনো তুই। লালমোহন, মন্দার বোস এবং মাহেশ্বরী—এরা কত দেবীতে কেলায় পৌঁছেছে সেটা ভেবে দ্যাখ। আর তারপর ভেবে দ্যাখ—'

'বুঝেছি, বুঝেছি!'

সত্যিই তো! এটা তো আমার মাথাতেই আসেনি ওদের আসতে প্রায়

পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরি হয়েছিল। লালমোহনবাবু বললেন, গাড়ির টায়ার পাংচার হয়েছিল। যদি না হয়ে থাকে? যদি তিনি মিথ্যে কথা বলে থাকেন? কিংবা সেটা যদি সত্যি হয়ে থাকে, আর লালমোহনবাবু যদি নির্দোষ হয়ে থাকেন, মন্দার বোস আর মাহেশ্বরী তো বাজার না করে দেবীকুণ্ডে গিয়ে থাকতে পারেন।

ফেলুদা এবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পকেট থেকে আরেকটা জিনিস বার করল। সেটা দেখেই হঠাৎ বুকটা ধড়াস করে উঠল। এটার কথা এতক্ষণ মনেই ছিল না। এটা সেই মন্দার বোসের দেওয়া চিঠিটা।

‘ওটা কার চিঠি ফেলুদা?’ কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম আমি।

‘জানি না’, বলে ফেলুদা চিঠিটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। হাতে নিয়ে দেখি সেটা ইংরিজিতে লেখা চিঠি। মাত্র একটা লাইন—বড় হাতের অক্ষরে ডট পেন দিয়ে লেখা—

‘ইফ ইউ ভালু ইয়োর লাইফ—গো ব্যাক টু ক্যালকাটা ইমিডিয়েটলি।’

অর্থাৎ তোমার জীবনের প্রতি যদি তোমার মায়ী থাকে, তাহলে এক্ষুনি কলকাতায় ফিরে যাও।

আমার হাতে চিঠিটা কাঁপতে লাগল। আমি চট করে সেটা টেবিলের উপর রেখে হাত দুটোকে কোলের উপর জড়ো করে নিজেকে স্টেডি করার চেষ্টা করলাম।

‘কী করবে ফেলুদা?’

সিলিং-এর ঘুরন্ত পাখাটার দিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে ফেলুদা প্রায় আপন মনেই বলল, ‘মাকড়সার জাল...জিয়োমেট্রি...। এখন অন্ধকার...দেখা যাচ্ছে না...রোদ উঠলে জালে আলো পড়বে—চিক্ চিক্ করবে...তখন ধরা পড়বে জালের নকশা!...এখন শুধু আলোর অপেক্ষা...’

॥ ৭ ॥

কাল মাঝরাতিরে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল একবার, তখন সময় ক’টা জানি না, দেখলাম ফেলুদা বেড-সাইড ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে তার নীল খাতায় কী জানি লিখেছে। ও কত রাত পর্যন্ত কাজ করেছিল জানি না। কিন্তু সকাল সাড়ে ছ’টায় উঠে দেখলাম, ও তার আগেই উঠে দাড়িটাড়ি কামিয়ে রেডি। ও বলে, মানুষের ব্রেন যখন খুব বেশি কাজ করে, তখন ঘুম আপনা থেকেই কমে যায়; কিন্তু তাতে নাকি শরীর খারাপ হয় না। অন্তত ওর তো তাই ধারণা, আর ওর শরীর গত দশ বছরে একদিনের জন্যেও খারাপ হয়েছে বলে তো মনে পড়ে না। আমি জানতাম যে যোধপুরে এসেও ও যোগব্যায়াম বন্ধ করেনি। আজকেও জানি আমার ঘুম ভাঙার আগেই ওর সে-কাজটা সারা হয়ে গেছে।

ডাইনিং রুমে ব্রেকফাস্ট খেতে গিয়ে সকলের সঙ্গেই দেখা হল। লালমোহনবাবু কাল রাতেই সার্কিট হাউসে চলে এসেছিলেন। তিনি বারান্দার পশ্চিম অংশটাতে মন্দার বোসের দুটো ঘর পরেই রয়েছে। ভদ্রলোক ডিমের অমলেট খেতে খেতে বললেন, তাঁর নাকি চমৎকার একটা প্লট মাথায় এসেছে। উক্টর হাজরা একদম মুষড়ে পড়েছেন; বললেন যে রাতে নাকি তাঁর ভালো ঘুম হয়নি। একমাত্র মুকুলই দেখলাম নির্বিকার।

মন্দার বোস আজ প্রথম সরাসরি উক্টর হাজরার সঙ্গে কথা বললেন—

‘কিছু মনে করবেন না মশাই, আপনি যে উক্টর জিনিস নিয়ে রিসার্চ করছেন, তাতে এ ধরনের গণ্ডগোল হবেই। যে দেশে কুসংস্কারের এত ছড়াছড়ি, সে দেশে এসব জিনিস বেশি না ঘাঁটানোই ভালো। শেষকালে দেখবেন, ঘরে ঘরে সব কচি ছোকরারা নিজেদের জাতিস্মর বলে ক্রেম করছে। তলিয়ে দেখলে দেখবেন, ব্যাপারটা আর কিছুই না, তাদের বাপেরা একটু পাবলিসিটি চাইছে, ব্যাস। তখন আপনি ঠালা সামলাবেন কী করে? ক’টা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বিদেশে বিঁড়িয়ে চরে বেড়াবেন?’

উক্টর হাজরা কোনো মন্তব্য করলেন না। লালমোহনবাবু এর-ওর মুখের দিকে চাইলেন, কারণ জাতিস্মর ব্যাপারটা উনি এখনো কিছু জানেন না।

ফেলুদা আগেই বলেছিল যে ব্রেকফাস্ট সেরে একটু বাজারের দিকে যাবে। আমি জানতাম সেটা নিশ্চয়ই শুধু শহর দেখার উদ্দেশ্যে নয়। সৌনে আটটার সময় আমরা বেরিয়ে পড়লাম। দু’জন নয়, তিনজন। লালমোহনবাবুও আমাদের সঙ্গে নিলেন। আমি এর মধ্যে দু-একবার ভদ্রলোককে দুশমন হিসেবে কল্পনা করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু প্রতিবারই এত হাসি পেল যে বাধ্য হয়ে সেটা মন থেকে দূর করতে হল।

সার্কিট হাউসের দিকটা নিরিবিলা আর খোলামেলা হলেও শহরটা গিজগিজে। প্রায় সব জায়গা থেকেই পুরানো পাঁচিলটা দেখা যায়। সেই পাঁচিলের গায়ে দোকানের সারি, টাঙ্গার লাইন, লোকের থাকবার বাড়ি আর আরো কত কী। পাঁচশো বছর আগেকার শহরের চিহ্ন আজকের শহরের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

আমরা এ-দোকান সে-দোকান দেখতে দেখতে হেঁটে চলেছি। ফেলুদা কিছু একটা খুঁজছে সেটা বুঝতে পারলাম, কিন্তু সেটা যে কী সেটা বুঝলাম না। লালমোহনবাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, ‘হাজরা কিসের ডাক্তার বলুন তো? আজ আবার টেবিলে মিস্টার ট্রটার কী সব বলছিলেন...’

ফেলুদা বলল, ‘হাজরা একজন প্যারাসাইকলজিস্ট।’

‘প্যারাসাইকলজিস্ট?’ লালমোহনবাবুর ভুরু কঁচুকে গেল। ‘সাইকলজির

আগে যে আবার প্যারা বসে সেটা তো জানতুম না মশাই। টাইফয়েডের আগে বসে সেটা জানি। তার মানে কি হাফ-সাইকলজি—প্যারা-টাইফয়েড যেমনি হাফ-টাইফয়েড ?

ফেলুদা বলল, 'হাফ নয়, প্যারা মানে হচ্ছে অ্যাবনরম্যাল। মনস্তত্ত্ব ব্যাপারটা এমনই ধোঁয়াটে; তার মধ্যেও আবার যে দিকটা বেশি ধোঁয়াটে, সেটা প্যারাসাইকলজির আন্ডারে পড়ে।'

'আর জাতিস্মরের কথা কী যেন বলছিলেন!'

'মুকুল ইজ এ জাতিস্মর। অন্তত তাই বলা হয় তাকে।'

লালমোহনবাবুর মুখ হাঁ হয়ে গেল।

'আপনি প্লটের অনেক খোরাক পাবেন', ফেলুদা বলল, 'ছেলেটি পূর্বজন্মে দেখা একটা সোনার কেল্লার কথা বলে। আর সে নাকি একটা বাড়িতে থাকত যার মাটিতে গুপ্তধন পোঁতা ছিল।'

'আমরা কি সেই সবার খোঁজে যাচ্ছি নাকি মশাই?' লালমোহনবাবুর গলা ঘড়ঘড়ে হয়ে গেছে।

'আপনি যাচ্ছেন কিনা জানি না, তবে আমরা যাচ্ছি।'

লালমোহনবাবু রাস্তার মাঝখানে দু-হাত দিয়ে খপ করে ফেলুদার হাত ধরে ফেলল।

'মশাই—চান্স অফ এ লাইফটাইম। আমায় ফেলে ফস্ করে কোথাও চলে যাবেন না—এইটেই আমার রিকোর্য়েস্ট।'

'এরপর কোথায় যাবো এখনো কিছুই ঠিক হয়নি।'

লালমোহনবাবু কী জানি ভেবে বললেন, 'মিস্টার ট্রটার কি আপনাদের সঙ্গে যাবেন নাকি?'

'কেন? আপনার আপত্তি আছে?'

'লোকটা পাওয়ারফুলি সাস্পিশাস্!'

রাস্তার একধারে একটা জুতোওয়াল বসেছে, তার চারিদিকে ঘিরে নাগরার ছড়াছড়ি। এখানকার লোকেরা এই ধরনের নাগরাই পরে। ফেলুদা জুতোগুলোর সামনে দাঁড়াল।

'পাওয়ারফুল তো জানি। সাস্পিশাস্ কেন?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'কাল গাড়িতে যেতে যেতে খুব বাক্তান্না মারছিল। বলে—ট্যাঙ্কনিকায় নাকি নেকড়ে মেরেছে নিজে বন্দুক দিয়ে। অথচ আমি জানি যে সারা আফ্রিকার কোনো তল্লাটে নেকড়ে জানোয়ারটাই নেই। মার্টিন জনসনের বই পড়েছি আমি—আমার কাছে ধাপ্পা!'

'আপনি কী বললেন?'

'কী আর বলব? ফস্ করে মুখের ওপর তো লায়ার বলা যায় না! দু'জনের মাঝখানে স্যান্ডউইচ হয়ে বসে আছি। আর লোকটার ছাতি দেখেছেন তো? কমপক্ষে ফটিফাইভ ইঞ্চিজ। আর রাস্তার দু'ধারে দেখছি ইয়া ইয়া মনসার ঝোপড়া—কনট্রাডিক্ট করলুম, আর অমনি কোলপাঁজা করে তুলে নিয়ে যদি ওই একটা ঝোপড়ার পেছনে ফেলে দিয়ে চলে যায়—ইন নো টাইম মশাই শকুনির স্কোয়াড্রন এসে ল্যান্ড করে ফিস্টি লাগিয়ে দেবে।'

'আপনার লাশে ক'টা শকুনের পেট ভরবে বলুন তো?'



'হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ...'

ফেলুদা ইতিমধ্যে পায়ের স্যান্ডেল খুলে নাগরা পরে পায়চারি শুরু করে দিয়েছে। লালমোহনবাবু বললেন, 'ভেরি পাওয়ারফুল শুজ—কিনছেন নাকি?'

'একটা পরে দেখুন না,' ফেলুদা বলল।

ভদ্রলোকের পায়ের মাপের মতো ছোট জুতো অবিশ্যি দোকানে ছিল না, তাও তার মধ্যে যে জোড়াটা সবচেয়ে ছোট সেটা পরে তিনি প্রায় আঁতকে উঠলেন।

‘এ যে গণ্ডারের চামড়া মশাই ! এ তো গণ্ডার ছাড়া আর কারুর পায়ে সুট করবে না !’

‘তাহলে ধরে নিন রাজস্থানের শতকরা নব্বই ভাগ লোক আসলে গণ্ডার ।’
দু’জনেই নাগরা খুলে যে যার জুতো পরে নিল । দোকানদারও হাসছিল । সে বুঝেছে শহরের বাবুরা ছোটলোকদের জুতো পায়ে দিয়ে একটু রসিকতা করছে ।
আমরা এগিয়ে চললাম । একটা পানের দোকান থেকে বেদম জোরে রেডিওতে ফিল্মের গানের আওয়াজ বেরোচ্ছে । মনে পড়ে গেল কলকাতার পূজো প্যাণ্ডেলের কথা । এখানে পূজো নেই, আছে দসেরা । কিন্তু তার এখনো অনেক দেরী ।

আরো কিছু দূর এগিয়ে ফেলুদা একটা পাথরের তৈরি জিনিসের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গেল । দোকানটার চেহারা বেশ ভদ্র, নাম সোলাঙ্কি স্টোর্স । বাইরে কাঁচের জানালার পিছনে সুন্দর সুন্দর পাথরের ঘটি বাটি গেলাস পাত্র সাজানো রয়েছে । ফেলুদা একদৃষ্টে সেগুলোর দিকে চেয়ে আছে । দোকানদার দরজার মুখটাতে এগিয়ে এসে আমাদের ভিতরে আসতে অনুরোধ করল ।

ফেলুদা জানালার দিকে দেখিয়ে বলল, ‘ওই বাটিটা একবার দেখতে পারি ?’

দোকানদার জানালার বাটিটা না বার করে ভিতরের একটা আলমারি থেকে ঠিক সেই রকমই একটা বাটি বার করে দিল । সুন্দর হলদে রঙের পাথরের বাটি । আগে কখনো এরকম জিনিস দেখেছি বলে মনে পড়ে না ।

‘এটা কি এখানকার তৈরি ?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল ।

দোকানদার বলল, ‘রাজস্থানেরই জিনিস, তবে যোধপুরের নয় ।’

‘তবে কোথাকার ?’

‘জয়সলমীর । এই হলদে পাথর শুধু ওখানেই পাওয়া যায় ।’

‘আই সী...’

জয়সলমীর নামটা আমি আবছা আবছা শুনেছি । জয়গাটা যে রাজস্থানের ঠিক কোনখানে সেটা আমার জানা ছিল না । ফেলুদা বাটিটা কিনে নিল । সাড়ে নটা নাগাদ টান্ডার ঝাঁকুনি খেয়ে সকালের ডিম-রুটি হজম করে আমরা সার্কিট হাউসে ফিরলাম ।

মন্দার বোস বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন । আমাদের হাতে প্যাকেট দেখে বললেন, ‘কী কিনলেন ?’

ফেলুদা বলল, ‘একটা বাটি । রাজস্থানের একটা মেমেন্টো রাখতে হবে তো ।’

‘আপনার বন্ধু তো বেরোলেন দেখলাম ।’

‘কে, ডক্টর হাজারা ?’

‘নটা নাগাদ বেরিয়ে যেতে দেখলাম একটা ট্যান্ডি করে ।’

‘আর মুকুল ?’

‘সঙ্গেই গেছে । বোধ হয় পুলিশে রিপোর্ট করতে গেছেন । কালকের ঘটনার পর হি মাস্ট বি কোয়াইট শেকন ।’

লালমোহনবাবু ‘প্লটটা একটু চেঞ্জ করতে হবে’ বলে তাঁর ঘরে চলে গেলেন । ঘরে গিয়ে ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘হঠাৎ বাটিটা কিনলে কেন ফেলুদা !’
ফেলুদা সোফায় বসে বাটিটা মোড়ক থেকে খুলে টেবিলের উপর রেখে বলল, ‘এটার একটা বিশেষত্ব আছে ।’

‘কী বিশেষত্ব ?’

‘জীবনে এই প্রথম একটা বাটি দেখলাম যেটাকে সোনার পাথরবাটি বললে খুব ভুল বলা হয় না ।’

এর পরে আর কোনো কথা না বলে সে ব্র্যাডশর পাতা উল্টোতে আরম্ভ করল । আমি আর কী করি । জানি এখন ঘটনাখানেক ফেলুদার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোবে না, বা তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে তার উত্তর পাওয়া যাবে না, তাই অগত্যা বাইরে বেরোলাম ।

লম্বা বারান্দাটা এখন খালি । মন্দারবাবু উঠে গেছেন । দূরে একজন মেমসাহেব বসেছিলেন, তিনিও উঠে গেছেন । একটা ঢোলকের আওয়াজ ভেসে আসছে । এবার তার সঙ্গে একটা গান শুরু হল । গেটের দিকে চেয়ে দেখলাম, দুটো ভিথিরি গোছের লোক—একটা পুরুষ আর একটা মেয়ে—গেট দিয়ে ঢুকে আমাদের বারান্দার দিকে এগিয়ে আসছে । ছেলেটা ঢোলক বাজাচ্ছে আর মেয়েটা গান গাইছে । আমি বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গেলাম ।

মাঝখানের খোলা জায়গাটায় গিয়ে ইচ্ছে হল একবার দোতলায় যাই । সিঁড়িটা প্রথম দিন থেকেই দেখছি, আর জানি যে উপরে ছাত আছে । উঠে গেলাম সিঁড়ি দিয়ে ।

দোতলার মাঝখানে পাশাপাশি খানচারেক ঘর । সেগুলোর দু-দিকে পুবে আর পশ্চিমে খোলা ছাত । ঘরগুলোতে লোকজন নেই বলেই মনে হল । কিংবা হয়ত যারা আছে তারা বেরিয়েছে ।

পশ্চিম দিকের ছাতটায় গিয়ে দেখি যোধপুরের কেলাটা দারুণ দেখাচ্ছে সেখান থেকে ।

নিচে ভিথিরির গান হয়ে চলেছে । সুরটা চেনা চেনা লাগছে । কোথায় শুনেছি এ সুর ? হঠাৎ বুঝতে পারলাম, মুকুল যে সুরে গুনগুন করে, তার সঙ্গে এর খুব মিল আছে । বার বার একই সুর ঘুরে ঘুরে আসছে, কিন্তু শুনতে একঘেয়ে লাগছে না । আমি ছাতের নিচু পাঁচিলটার দিকে এগিয়ে গেলাম । এদিকটা হচ্ছে সার্কিট হাউসের পিছন দিক ।

ওমা, পিছনেও যে বাগান আছে তা তো জানতাম না ! আমাদের ঘরের পিছন দিকে জানালা দিয়ে একটা ঝাউ গাছ দেখা যায় বটে, কিন্তু এতখানি জায়গা জুড়ে এত রকম গাছ আছে এদিকটায় সেটা বুঝতে পারিনি ।

ঝলমলে নীল ওটা কী নড়ছে গাছপালার পিছনে ? ওহো—একটা ময়ূর । গাছের পিছনে লুকোনো ছিল শরীরের খানিকটা, তাই বুঝতে পারিনি । এবারে পুরো শরীরটা দেখা যাচ্ছে । মাটি থেকে ঝুঁটে ঝুঁটে কী যেন খাচ্ছে । পোকাতোকা বোধ হয় ; ময়ূর তো পোকা খায় বলেই জানি । হঠাৎ মনে পড়ল কোথায় যেন পড়েছিলাম যে, ময়ূরের বাসা ঝুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল । তারা বেছে বেছে নাকি অদ্ভুত সব গোপন জায়গা বার করে বাসা তৈরি করে ।

আস্তু আস্তু পা ফেলে ময়ূরটা এগোচ্ছে, লম্বা গলাটাকে বঁকিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে দেখছে, শরীরটা ঘুরলে সমস্ত লেজটা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে যাচ্ছে ।

হঠাৎ ময়ূরটা দাঁড়াল । গলাটা ডান দিকে ঘোরালো । কী দেখছে ময়ূরটা ? নাকি কোনো শব্দ শুনেছে ?

ময়ূরটা সরে গেল । কী জানি দেখে ময়ূরটা সরে যাচ্ছে ।

একজন লোক । আমি যেখানে দাঁড়িয়েছি তার ঠিক নিচে । গাছের ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে । লোকটার মাথায় পাগড়ি । খুব বেশি বড় না—মাঝারি । গায়ে সাদা চাদর জড়ানো । একেবারে ওপর থেকে দেখছি বলে লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না । খালি পাগড়ি আর কাঁধ । হাত দুটো চাদরের তলায় ।

লোকটা পা টিপে টিপে এগোচ্ছে । পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে । আমি রয়েছে পশ্চিমের ছাতে । পূর্ব দিকে একতলায় আমাদের ঘর ।

হঠাৎ ইচ্ছে করল লোকটা কোথায় যায় দেখি ।

মাঝের ঘরগুলো দৌড়ে পেরিয়ে গিয়ে উপেটা দিকের ছাতের পিছনের পাঁচিলের কাছে গিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়লাম ।

লোকটা এখন আবার আমার ঠিক নিচে । ছাতের দিকে চাইলে আমাকে দেখতে পাবে, কিন্তু দেখল না ।

এগিয়ে আসছে সামনের দিকে লোকটা । আমাদের ঘরের জানালার দিকে এগিয়ে আসছে । হাতটা চাদরের ভিতর থেকে বার করল । কবজির কাছটায় চকচকে ওটা কী ?

লোকটা থেমেছে । আমার গলা শুকিয়ে গেছে । লোকটা আরেক পা এগোল—

‘কাঁ ও য়াঁ !’

লোকটা চমকে পিছিয়ে গেল । ময়ূরটা কর্কশ স্বরে ডেকে উঠেছে । আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই আমিও চৌঁচিয়ে উঠলাম—

‘ফেলুদা !’

পাগড়ি পরা লোকটা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল, আর আমিও দুড়দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বারান্দা দিয়ে এক নিশ্বাসে দৌড়ে গিয়ে আমাদের ঘরে দরজার মুখে ফেলুদার সঙ্গে দড়াম করে কলিশন খেয়ে ভাবাচ্যাকা চুপ !

আমাকে ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলুদা বলল, ‘কী ব্যাপার বল তো ?’

‘ছাত থেকে দেখলাম, একটা লোক...পাগড়ি পরে...তোমার জানালার দিকে আসছে...’

‘দেখতে কীরকম ? লম্বা ?’

‘জানি না...উপর থেকে দেখছিলাম তো !...হাতে একটা...’

‘হাতে কী ?’

‘ঘড়ি...’

আমি ভেবেছিলাম ফেলুদা ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেবে কিংবা আমাকে বোকা আর ভীতু বলে ঠাট্টা করবে । কিন্তু তার কোনোটাই না করে ও গম্ভীরভাবে জানালাটার দিকে গিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে এদিক ওদিক দেখে নিল ।

দরজায় একটা টোকা পড়ল ।

‘কাম ইন ।’

বেয়ারা কফি নিয়ে ঢুকল ।

‘সেলাম সা’ব !’

টেবিলের উপর কফির ট্রেটা রেখে পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা চিঠি বার করে ফেলুদাকে দিল ।

‘মেনেজার সা’বনে দিয়া ।’

বেয়ারা চলে গেল । ফেলুদা চিঠিটা পড়ে একটা হতাশার ভাব করে ধপ করে সোফার উপর বসে পড়ল ।

‘কার চিঠি ফেলুদা ?’

‘পড়ে দ্যাখ্ ।’

ডক্টর হাজারার চিঠি । ডক্টর হাজারার নাম লেখা প্যাডের কাগজে ইংরিজিতে লেখা ছোট্ট চার লাইনের চিঠি—‘আমার বিশ্বাস আমাদের পক্ষে আর যোধপুরে থাকা নিরাপদ নয় । আমি অন্য আরেকটা জায়গায় চললাম, সেখানে কিছুটা সাফল্যের আশা আছে মনে হয় । আপনি আর আপনার ভাইটি কেন আর মিথ্যা বিপদের মধ্যে জড়াবেন ; তাই আপনাদের কাছে বিদায় না নিয়েই চললাম । আপনাদের মঙ্গল কামনা করি ।—ইতি এইচ এম হাজারা ।’

ফেলুদা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, ‘অত্যন্ত হেস্টি কাজ করেছেন ভদ্রলোক ।’

তারপর কফি না খেয়েই সোজা চলে গেল রিসেপশন কাউন্টারে। আজ একটি নতুন ভদ্রলোক বসে আছেন সেখানে। ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, 'ডক্টর হাজারা কি ফিরবেন বলে গেছেন?'

'না তো। উনি ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে গেছেন। ফেরার কথা তো কিছু বলেননি।'

'কোথায় গেছেন সেটা আপনি জানেন?'

'স্টেশনে গেছেন এটাই শুধু জানি।'

ফেলুদা একটুক্কণ ভেবে বলল, 'জয়সলমীর তো এখান থেকে ট্রেনে যাওয়া যায়, তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বছর দুয়েক হল ডিরেক্ট লাইন হয়েছে।'

'কখন ট্রেন?'

'রাত দশটা।'

'সকালের দিকে কোনো ট্রেন নেই?'

'যেটা আছে সেটা অর্ধেক পথ যায়, পোকরান পর্যন্ত। সেটা এই আধ ঘণ্টা হল ছেড়ে গেছে। পোকরান থেকে যদি গাড়ির ব্যবস্থা থাকে তা হলে অবিশ্যি এ ট্রেনটাতেও জয়সলমীর যাওয়া যায়।'

'কতটা রাস্তা পোকরান থেকে?'

'সত্তর মাইল।'

'সকালে যোধপুর থেকে অন্য কী ট্রেন আছে?'

ভদ্রলোক একটা বইয়ের পাতা উল্টেপাল্টে দেখে বললেন, 'আটটায় একটা প্যাসেঞ্জার আছে, সেটা বারমের যায়। নটায় আছে রেওয়ারি প্যাসেঞ্জার। দ্যাটস্ অল।'

ফেলুদা কাউন্টারের উপর ডান হাতের আঙুলের ডগা দিয়ে কয়েকবার অসহিষ্ণুভাবে টোকা দিয়ে বলল, 'জয়সলমীর তো এখান থেকে প্রায় দু'শো মাইল, তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনি অনুগ্রহ করে একটা ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করে দেবেন? আমরা সাড়ে এগারোটা নাগাদ বেরোতে চাই।'

ভদ্রলোক সম্মতি জানিয়ে টেলিফোন তুললেন।

'কোথায় চললেন আপনারা?'

মন্দার বোস। স্নানটান করে ফিটফাট হয়ে হাতে সুটকেস নিয়ে বেরিয়েছেন ঘর থেকে।

ফেলুদা বলল, 'একটু থর মরুভূমিটা দেখার ইচ্ছে আছে।'

'ও, তার মানে নর্থ-ওয়েস্ট। আমি যাচ্ছি একটু ইস্টে।'

'আপনিও চললেন?'

'মাই ট্যাক্সি শুউ বি হিয়ার এনি মিনিট নাউ। বেশি দিন এক জায়গায় মন টেকে না মশাই। আর আপনারাও যদি চলে যান তা হলে তো সার্কিট হাউস খালি হয়ে যাচ্ছে এমনিতেও।'

কাউন্টারের ভদ্রলোক কথা শেষ করে টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে বললেন, 'ইটস অ্যারেঞ্জড।'

ফেলুদা একবার আমাকে বলল, 'দ্যাখ তো লালমোহনবাবুর দেখা পাস কিনা। বল যে, আমরা এগারোটায় জয়সলমীর যাচ্ছি। যদি উনি আসতে চান আমাদের সঙ্গে, তাহলে যেন ইমিডিয়েটলি তৈরি হয়ে নেন।'

আমি ছুটলাম দশ নম্বর ঘরের দিকে। কী উদ্দেশ্যে যে জয়সলমীর যাচ্ছি জানি না। ফেলুদা অন্য সব জায়গা ফেলে এ জায়গাটা বাছল কেন? বোধ হয় মরুভূমির কাছে বলে। ডক্টর হাজারাও কি জয়সলমীর গেছেন? এই কি আমাদের বিপদের শেষ? না এই সবে শুরু?

॥ ৮ ॥

যোধপুর থেকে পোকরান প্রায় একশো কুড়ি মাইল রাস্তা। সেখান থেকে জয়সলমীর আবার সত্তর মাইল। সবসুদ্ধ এই দু'শো মাইল যেতে আন্দাজ সাড়ে ছয় সাত ঘণ্টা লাগা উচিত। অন্তত আমাদের ড্রাইভার গুরুবচন সিং তাই বলল। বেশ গোলগাল হাসিখুশি শিখ ড্রাইভারটিকে লক্ষ করছিলাম মাঝে মাঝে স্টিয়ারিং থেকে হাত দুটো সরিয়ে নিয়ে মাথার পিছনে দিয়ে শরীরটা পিছন দিকে হেলিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। গাড়ি অবিশ্যি তখনো চলছে, আর স্টিয়ারিং ঘোরানোর কাজটা সেরে নিচ্ছে ভুঁড়িটাকে এগিয়ে দিয়ে। কাজটা অবিশ্যি শুনতে যত কঠিন মনে হয় ততটা নয়, কারণ প্রথমত গাড়ি চলাচল এ রাস্তায় প্রায় নেই বললেই চলে, আর দ্বিতীয়ত পাঁচ ছ' মাইল ধরে একটানা সোজা রাস্তা এর মধ্যে অনেকবারই লক্ষ করলাম। পথে কোনো গোলমাল না হলে মনে হয় সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ জয়সলমীর পৌঁছে যাব।

যোধপুর ছাড়িয়ে মাইল দশেক পর থেকেই এমন সব দৃশ্য আরম্ভ হয়েছে যেমন আমি এর আগে কখনো দেখিনি। যোধপুরের আশেপাশে অনেক পাহাড় আছে, যে সব পাহাড়ের লালচে রঙের পাথর দিয়েই যোধপুরের কেলা তৈরি। কিন্তু কিছুক্ষণ থেকেই মনে হচ্ছে যেন পাহাড় ফুরিয়ে গেছে। তার বদলে আরম্ভ হয়েছে দিগন্ত অবধি গড়িয়ে যাওয়া ঢেউ খেলানো জমি। এই জমির কিছুটা ঘাস, কিছুটা লালচে মাটি, কিছুটা বালি আর কিছুটা কাঁকর। সাধারণ গাছপালাও ক্রমশ

কমে গিয়ে তার বদলে চোখে পড়ছে বাব্বা গাছ, আর নাম-না-জানা সব কাঁটা গাছ আর কাঁটা ঝোপ।

আর দেখছি বুন্দা উট। গরু ছাগলের মতো উট চরে বেড়াচ্ছে যেখানে সেখানে। তার কোনোটার রং দুধ দেওয়া চায়ের মতো, আর কোনোটা আবার ব্ল্যাক কফির কাছাকাছি। একটা উটকে দেখলাম ওই শুকনো কাঁটা গাছই চিবিয়ে খাচ্ছে। ফেলুদা বলল, কাঁটা গাছ খেয়ে নাকি অনেক সময় ওদের মুখের ভিতরটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। কিন্তু এ সব অঞ্চলে এটাই ওদের খাদ্য বলে ওরা নাকি সেটা গ্রাহ্যই করে না।

জয়সলমীরের কথাও ফেলুদা বলছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে তৈরি এই শহর নাকি ভাটি রাজপুতদের রাজধানী ছিল। ওখান থেকে মাত্র চৌষট্টি মাইল দূরে পাকিস্তানের বর্ডার। দশ বছর আগেও নাকি জয়সলমীরে যাওয়া খুব মুশকিল ছিল। ট্রেন তো ছিলই না, রাস্তাও যা ছিল তা অনেক সময়ই বালিতে ঢাকা পড়ে হারিয়ে যেত। জারগাটা নাকি এত শুকনো যে ওখানে বছরে একদিন বৃষ্টি হলেও লোকেরা সেটাকে সৌভাগ্য বলে মনে করে। যুদ্ধের কথা জিজ্ঞেস করতে ফেলুদা বলল যে আলাউদ্দীন খিলজি নাকি একবার জয়সলমীর আক্রমণ করেছিল।

নব্বুই কিলোমিটার বা ছাপ্পান মাইলের কাছাকাছি এসে হঠাৎ আমাদের ট্যাক্সির একটি টায়ার পাংচার হয়ে গাড়িটা একটা বিশ্রী শব্দ করে রাস্তার একপাশে কেদ্রে থেমে গেল। গুরুবচন সিং-এর উপর মনে মনে বেশ রাগ হল। ও বলেছিল টায়ার চেক করে নিয়েছে, হাওয়া দেখে নিয়েছে ইত্যাদি। সত্যি বলতে কী, গাড়িটা বেশ নতুনই।

সর্দারজীর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বাইরে বেরোলাম। টায়ার চেঞ্জ করার হ্যাঙ্গাম আছে, অন্তত পনেরো মিনিটের ধাক্কা।

চ্যাপটা টায়ারের দিকে চোখ যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পাংচারের কারণটা বুঝতে পারলাম।

রাস্তার অনেকখানি জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে অজস্র পেরেক। সেগুলো দেখেই বোঝা যায় যে সদ্য কেনা হয়েছে।

আমরা এ-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। সিং সাহেব দাঁতের ফাঁক দিয়ে একটা কথা বলল, যেটা অবিশ্যি বইয়ে লেখা যায় না। ফেলুদা কিছুই বলল না, শুধু কোমরে হাত দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ভুরু কঁচকে ভাবতে লাগল। লালমোহনবাবু একটা পুরোন জাপান এয়ার লাইনসের ব্যাগ থেকে একটা ডায়রি ধরনের সবুজ খাতা বার করে তাতে খস খস করে পেনসিল দিয়ে কী জানি লিখলেন।

নতুন টায়ার পরিয়ে, ফেলুদার কথামতো রাস্তা থেকে পেরেক সরিয়ে, যখন আবার রওনা হচ্ছি তখন ঘড়িতে পৌনে দুটো। ফেলুদা ড্রাইভারকে বলল—‘একটু রাস্তার দিকে নজর রেখে চালাবেন সর্দারজী—আমাদের পেছনে যে দুশমন লেগেছে সে তো বুঝতেই পারছেন।’

এদিকে বেশি আস্তে গেলে পৌছতে রাত হয়ে যাবে, কাজেই গুরুবচন সিং ষাট থেকে নামিয়ে চল্লিশে রাখলেন স্পীডোমিটার। সত্যি বলতে কী, রাস্তার উপর চোখ রাখতে গেলে ঘন্টায় দশ-পনেরো মাইলের বেশি স্পীড তোলা চলে না।

প্রায় একশো ষাট কিলোমিটার অর্থাৎ একশো মাইলের কাছাকাছি এসে সর্বনাশটা আর এড়ানো গেল না।

এবার কিন্তু পেরেক না, এবার পিতলের বোর্ড পিন। আন্দাজে মনে হয় প্রায় হাজার দশেক পিন বিশ-পঁচিশ হাত জায়গা জুড়ে ছড়ানো রয়েছে। বুঝতেই পারলাম যে, টায়ার ফাঁসানেওয়ালারা কোনো রিস্ক নিতে চাননি।

আর এটাও জানি, গুরুবচন সিং-এর ক্যারিয়ারে আর স্পেয়ার নেই।

চারজনই আবার গাড়ি থেকে নামলাম। সিং সাহেবের ভাব দেখে মনে হল, মাথায় পাগড়ি না থাকলে তিনি নিশ্চয়ই মাথা চুলকোতেন।

ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, ‘পোকরান টাউন হায় ইয়া গাঁও হায়?’

‘টাউন হায় বাবু।’

‘কিৎনি দূর ইঁহাসে?’

‘পঁচিশ মিল হোগা।’

‘সর্বনাশ!...তব্ আভি হোগা কেয়া?’

গুরুবচন সিং বুঝিয়ে দিল যে, এ লাইনে যে ট্যাক্সিই যাক না কেন, সেটা তার চেনা হবেই। এখানে অপেক্ষা করে যদি সে রকম ট্যাক্সি একটা ধরা যায়, তা হলে তাদের কাছ থেকে স্পেয়ার চেয়ে নিয়ে তারপর পোকরানে গিয়ে পাংচার সারিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু কথা হচ্ছে, সে রকম ট্যাক্সি যাবে কি না, আর গেলেও, সেটা কখন যাবে! কতক্ষণ আমাদের এই ধু-ধু প্রান্তরের মধ্যে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে!

পাঁচটা উট আর তার সঙ্গে তিনটি লোকের একটা দল আমাদের পাশ দিয়ে যোধপুরের দিকে চলে গেল। লোকগুলোর প্রত্যেকটার রং একেবারে মিশকালো। তার মধ্যে আবার একজনের ধবধবে সাদা দাড়ি আর গালপাট্টা। তারা আমাদের দিকে দেখতে দেখতে চলেছে দেখেই বোধহয় লালমোহনবাবু একটু ফেলুদার দিক ঘেঁষে দাঁড়ালেন।

‘সবসে নজ্দিব কোন্ রেল স্টেশন হায়?’ ফেলুদা বোর্ড পিন তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করল। আমরাও অন্য গাড়ির কথা ভেবে এই সংকায়টায় হাত

লাগিয়েছিলাম।

‘সাত আট মিল হোগা রামদেওরা।’

‘রামদেওরা...’

রাস্তা থেকে বোর্ড পিন সরানো হলে পর, ফেলুদা তার ঝোলা থেকে ব্র্যাড্‌শ টাইম টেবল বার করল। একটা বিশেষ পাতা ভাঁজ করা ছিল, সেখানটা খুলে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, ‘লাভ নেই। তিনটে পয়তাল্লিশে যোধপুর থেকে সকালের ট্রেনটা রামদেওরা পৌঁছানোর কথা। অর্থাৎ সে গাড়ি নিশ্চয়ই এতক্ষণে আমাদের ছাড়িয়ে চলে গেছে।’

আমি বললাম, ‘কিন্তু রাত্রের দিকে আরেকটা ট্রেন যায় না জয়সলমীর?’

‘হঁ। কিন্তু সেটা রামদেওরা পৌঁছবে ভোর রাত্তিরে—তিনটে তিগ্নান। এখান থেকে এখন হাঁটা দিলে রামদেওরা পৌঁছতে ঝাড়া দু’ঘণ্টা। সকালের ট্রেনটা ধরার যদি আশা থাকত, তা হলে হেঁটে যাওয়াতে একটা লাভ ছিল। অন্তত পোকরানটা



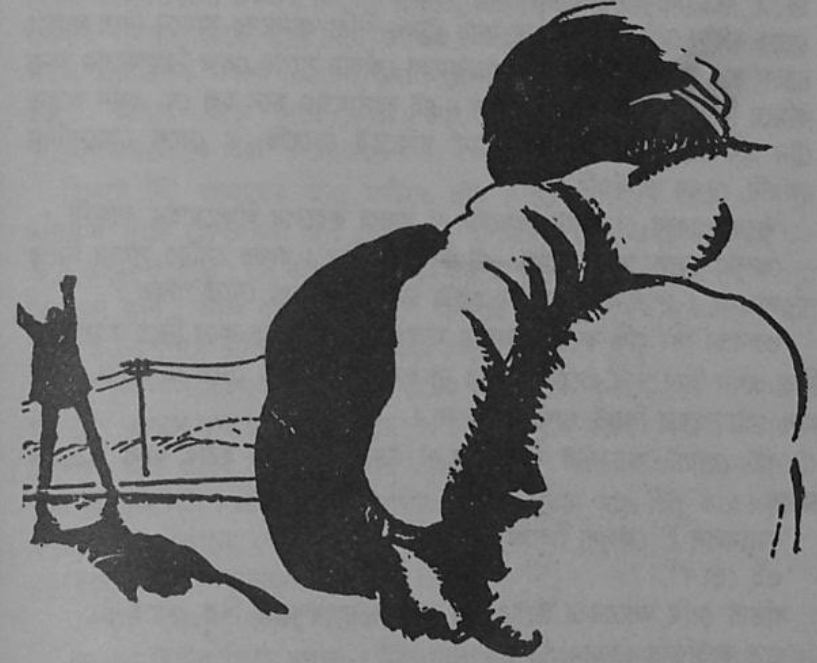
পৌঁছানো যেত। এই মাঠের মাঝখানে...’

লালমোহনবাবু এই অবস্থার মধ্যেও হেসে একটু কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, ‘যাই বলুন মশাই, এ সব সিচুয়েশন কিন্তু উপন্যাসেই পাওয়া যায়। রিয়েল লাইফেও যে এরকমটা—’

ফেলুদা হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ভদ্রলোককে থামতে বললেন। চারিদিকে একটাও শব্দ নেই, সারা পৃথিবী যেন এখানে এসে বোবা হয়ে গেছে। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে স্পষ্ট শুনতে পেলাম একটা ক্ষীণ আওয়াজ—ঝুক-ঝুক ঝুক-ঝুক ঝুক-ঝুক... ঝুক-ঝুক...

ট্রেন আসছে। পোকরানের ট্রেন। কিন্তু লাইন কোথায়?

শব্দের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে হঠাৎ দূরে চোখে পড়ল ধোঁয়া। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেলাম টেলিগ্রাফের পোল। জমিটা ঢালু হয়ে গেছে তাই বোঝাই যায় না। পিছনের লাল মাটির সঙ্গে লাল টেলিগ্রাফ পোল মিশে প্রায় অদৃশ্য হয়ে আছে। আকাশে মাথা উঁচিয়ে থাকলে আগেই চোখে পড়ত।
‘দৌড়ো!’



ফেলুদা চীৎকারটা দিয়েই ধোঁয়া লক্ষ্য করে ছুট দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও। আর আমার পিছনে জটায়ু। আশ্চর্য! ভদ্রলোক ওই লিক্‌পিকে শরীর নিয়ে এমন ছুটতে পারেন, তা আমি ভাবতে পারিনি। আমাকে ছাড়িয়ে প্রায় ফেলুদাকে ধরে ফেলেন আর কী!

পায়ের তলায় ঘাস, কিন্তু সে ঘাসের রং সবুজ নয়—একেবারে তুলোর মতো সাদা। তার উপর দিয়ে পড়ি-কি-মরি ছুট দিয়ে আমরা ঢালুর নিচে লাইনের ধারে পৌঁছে দেখি, ট্রেনটা আমাদের একশো গজের মধ্যে এসে পড়েছে।

ফেলুদা এক মুহূর্ত ইতস্তত না করে এক লাফে একেবারে লাইনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে দুটো হাত মাথার উপর তুলে হে-হে করে নাড়তে আরম্ভ করে দিল। ট্রেন এদিকে ছইসল্ দিতে আরম্ভ করেছে, আর সেই ছইসল্ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে জটায়ুর চীৎকার—‘রোক্কে, রোক্কে, হস্ট, হস্ট, রোক্কে !...’

কিন্তু কে কার কথা শোনে। এ ট্রেন যদিও ছোট, কিন্তু মার্টিন কোম্পানির ট্রেনের মতো নয় যে, মাঝ-রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাত দেখালে বাসের মতো থেমে যাবে। প্রচণ্ড ছইসল্ মারতে মারতে স্পীড বিন্দুমাত্র না কমিয়ে ট্রেনটা একেবারে হে হে করে আমাদের সামনে এসে পড়ল। ফলে ফেলুদাকে বাধ্য হয়ে লাইন থেকে বাইরে চলে আসতে হল, আর ট্রেনও দিব্যি আমাদের সামনে দিয়ে ঘ্যাচাং ঘ্যাচাং শব্দ করতে করতে কুচকুচে কালো ধোঁয়ায় সূর্যের তেজ কিছুক্ষণের জন্য কমিয়ে দিয়ে দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল। এই দুঃসময়েও মনে হল যে, এমন অদ্ভুত ট্রেন একমাত্র হলিউডের ‘ওয়েস্টার্ন’ ছবিতেই দেখেছি, এ দেশে কোনোদিন দেখিনি, দেখব ভাবিওনি।

‘গুয়োপোকোর রোয়াবটা দেখলেন?’ মন্তব্য করলেন লালমোহন গাঙ্গুলী।

ফেলুদা বলল, ‘ব্যাড লাক্। ট্রেনটা লেট ছিল। অথচ সেটার সুযোগ নিতে পারলাম না। পোকরানে হয়তো একটা ট্যাক্সিও পাওয়া যেতে পারত।’

গুরুবচন সিং বুদ্ধি করে আমাদের মালগুলো সব হাতে করে নিয়ে আসছিল, কিন্তু এখন আর তার প্রয়োজন হবে না। লাইনের দিকে চেয়ে দেখলাম, এখন আর ধোঁয়া ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

‘বাট হোয়াট অ্যাবাউট ক্যামেলস্?’ উত্তেজিত স্বরে হঠাৎ বলে উঠলেন জটায়ু।

‘ক্যামেলস্?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘ওই তো!’

সত্যিই দেখি, আরেকটা উটের দল আসছে যোধপুরের দিক থেকে।

‘গুড আইডিয়া। চলুন!’

ফেলুদার কথায় আবার দৌড়।

‘সে রকম খেপে উঠলে নাকি উট টোয়েন্টি মাইলস্ পার আওয়ার ছুটতে পারে’—ছুটতে ছুটতেই বললেন লালমোহনবাবু।

উটের দলকে থামানো হল। এবারে দু’জন লোক আর সাতখানা উট। ফেলুদা প্রস্তাব করল—রামদেওরা যাব, তিনটে উট কত লাগবে বলো। এদের ভাষা আবার হিন্দি নয়; স্থানীয় কোনো একটা ভাষায় কথা বলে। তবে হিন্দি বোঝে, আর ভাঙা ভাঙা বলতেও পারে। গুরুবচন সিং এসে আমাদের হয়ে কিছুটা কথাবার্তা বলে দিল। দশ টাকায় রাজী হয়ে গেল উট ভাড়া দিতে।

‘দৌড়ানে সেকেগা আপকা উট?’ লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন। ‘ট্রেন ধরনে হোগা।’

ফেলুদা হেসে বলল, ‘আগে তো উঠুন। দৌড়ের কথা পরে।’
‘উঠব?’

এই প্রথম বোধহয় লালমোহনবাবু উটের সামনে পড়ে তার পিঠে ওঠার ব্যাপারটা তলিয়ে দেখলেন। আমি জানোয়ারগুলোকে ভালো করে দেখছিলাম। কী বিদঘুটে চেহারা, কিন্তু কী বাহারের সাজ পরিয়েছে তাদের। হাতির পিঠে যেমন ঝালরওয়ালা জাজিম দেখেছি ছবিতে, এদের পিঠেও তাই। একটা কাঠের বসবার ব্যবস্থা রয়েছে, তার নিচে জাজিম। জাজিমে আবার লাল নীল হলদে সবুজ জ্যামিতিক নকশা। উটের গলাও দেখলাম লাল চাদর দিয়ে ঢাকা, আর তাতে আবার কড়ি দিয়ে কাজ করা। বুঝলাম, যতই কুশ্রী হোক, জানোয়ারগুলোকে এরা ভালোবাসে।

তিনটে উট আমাদের জন্য মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসেছে। আমাদের দুটো সুটকেস্, দুটো হোল্ড-অল আর ছোটখাটো যা জিনিস ছিল, সবই গুরুবচন সিং এনে জড়ো করেছে। সে বলে দিল, ট্রেন ধরতে পারলে আমরা যেন পোকরানে অপেক্ষা করি; আজ রাত্রের মধ্যে সে অবশ্যই পৌঁছে যাবে। মালগুলো অন্য দুটো উটের পিঠে চাপিয়ে বেঁধে দেওয়া হল।

ফেলুদা লালমোহনবাবুকে বলল, ‘উটের বসটা লক্ষ করলেন তো? সামনের পা দুটো প্রথমে দুমড়ে শরীরের সামনের দিকটা আগে মাটিতে বসছে। তারপর পেছন। আর ওঠার সময় কিন্তু হবে ঠিক উল্টোটা। আগে উঠবে পিছন দিকটা, তারপর সামনেটা। এই হিসেবটা মাথায় রেখে শরীরটা আগু-পিছু করে নেবেন, তাহলে আর কোনো কেলেক্কারি হবে না।’

‘কেলেঙ্কারি?’ জটায়ুর গলা কাঠ।

‘দেখুন’, ফেলুদা বলল, ‘আমি আগে উঠছি।’

ফেলুদা উটের পিঠে চাপল। উটওয়ালাদের মধ্যে একজন মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ করতেই ঠিক যেরকমভাবে ফেলুদা বলেছিল সেইভাবে উটটা তেড়ে বেঁকে ভীষণ একটা ল্যাগব্যাগে ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়াল। এটা বুঝতে পারলাম যে, ফেলুদার বেলা কোনো কেলেক্কারি হল না।

‘তোপসে ওঠ। তোরা হালকা মানুষ, তোদের ঝামেলা অনেক কম।’

উটওয়ালারা দেখি বাবুদের কাণ্ড দেখে দাঁত বার করে হাসছে। আমিও সাহস করে উঠে পড়লাম, আর সেই সঙ্গে উটটাও উঠে দাঁড়াল। বুঝলাম যে আসল গোলমালটা হচ্ছে এই যে, পিছনের পা-টা যখন খাড়া হয়, সওয়ারির শরীরটা তখন এক বাটকায় সামনের দিকে অনেকখানি এগিয়ে যায়। মনে মনে ঠিক

করলাম যে, এর পরে যদি কখনো উঠি তাহলে প্রথম দিকে শরীরটাকে পিছনে হেলিয়ে টান করে রাখব, তাহলে ব্যালেন্সটা ঠিক হবে।

‘জয় ম্যা—’

লালমোহনবাবুর মা-টা ম্যা হয়ে গেল এই কারণেই যে, তিনি কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই উটের পিছন দিকটা এক ঝটকায় উঁচু হয়ে গেল, যার ফলে তিনি খেলেন এক রামছমড়ি। আর তারপরেই উল্টো হাঁচকায় ‘হেঁইক’ করে এক বিকট শব্দ করেই ভদ্রলোক একেবারে পারপেন্ডিকুলার।

গুরুবচন সিং-এর কাছে বিদায় নিয়ে আমরা তিন বেদুইন রামদেওরা স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

‘আধা ঘণ্টে মে আট মিল যানা হ্যায়, টিরেন পাকডানা হ্যায়’, ফেলুদা উটওয়ালাদের উদ্দেশ্যে করে হাঁক দিল। কথাটা শুনে একজন উটওয়ালার আরেকটা উটের পিঠে চড়ে খচমচ্ খচমচ্ করে সামনে এগিয়ে গেল। তারপর অন্য লোকটার মুখ দিয়ে হেঁই হেঁই করে কয়েকটা শব্দ বেরোতেই শুরু হল উটের দৌড়।

নড়বড়ে জানোয়ার, দৌড়ের সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা ঝাঁকুনিও খায়: রীতিমত কিন্তু তাও ব্যাপারটা আমার মোটেই খারাপ লাগছিল না। আর তা ছাড়া বালি আর সাদা ঝলসানো ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছি, জায়গাটাও রাজস্থান, সব মিলিয়ে বেশ একটা রোমাঞ্চই লাগছিল।

ফেলুদা আমার চেয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল। লালমোহনবাবু আমার পিছনে। ফেলুদা একবার ঘাড়টা পিছনে ফিরিয়ে হাঁক দিল—

‘শিপ অফ দ্য ডেজার্ট কীরকম বুঝছেন মিস্টার গান্দুলী?’

আমিও একবার মাথা ঘুরিয়ে দেখে নিলাম লালমোহনবাবুর অবস্থাটা। খুব শীত লাগলে লোকে যেমন মুখ করে—তলার ঠোঁট ফাঁক হয়ে দেখা যায় দাঁতে দাঁত লেগে রয়েছে, আর গলার শিরাগুলো সব বেরিয়ে আসে—লালমোহনবাবুর দেখি সেই রকম অবস্থা।

‘কী মশাই?’ ফেলুদা হাঁকল, ‘কিছু বলছেন না যে?’

পিছন থেকে এবার পাঁচটা ইনস্টলমেন্টে পাঁচটা কথা বেরোল—‘শিপ... অলরাইট... বাট... টকিং... ইম্পসিবল...’

কোনো রকমে হাসি চেপে সওয়ারির দিকে মন দিলাম। আমরা এখন রেল লাইনের ধার দিয়ে চলেছি। একবার মনে হল, দূরে যেন ট্রেনের ধোঁয়াটা দেখতে পেলাম, তারপর আবার সেটা মিলিয়ে গেল। সূর্য নেমে আসছে। দৃশ্যও বদলে আসছে। আবার আবছা পাহাড়ের লাইন দেখতে পাচ্ছি বহু দূরে। ডান দিকে একটা প্রকাণ্ড বালির স্তূপ পড়ল। দেখে বুঝলাম তার উপরে মানুষের পায়ে

ছাপ পড়েনি। সমস্ত বালির গায়ে ডেউয়ের মতো লাইন।

উটগুলোর বোধহয় একটানা এত দৌড়নো অভ্যেস নেই, তাই মাঝে মাঝে তাদের স্পীড কমে যাচ্ছিল, তারপর পিছন থেকে হেঁই হেঁই শব্দে তারা আবার দৌড়তে শুরু করছিল।

সোয়া চারটে নাগাদ আমরা দূরে লাইনের ধারে চৌকো ঘরের মতো একটা কিছু দেখতে পেলাম। এটা স্টেশন ছাড়া আর কী হতে পারে?

আরো কাছে এলে পর বুঝলাম, আমাদের আন্দাজ ঠিকই। একটা সিগন্যালও দেখা যাচ্ছে। এটা একটা রেলওয়ে স্টেশন, এবং নিশ্চয়ই রামদেওরা স্টেশন।

আমাদের উটের দৌড় টিমে হয়ে এসেছে। কিন্তু আর হেঁই হেঁই করার প্রয়োজন হবে না, কারণ ট্রেন এসে চলে গেছে। কতক্ষণের জন্য ট্রেনটা ফসকে গেল জানি না, তবে ফসকে যে গেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তার মানে এখন থেকে রাত তিনটে পর্যন্ত আমাদের এই জনমানবশূন্য প্রান্তরে এক অজানা জায়গায় একটা নাম-কা-ওয়াস্তে রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসে কাটাতে হবে।

॥ ৯ ॥

স্টেশন বলতে একটা প্ল্যাটফর্ম, আর একটা ছোট্ট কাজ চালাবার মতো টিকিট ঘর। আসলে স্টেশন তৈরির কাজ এখনো চলছে; কবে শেষ হবে তার কোনো ঠিক নেই। আমরা টিকিট ঘরের কাছেই একটা জায়গা বেছে নিয়ে সুটকেস আর হোল্ড-অল মাটিতে পেতে তার উপরে বসেছি। এখানে বসার একটা কারণ এই যে, কাছেই কাঠের পোস্টে একটা কেরোসিনের বাতি ঝুলছে, কাছেই অন্ধকার হলেও সেই আলোতে আমরা অন্তত পরস্পরের মুখটা দেখতে পাব।

স্টেশনের কাছে একটা ছোটখাটো গ্রাম জাতীয় ব্যাপার আছে। ফেলুদা একবার সেদিকটায় ঘুরে এসে জানিয়েছে যে, খাবারের দোকান বলে কিছুই নাকি সেখানে নেই। খাবার বলতে আমাদের এখন যা সম্বল দাঁড়িয়েছে, সেটা হচ্ছে ফ্লাস্কের মধ্যে সামান্য জল আর লালমোহনবাবুর কাছে এক টিন জিভেগজা। বুঝতে পারছি, আজ রাতটা এই গজা খেয়েই থাকতে হবে। মিনিট দশেক হল সূর্য ডুবেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে। গুরুবচন সিং আসবে বলে বিশেষ ভরসা হয় না, কারণ আমরা এই যে তিন ঘণ্টা হল এসেছি, তার মধ্যে একটি গাড়িও যায়নি রাস্তা দিয়ে—না যোধপুরের দিকে, না জয়সলমীরের দিকে। রাত তিনটে পর্যন্ত এই প্ল্যাটফর্মে বসে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় আছে বলে মনে হয় না।

ফেলুদা ওর সুটকেসটার উপর বসে রেলের লাইনের দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে। ওকে এর মধ্যে বার দু-তিন দেখেছি বাঁ হাতের তেলোর চাপে ডান হাতের আঙুল মটকাতে। বেশ বুঝেছি ওর ভেতরে একটা চাপা উত্তেজনার ভাব রয়েছে, আর তাই ও কথাও বলছে না বেশি।

দালদার টিনটা খুলে একটা জিভেগজা বার করে তাতে একটা কামড় দিয়ে লালমোহনবাবু বললেন, 'কী থেকে কী হয়ে যায় মশাই। আগ্রা থেকে যদি এক কামরায় সীট না পড়ত, তা হলে কি আর এভাবে আমার হলিডের চেহারাটা পালটে যেতো?'

'আপনার কি আপসোস হচ্ছে?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'বলেন কী মশাই!' ফেলুদার প্রশ্নটা ভদ্রলোক হেসেই উড়িয়ে দিলেন। 'তবে কী জানেন, ব্যাপারটা যদি আমার কাছে আরেকটু ক্লিয়ার হত, তা হলে মজাটা আরো জমত।'

'কোন ব্যাপারটা?'

'কিছুই তো জানি না মশাই। খালি শাটলুককের মতো এদিকে থাপ্পড় খেয়ে ওদিকে যাচ্ছি, আর ওদিকে থাপ্পড় খেয়ে এদিকে আসছি। এমনকি আপনি যে আসলে কে—হিরো না ভিলেন—তাই তো বুঝতে পারছি না, হে হে।'

'কী হবে জেনে?' ফেলুদা মুচকি হেসে বলল। 'আপনি যখন উপন্যাস লেখেন, সব জিনিস কি আগে থেকে বলে দেন? এই রাজস্থানের অভিজ্ঞতাকেও একটা উপন্যাস বলে ধরে নিন না। গল্পের শেষে দেখবেন সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেছে।'

'আমি আস্ত থাকব তো গল্পের শেষে? জ্যান্ত থাকব তো?'

'ঠিকায় পড়লে আপনি যে দৌড়িয়ে খরগোশকেও হার মানাতে পারেন সেটা তো চোখেই দেখলাম। এটা কি কম ভরসার কথা?'

একটা লোক এসে কখন জানি কেরোসিনের বাতিটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। সেই আলোয় দেখতে পেলাম স্থানীয় পোশাক পরা দুটো পাগড়িধারী লাঠি ঠক ঠক করতে করতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তারা এসে আমাদের ঠিক চার-পাঁচ হাত দূরে মাটিতে উবু হয়ে বসে নিজেদের মধ্যে দুর্বোধ্য ভাষায় কথাবার্তা আরম্ভ করে দিল। লোক দুটোর একটা ব্যাপার দেখে আমার মুখ হাঁ হয়ে গেল। তাদের দু'জনেরই গোঁফ জোড়া অন্তত চার বার পাক খেয়ে গালের দু'পাশে দুটো ঘড়ির স্প্রিং-এর মতো হয়ে রয়েছে। মনে হয়, টেনে সোজা করলে এক এক দিকে অন্তত হাত দেড়েক লম্বা হবে। লালমোহনবাবুরও দেখি চক্ষুস্থির।

ফেলুদা চাপা গলায় বলল, 'ব্যান্ডিটস্।'

'বলেন কী?' লালমোহনবাবু ফ্লাস্ক থেকে জল ঢেলে খেলেন।
'নিঃসন্দেহে।'

লালমোহনবাবু এবার দালদার টিনটা বন্ধ করতে গিয়ে ঢাকনাটা হাত থেকে ফসকে ফেলে একটা বিশ্রী খ্যানখেনে শব্দ করে নিজেই আরো বেশি নাভার্স হয়ে পড়লেন।

লোকগুলোর গায়ের রং একেবারে সদ্য কালি দিয়ে বুরুশ করা নতুন জুতোর মতো চকচকে। দুটোর মধ্যে একটা লোক এবার একটা সিগারেট বার করে মুখে পুরল, তারপর পকেট খাবড়ে খুবড়ে একটা দেশলাইয়ের বাস্ক বার করে সেটা খালি দেখে ট্রেনের লাইনের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। খচ করে একটা শব্দ শুনে ফেলুদার দিকে চেয়ে দেখি, সে তার লাইটারটা জ্বালিয়ে লোকটার দিকে এগিয়ে দিয়েছে। লোকটা প্রথমে একটু অবাক, তারপর মুখ বাড়িয়ে সিগারেটটা ধরিয়ে ফেলুদার কাছ থেকে লাইটারটা নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে এখানে-সেখানে টিপে ফস করে সেটাকে জ্বালাল। লালমোহনবাবু কী জানি বলতে গেলেন, কিন্তু গলা দিয়ে পরিষ্কার আওয়াজ বেরোল না। লোকটা আরো তিনবার লাইটারটা জ্বালিয়ে-নিভিয়ে সেটা ফেলুদাকে ফেরত দিয়ে দিল। লালমোহনবাবু এবার ঢাকনা লাগানো টিনটা সুটকেসে ভরতে গিয়ে পুরো টিনটাই হাত থেকে ফেলে গতবারের চেয়ে আরো চারগুণ বেশি শব্দ করে বসলেন। ফেলুদা সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে তার থলি থেকে নীল খাতাটা বার করে এই টিমটিমে আলোতেই সেটা উলটে-পালটে দেখতে লাগল।

হঠাৎ লক্ষ করলাম টিকিট ঘরের পিছনে কিছুটা দূরে একটা কাঁটা ঝোঁপের উপর কোথেকে জানি একটা আলো এসে পড়েছে।

আলোটা বাড়ছে। এবার একটা গাড়ির আওয়াজ পেলাম। জয়সলমীরের দিক থেকে আসছে গাড়িটা। যাক বাবা! মনে হচ্ছে গুরুবচনের সমস্যার সমাধান হলেও হতে পারে।

গাড়িটা হুসু করে নাকের সামনে দিয়ে যোধপুরের দিকে চলে গেল। ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে সাতটা।

ফেলুদা খাতা থেকে মুখ তুলে লালমোহনবাবুর দিকে চাইল। তারপর বলল, 'আচ্ছা লালমোহনবাবু, আপনি তো গল্পটল্ল লেখেন, বলুন তো ফোসকা জিনিসটা কী এবং ফোসকা কেন পড়ে!'

'ফোসকা?... ফোসকা?...' লালমোহনবাবু থতমত খেয়ে গেছেন। 'কেন পড়ে মানে, এই ধরুন আপনি সিগারেট ধরতে গিয়ে হাতে ছাঁকা লাগল—'

'সে তো বুঝলাম—কিন্তু ফোসকা পড়বে কেন?'

'কেন? ও—আই সী—কেন...'

‘ঠিক আছে। এবার বলুন তো একটা লোককে মাথার উপর থেকে দেখলে তাকে বেঁটে মনে হয় কেন?’

লালমোহনবাবু চুপ করে হাঁ করে চেয়ে রইলেন। আবছা আলোয় দেখলাম তিনি হাত কচলাচ্ছেন। পাশের লোক দুটো এক সুরে একভাবে গল্প করে চলেছে। ফেলুদা একদৃষ্টে লালমোহনবাবুর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

লালমোহনবাবু জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বললেন, ‘আমাকে এসব, মানে, কোশ্চেন—’

‘আরেকটা প্রশ্ন আছে লালমোহনবাবু—এটার উত্তর আপনি নিশ্চয়ই জানেন।’
লালমোহনবাবু নির্বাক। ফেলুদা যেন তাঁকে হিপনোটাইজ করে ফেলেছে।
‘আজ সকালে আপনি সার্কিট হাউসের পিছনের বাগানে আমার জানালার কাছে কী করছিলেন?’

লালমোহনবাবু এক মুহূর্ত পাথর। তারপরেই তিনি একেবারে হাত-পা ছুঁড়ে হাউমাউ করে উঠলেন।

‘আরে মশাই—আপনার কাছেই তো যাচ্ছিলুম! আপনারই কাছে! এমন সময় ময়ূরটা এমন চৌঁচিয়ে উঠল—আর তারপর একটা চীৎকার শুনলাম—কেমন জানি নাভার্স-টার্ভার্স হয়ে...’

‘আমার ঘরে যাবার কি অন্য রাস্তা ছিল না? আর আমার কাছে আসার জন্য মাথায় পাগড়ি আর গায়ে চাদর দিতে হয়?’

‘আরে মশাই, গায়ের চাদর তো বিছানার চাদর, আর পাগড়ি তো সার্কিট হাউসের তোয়ালে। একটা ডিজগাইজ না হলে লোকটার উপর স্পাইং করব কী করে?’

‘কোন লোকটা?’

‘মিস্টার ট্রটার! ভেরি সাস্পিশাস! ভাগ্যে গেসলুম। কী পেলুম দেখুন না, ওর জানলার বাইরে ঘাসের উপর। সিক্রেট কোড! এইটেই তো আপনাকে দিতে যাচ্ছিলুম, আর ঠিক এই সময় ময়ূরটা চৌঁচামেচি লাগিয়ে সব ভঙুল করে দিলে।’

আমি লক্ষ করছিলাম লালমোহনবাবুর ঘড়িটা। সত্যি, এই ঘড়িটাই তো দেখেছিলাম ছাত থেকে।

লালমোহনবাবু সুটকেস খুলে তার খাপ থেকে একটা কোঁকড়ানো কাগজের টুকরো বার করে ফেলুদাকে দিল। বুঝলাম কাগজটাকে দলা পাকানো হয়েছিল, সেটা আবার সোজা করা হয়েছে।

ফেলুদার পাশে গিয়ে কেরোসিনের আলোতে দেখলাম কাগজটায় পেনসিল দিয়ে লেখা আছে—

IP 1625+U

U—M

ফেলুদা ভীষণভাবে ভুরু কঁচকে কাগজটার দিকে চেয়ে রইল। আমি এই অ্যালজেব্রার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না, যদিও লালমোহনবাবু দুবার ফিস্ ফিস্ করে বললেন, ‘হাইলি সাস্পিশাস্।’

ফেলুদা ভাবছে, আর ভাবতে ভাবতে আপন মনে বিড়বিড় করছে—
‘ষোল শ’ পঁচিশ...ষোল শ’ পঁচিশ...এই সংখ্যাটা কোথায় যেন দেখেছি রিসেস্টলি?...’

‘ট্যাক্সির নম্বর?’ আমি জিজ্ঞেস করলাম।

‘উঁহ...ষোল শ’ পঁচিশ...সিক্সটিন টোয়েন্টি ফা—’

ফেলুদা কথাটা শেষ না করে এক ঝটকায় থলে থেকে ব্র্যাড্‌শ টাইম টেবলটা বার করল। পাতা ভাঁজ করা জায়গাটা খুলে পাতার উপর থেকে নিচের দিকে আঙুল চালিয়ে এক জায়গায় এসে থামল।

‘ইয়েস। সিক্সটিন টোয়েন্টি ফাইভ হচ্ছে অ্যারাইভ্যাল।’

‘কোথায়?’ জিজ্ঞেস করলাম।

‘পোকরানে।’

বললাম, ‘তা হলে তো Pটা পোকরান হতে পারে। পোকরানে সিক্সটিন টোয়েন্টি ফাইভ। আর বাকিটা?’

‘বাকিটা...বাকিটা...আই পি আবার প্লাস ইউ।’

‘তলার Mটা কিন্তু ভালো লাগছে না মশাই,’ লালমোহনবাবু বললেন। ‘M বললেই কিন্তু মার্ভার মনে পড়ে।’

‘দাঁড়ান মশাই—আগে ওপরেরটার পাঠোদ্ধার করি।’

লালমোহনবাবু বিড়বিড় করে বললেন, ‘মার্ভার...মিসট্রি...ম্যাসাকার মনস্টার...’

ফেলুদা কোলের উপর কাগজটা খোলা রেখে ভাবতে লাগল।

লালমোহনবাবু গজার টিনটা বার করে আমাদের আবার অফার করলেন। আমি একটা নেবার পর ফেলুদার দিকে টিনটা এগিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, ‘ভালো কথা—আমিই যে আপনার জানালার কাছে গিয়েছিলুম, সেটা কী করে বুঝলেন স্যার? আপনি কি আমায় দেখে ফেলেছিলেন নাকি?’

ফেলুদা একটা গজা তুলে নিয়ে বলল, ‘পাগড়িটা খোলার পর বোধহয় চুলটা আঁচড়াননি। ঘটনাটার কিছুক্ষণ পর যখন আপনার সঙ্গে দেখা হয়, তখন আপনার চুলের অবস্থাটা দেখেই সন্দেহ হয়েছিল।’

ভদ্রলোক হেসে বললেন, ‘কিছু মনে করবেন না স্যার আপনাকে কিন্তু সেন্ট-পারসেন্ট গোয়েন্দা বলেই মনে হচ্ছে।’

ফেলুদা এবার তার একটা কার্ড বার করে লালমোহনবাবুকে দিল।
লালমোহনবাবুর দৃষ্টি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

‘ওঃ!—প্রদোষ সি মিটার! এটা কি আপনার রিয়্যাল নাম?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ। সন্দেহের কোনো কারণ আছে কি?’

‘না, মানে ভাবছিলাম কী অদ্ভুত নাম!’

‘অদ্ভুত?’

‘অদ্ভুত নয়? দেখুন না কেমন মিলে যাচ্ছে।—প্রদোষ—প্র হচ্ছে প্রফেশন্যাল, দোষ হচ্ছে ক্রাইম আর সি হচ্ছে—টু সি—অর্থাৎ দেখা—অর্থাৎ ইনভেস্টিগেট। অর্থাৎ প্রদোষ সি ইজ ইকুয়াল টু প্রফেশন্যাল ক্রাইম ইনভেস্টিগেটর!’

‘সাধু সাধু!—আর মিটার?’

‘মিটারটা একটু ভেবে দেখতে হবে,’ লালমোহনবাবু মাথা চুলকে বললেন।

‘কিস্যু ভাবার দরকার নেই। আমি বলে দিচ্ছি। ট্যান্ড্রি মিটার জানেন তো? সেই মিটার—অর্থাৎ ইন্ডিকটর। তার মানে শুধু ইনভেস্টিগেশন নয়, অলসো ইনডিকেশন। ক্রাইমের তদন্তই শুধু নয়, ক্রিমিন্যাল বার করে তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ। হল তো?’

লালমোহনবাবু ‘ব্রাভো’ বলে হাততালি দিয়ে উঠলেন। ফেলুদা কিন্তু আবার সিরিয়াস। আরেকবার হাতের কাগজটার দিকে দেখে সেটাকে সাটের বুক-পকেটে গুঁজে রেখে সিগারেটটা বার করে বলল, ‘I এবং U-এর অবিশ্যি খুব সহজ মানে হতে পারে। I অর্থাৎ আমি এবং U অর্থাৎ তুমি, কিন্তু প্লাস ইউ-টা গোলমালে। আর দ্বিতীয় লাইনটার কোনো কিনারাই করা যাচ্ছে না।...তোপসে, তুই বরং হোল্ড-অলটা বিছিয়ে শুয়ে পড়। আপনিও—লালমোহনবাবু। এখনো তো সাড়ে সাত ঘণ্টা দেরি ট্রেন আসতে। আমি আপনাদের ঠিক সময়ে তুলে দেবো।’

কথাটা মন্দ বলেনি ফেলুদা। শুধু স্ট্যাপ দুটো খুলে হোল্ড-অলটাকে বিছিয়ে প্ল্যাটফর্মের উপর শুয়ে পড়লাম। চিত হওয়ামাত্র আকাশের দিকে চোখ গেল, আর তক্ষুনি বুঝতে পারলাম যে, একসঙ্গে এত তারা আমি জীবনে কখনো দেখিনি। মরুভূমিতে কি আকাশটা তা হলে একটু বেশি পরিষ্কার থাকে? তাই হবে।

আকাশ দেখতে দেখতে ক্রমে চোখটা ঘুমে বুজে এল। একবার শুনলাম লালমোহনবাবু বলছেন, ‘উটে চড়লে গাঁটে বেশ ব্যথা হয় মশাই।’ আরেকবার যেন বললেন, ‘এম্ ইজ মার্ভার।’ এর পর আর কিছু মনে নেই।

ঘুম ভাঙল ফেলুদার ঝাঁকানিতে।

‘তোপসে—উঠে পড়—গাড়ি আসছে।’

তড়াক করে উঠে হোল্ড-অল বেঁধে ফেলতে ফেলতে ট্রেনের হেড-লাইট দেখা গেল।

॥ ১০ ॥

মিটার গেজের প্যাসেঞ্জার গাড়ি। কামরাগুলো তাই খুবই ছোট। যাত্রীও বেশি নেই, তাই একটা খালি ফার্স্ট ক্লাস। পাওয়াতে খুব একটা অবাক লাগল না।

কামরা অন্ধকার; হাতড়িয়ে সুইচ বার করে টিপে কোনো ফল হলো না। লালমোহনবাবু বললেন, ‘সভা দেশেই রেলের বাল্ব লোপাট হয়ে যায়, ডাকাতের দেশে তো ওটা আশা করাই ভুল।’

ফেলুদা বলল, ‘তোরা দু’জন দু’দিকের বেঞ্চিতে শুয়ে পড়। আমি মাঝখানের মেঝেতে শতরঞ্চি পেতে ম্যানেজ করছি। ঝাড়া ছ’ ঘণ্টা সময় আছে হাতে, দিবি গাড়িয়ে নেওয়া যাবে।’

লালমোহনবাবু একবার একটু আপত্তি করেছিলেন—‘আপনি আবার ফ্লোরে কেন মশাই, আমাকে দিন না’—কিন্তু ফেলুদা একটু কড়া করে ‘মোটাই না’ বলাতে ভদ্রলোক বোধহয় গাঁটের ব্যথার কথা ভেবেই বেঞ্চিতে হোল্ড-অল খুলে পেতে নিলেন।

গাড়ি ছেড়ে প্ল্যাটফর্ম পেরোনোর এক মিনিটের মধ্যেই কে একজন আমাদের দরজার পা-দানিতে লাফিয়ে উঠল। লালমোহনবাবু হেসে বলে উঠলেন, ‘আরে বাবা, গাড়ি রিজার্ভ হয়। জেনানা কামরা হয়।’

এবারে ঝড়াক করে আমাদের দরজাটা খুলে গেল, আর একটা উজ্জ্বল টর্চের আলো জ্বলে উঠে কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিল।

সেই আলোতেই দেখলাম, একটা হাত আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছে, আর সে হাতে চকচক করছে একটা লোহার নলওয়ালা জিনিস।

আমাদের তিনজনেরই হাত মাথার উপর উঠে গেল।

‘এবার উঠুন তো বাবু! দরজা খোলা আছে, একে একে নেমে পড়ুন তো বাইরে!’

এ যে মন্দার বোসের গলা!

‘গাড়ি যে চলছে!’—কাঁপা গলায় বলে উঠলেন লালমোহনবাবু।

‘শাট্ আপ!’ মন্দার বোস গর্জন করে দু’পা এগিয়ে এলেন। টর্চের আলোটা অনবরত আমাদের তিনজনের উপর ঘোরাফেরা করছে। ‘ন্যাকামো হচ্ছে? কলকাতায় চলন্ত ট্রাম-বাস থেকে ওঠানামা করা হয় না? উঠুন উঠুন—’

কথাটা শেষ হতে না হতে এমন একটা ব্যাপার ঘটে গেল, যেটা আমি জীবনে

কোনোদিন ভুলব না। ফেলুদার ডান হাতটা একটা বিদ্যুতের শিখার মতো নেমে এসে তার নিজের শতরশ্মির সামনের দিকটা খামচে ধরে মারল একটা প্রচণ্ড হাঁচকা টান—আর তার ফলে মন্দার বোসের পা দুটো সামনের দিকে হড়কে ছটকে শূন্যে উঠে গিয়ে উপরের শরীরটা এক ঝটকায় চিতিয়ে দড়াম করে লাগল কামরার দেয়ালে। আর সেই সঙ্গে তার ডান হাত থেকে রিভলভারটা ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে পড়ল লালমোহনবাবুর বেঞ্চিতে আর বাঁ হাত থেকে জ্বলন্ত টর্চটা ফসকে গিয়ে পড়ল মেঝেতে।

মন্দার বোসের পুরো শরীরটা মাটিতে পড়বার আগেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ফেলুদা—তার হাতে কোটের ভিতর থেকে বার করা তার নিজের রিভলভার।

‘গেট আপ!’ ফেলুদা মন্দার বোসকে উদ্দেশ্য করে গর্জিয়ে উঠল।

মিটার গেজের গাড়ি প্রচণ্ড শব্দ করে দুলে দুলে এগিয়ে চলেছে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে। লালমোহনবাবু ইতিমধ্যে মন্দারবাবুর রিভলভারটা তার জাপান এয়ার লাইনস্-এর ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

‘উঠুন বলছি!’ ফেলুদা আবার গর্জিয়ে উঠল।

টর্চটা মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে, অথচ বুঝতে পারছি সেটা মন্দার বোসের উপর ফেলা উচিত—নইলে লোকটা অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে একটা গোলমাল করতে পারে। এই কথাটা ভেবে টর্চটা তুলতে গিয়েই হয়ে গেল সর্বনাশ; আর সেটা এমনই সর্বনাশ যে সেটার কথা ভাবতে এখনো আমার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মন্দার বোসের শরীরের উপর দিকটা ছিল আমার বেঞ্চির দিকে। আমি যেই টর্চটা তুলতে নিচু হয়েছি, ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ একটা আচমকা ঝাঁপ দিয়ে আমাকে জাপটে ধরে আমাকে সুদূর উঠে দাঁড়ালেন। তার ফলে মন্দার বোস আর ফেলুদার মাঝখানে পড়ে গেলাম আমি। এই চরম বিপদের সময়েও মনে মনে লোকটার শয়তানি বুদ্ধির তারিফ না করে পারলাম না। বুঝতে পারলাম, ফেলুদা প্রথম রাউণ্ডে আশ্চর্য ভাবে জিতলেও, দ্বিতীয় রাউন্ডে বেকায়দায় পড়ে গেছে। এটাও বুঝলাম যে এই অবস্থার জন্য দায়ী একমাত্র আমি।

মন্দার বোস আমাকে পিছন থেকে আঁকড়ে ধরে সামনের দিকে রেখে খোলা দরজাটার দিকে পিছোতে লাগলেন। কাঁধের কাছটায় কী যেন একটা ফুটছে। বুঝলাম সেটা মন্দার বোসের হাতের একটা নখ। নীলুর হাতের যন্ত্রণার কথা মনে পড়ে গেল।

ক্রমে বুঝলাম দরজার খুব কাছে এসে গেছি। কারণ বাইরে থেকে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে আমার বাঁ কাঁধটায় লাগছে।

আরো এক পা পিছোলেন মন্দার বোস। ফেলুদা রিভলভার উঁচিয়ে রয়েছে

কিন্তু কিছু করতে পারছে না। জ্বলন্ত টর্চটা এখনো ট্রেনের দোলার সঙ্গে সঙ্গে মোবের এদিকে ওদিকে গড়াচ্ছে।

হঠাৎ পিছন থেকে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে আমি ফেলুদার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। আর তার পরেই একটা শব্দ পেলাম যাতে বুঝলাম যে, মন্দার বোস চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়েছেন। তিনি বাঁচলেন কী মরলেন, সেটা বোঝার কোনো উপায় নেই।

ফেলুদা দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখে ফিরে এল। তারপর যথাস্থানে রিভলভারটাকে চালান দিয়ে নিজের জায়গায় বসে পড়ে বলল,



‘দু—একটা হাড়গোড় অস্বস্ত না ভাঙলে খুব আক্ষেপের কারণ হবে।’
লালমোহনবাবু যেন একটু অতিরিক্ত জোরেই হেসে উঠে বললেন,

‘বলেছিলাম না মশাই, লোকটা সাসপিশাস্ ।’

আমি এর মধ্যে স্পষ্ট থেকে খানিকটা জল খেয়ে নিয়েছি । বুকের ধড়ফড়ানিটা আস্তে আস্তে কমছিল, নিশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসছিল । কী ভীষণ একটা ঘটনা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল, সেটা যেন এখনো ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলাম না ।

ফেলুদা বলল, ‘শ্রীমান্ তপেশ ছিলেন বলে লোকটা এ-যাত্রা পার পেয়ে গেল, নইলে বন্দুকটা নাকের সামনে ধরে ওর পেট থেকে সব বার করে নিতাম । অবিশ্যি—’

ফেলুদা খামল । তারপর বলল, ‘বুব বড় বিপদের সামনে পড়লেই দেখছি আমার মাথাটা বিশেষ রকম পরিষ্কার হয়ে যায় । ওই সংকেতের মানেটা এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি ।’

‘বলেন কী !’ বললেন লালমোহনবাবু ।

ফেলুদা বলল, ‘আসলে খুবই সহজ । আই হচ্ছে আমি, পি হচ্ছে পোকরান, ইউ হচ্ছে তুমি, আর এম হচ্ছে মিত্তির—প্রদোষ মিত্তির ।’

‘আর প্রাস-মাইনাস ?’

‘আই পি ১৬২৫+ইউ । অর্থাৎ আমি পোকরান পৌঁচছি বিকেল চারটে পঁচিশে, তুমি আমার সঙ্গে এসে যোগ দিও ।’

‘আর ইউ মাইনাস এম ?’

‘আরো সহজ—তুমি মিত্তিরকে কাটাও ।’

‘কাটাও !’ ধরা গলায় বললেন লালমোহনবাবু । ‘তার মানে মাইনাস হচ্ছে মার্ভার ?’

‘মার্ভারের প্রয়োজন কী ? মাঝপথে চলন্ত ট্রেন থেকে নামিয়ে দিলে এক তো জখম হবার সম্ভাবনা ছিলই, তার উপর চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হত পরের ট্রেনের জন্য । তার মধ্যে ওদের কার্যসিদ্ধি হয়ে যেত । দরকারটা ছিল আমাদের জয়সলমীর থেকে মাইনাস করা । সেই জন্যেই তো রাস্তায় এত পেরেকের ছড়াছড়ি । সেটায় কাজ হয়নি বুঝতে পেরে শেষটায় ট্রেন থেকে নামানোর চেষ্টা ।’

এতক্ষণে হঠাৎ একটা জিনিস খেয়াল করলাম । ফেলুদাকে বললাম, ‘চুরুটের গন্ধ পাচ্ছি ফেলুদা ।’

ফেলুদা বলল, ‘সেটা লোকটা কামরায় ঢোকামাত্র পেয়েছি । সার্কিট হাউসেও কোনো ব্যক্তি যে চুরুট খাচ্ছেন সেটা আগেই বুঝেছি । মুকুলের হাতের সেই রাঙতাটা চুরুটেই জড়ানো থাকে ।’

‘আর ভদ্রলোকের একটা নখ ভীষণ বড়ো । আমার কাঁধটা বোধহয় নীলুর

হাতের মতোই ছড়ে গেছে ।’

‘কিন্তু যিনি ইন্স্ট্রাকশন দিচ্ছেন সেই আই-টি কিনি ?’ জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু ।

ফেলুদা গভীর গলায় বলল, ‘সার্কিট হাউসে পাওয়া ইংরিজিতে লেখা হুমকি চিঠির সঙ্গে এই সংকেতের লেখা মিলিয়ে তো একট লোকের কথাই মনে হয় ।’

‘কে ?’ আমরা দু’জনে এক সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম ।

‘ডক্টর হেমাঙ্গমোহন হাজার ।’

রাত্র সবসুদ্ধ বোধহয় ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়েছি । যখন ঘুম ভাঙল তখন বাইরে রোদ । ফেলুদাকে দেখলাম মেঝে থেকে উঠে আমার বেঞ্চির এক কোণে বসে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে । তার কোলে রয়েছে তার নীল খাতা, আর হাতে রয়েছে দু’খানা চিঠি—একটা সেই ইংরিজিতে হুমকি আর অন্যটা ডক্টর হাজার লেখা চিঠি । ঘড়িতে দেখি পৌনে সাতটা । লালমোহনবাবু এখনো দিবি ঘুমোচ্ছেন । খিদে পাচ্ছিল ভীষণ, কিন্তু গজা খেতে আর মন চাইছিল না । জয়সলমীর পৌঁছবে প্রায় ন’টায় । বুঝলাম এই দু’ঘণ্টা সময় খিদেটাকে কোনোরকম চেপে রাখতে হবে ।

বাইরের দৃশ্য অদ্ভুত । মাইলের পর মাইল অল্প ঢেউ-খেলানো জমি দেখা যাচ্ছে দু’দিকে—তার মধ্যে একটা বাড়ি নেই, একটা লোক নেই, একটা গাছ পর্যন্ত নেই । অথচ মরুভূমি বলা যায় না, কারণ, বালি মাঝে মাঝে থাকলেও, বেশির ভাগটাই শুকনো সাদা ঘাস, লালচে মাটি আর লাল-কালো পাথরের কুচি । এরপরেও যে আবার একটা শহর থাকতে পারে সেটা ভাবলে বিশ্বাস হতে চায় না ।

একটা স্টেশন এল—জেঠা চন্দন । আমি ব্র্যাড্‌শ খুলে দেখলাম এটার পর থাইয়ৎ হামিরা, আর তার পরেই জয়সলমীর । স্টেশনে দোকান-টোকান নেই, লোকজন নেই, কুলি নেই, ফেরিওয়ালা নেই । সব মিলিয়ে মনে হয় যেন পৃথিবীর কোনো একটা অনাবিকৃত জায়গায় এই ট্রেনটা কেমন করে জানি এসে পড়েছে—ঠিক যেমনি করে রকেট গিয়ে হাজির হয় চাঁদে ।

এবার গাড়ি ছাড়ার মিনিটখানেক পরেই লালমোহনবাবু উঠে পড়ে বিরাট একটা হাই তুলে বললেন, ‘ফ্যান্টাস্টিক স্বপ্ন দেখলুম মশাই । একদল ডাকাত, গৌফগুলো সব ভেড়ার শিঙের মতো প্যাঁচানো—তাদের আমি হিপনোটাইজ করে নিয়ে চলেছি একটা কেব্লার ভিতর দিয়ে । সেই কেব্লায় একটা সুড়ঙ্গ । তাই দিয়ে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বারে পৌঁছালুম । জানি সেখানে গুপুধন আছে, কিন্তু গিয়ে দেখি একটা উট মেঝেতে বসে জিভেগজা খাচ্ছে ।’

‘গজা খাচ্ছে সেটা জানলেন কী করে?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল। ‘হাঁ করে দেখাল?’

‘আরে না মশাই। স্পষ্ট দেখলুম আমার দালদার টিনটা খোলা পড়ে আছে উটের ঠিক সামনে।’

থাইয়ৎ হামিরা স্টেশন পেরনোর কিছুক্ষণ পরেই দূরে আবছা একটা পাহাড় চোখে পড়ল। এ-ও সেই রাজস্থানী চ্যাপটা টেবল মাউন্টেন। আমাদের ট্রেনটা মনে হল সেই পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে।

আটটা নাগাদ মনে হল পাহাড়টার উপর একটা কিছু রয়েছে।

ক্রমে বুঝতে পারলাম, সেটা একটা কেল্লা। সমস্ত পাহাড়ের উপরটা জুড়ে মুকুটের মতো বসে আছে কেল্লাটা—তার উপর সোজা গিয়ে পড়েছে বকবক্কে পরিষ্কার সকালের ঝলমলে রোদ। আমার মুখ থেকে একটা কথা আপনা থেকেই বেরিয়ে পড়ল—

‘সোনার কেল্লা!’

ফেলুদা বলল, ‘ঠিক বলেছি। এটাই হল রাজস্থানের একমাত্র সোনার কেল্লা। বাটটা দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। তারপর গাইডবুক দেখে কনফার্মড হলাম। বাটটা যে পাথরের তৈরি, কেল্লাও সেই পাথরেরই তৈরি—ইয়েলো স্যান্ডস্টোন। মুকুল যদি সত্যি করেই জাতিস্মর হয়ে থাকে, আর পূর্বজন্ম বলে যদি সত্যিই কিছু থেকে থাকে, তাহলে মনে হয় ও এখানেই জন্মেছিল।’

আমি বললাম, ‘কিন্তু উস্টের হাজরা কি সেটা জানেন?’

ফেলুদা এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টে কেল্লার দিকে চেয়ে থেকে বলল, ‘জানিস তোপসে—অদ্ভুত এই সোনালি আলো। মাকড়সার জালের নকশাটা চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এই আলোয়।’

॥ ১১ ॥

জয়সলমীর স্টেশনে নেমে প্রথমেই যেটা করলাম সেটা হচ্ছে একটা খাবারের দোকানে গিয়ে চা আর একটা নতুন রকমের মিষ্টি খেয়ে খিদেটাকে মিটিয়ে নিলাম। ফেলুদা বলল—মিষ্টি জিনিসটা নাকি দরকার—ওতে গ্লুকোজ থাকে—সামনে পরিশ্রম আছে—গ্লুকোজে এনার্জি দেবে।

স্টেশনের বাইরে এসে দেখলাম গাড়িটাড়ির কোনো বালাই নেই। একটা জীপ আছে দাঁড়িয়ে, তবে সেটা যে ভাড়ার নয়, সেটা দেখেই বোঝা যায়। টাঙ্গা একা সাইক্ল-রিকশা ট্যান্ড্রি কিছু নেই। আমরা যখন ট্রেন থেকে নেমেছিলাম তখন একটা কালো অ্যান্ডারসডার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম; এখন দেখছি সে

গাড়িটাও নেই। ফেলুদা বলল, ‘জায়গাটা ছোট সেটা বোঝাই যাচ্ছে। কাজেই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গার দূরত্ব বেশি নয় নিশ্চয়ই। ডাকবাংলো একটা আছে সেটা গাইড-বুকে লিখেছে। আপাতত সেটার খোঁজ করা যাক।’

যে যার মালপত্তর হাতে নিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কাছেই একটা পেট্রোল স্টেশনে একটা লোককে জিজ্ঞেস করতেই সে রাস্তা বাতলে দিল। বুঝলাম যে ডাকবাংলোয় যাবার জন্য পাহাড়ে উঠতে হবে না, সেটা পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে সমতল জমির উপরেই। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার বালির উপর টায়ারের দাগ দেখে ফেলুদা বলল, ‘অ্যান্ডারসডারটাও এই রাস্তাতেই গেছে বলে মনে হচ্ছে।’

প্রায় মিনিট পনেরোহাঁটার পর একটা একতলা বাড়ির সামনে কাঠের ফলকে লেখা দেখে বুঝলাম আমরা ডাকবাংলোয় এসে গেছি। বাংলোর সামনেই দেখি কালো অ্যান্ডারসডারটা দাঁড়িয়ে আছে।

আমাদের দেখতে পেয়েই বোধহয় একটা খাকি সার্ট খাটো ধুতি আর পাকানো পাগড়ি পরা বুড়ো লোক পাশের একটা আউট-হাউস থেকে বেরিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। ফেলুদা তাকে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল সে চৌকিদার কিনা। লোকটা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বুঝিয়ে দিল। তার চাউনি দেখে বুঝলাম যে আমাদের আসাটা তার কাছে অপ্রত্যাশিত, আর ব্যাপারটা সে একটু সন্দেহের চোখে দেখছে, কারণ পারমিশন ছাড়া বাংলায় থাকতে দেয় না এটা আমি জানি।

ফেলুদা বাংলায় থাকার প্রশ্নটাই তুলল না। সে বলল যে আপাতত সে শুধু মালগুলো রেখে যেতে চায়, তারপর পারমিশনের চেষ্টা দেখবে। চৌকিদার বলল সেটার জন্য রাজার সেক্রেটারির কাছে যেতে হবে। রাজবাড়ি কোনদিকে সেটাও সে হাত তুলে দেখিয়ে দিল। দূরে গাছপালার মাথার উপর দিয়ে হলদে পাথরের তৈরি প্যালেসের খানিকটা অংশও দেখতে পেলাম।

চৌকিদার মালগুলো রাখতে দিতে কোনো আপত্তি করল না। তার একটা কারণ অবিশ্যি এই যে, ফেলুদা ইতিমধ্যে তার হাতে একটা কড়কড়ে দু’ টাকার নোট ঝুঁজে দিয়েছে।

একটা ঘরের মধ্যে সুটকেস বিছানা রেখে ফ্লাস্কগুলোতে জল ভরে কাঁধে বুলিয়ে নিয়ে চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করা হল কেল্লায় যেতে হলে কোন রাস্তা দিয়ে যেতে হবে।

‘ইউ ওয়ান্ট টু গো টু দ্য ফোর্ট?’

প্রশ্নটা এল বারান্দার ও-মাথা থেকে। একটি ভদ্রলোক ওদিকের একটা ঘর থেকে সবমাত্র বেরিয়েছেন। ফর্সা রং, বয়স চল্লিশের বেশি নয়, খুব মন দিয়ে ছাঁটা সরু একটা গৌঁফ চোখা নাকের নিচে। এবার আরেকটু বেশি বয়সের

আরেকটি ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে প্রথম ভদ্রলোকটির পাশে দাঁড়ালেন। ঐর হাতে একটা লাঠি—যেমন লাঠি আমরা যোধপুরের বাজারে দেখেছি—আর গায়ে কেমন যেন একটা বেখাপ্লা কালো সুট। এরা দু'জনে কোন্ দেশী সেটা বোঝা গেল না। লক্ষ করলাম দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি একটু যেন খোঁড়াচ্ছেন, আর সেই জনোই বোধহয় তার লাঠির দরকার হচ্ছে।

ফেলুদা বলল, 'ফোর্টটা একবার দেখতে পারলে মন্দ হত না।'

'কাম অ্যালান্স উইথ আস্—উই আর গোল্ডিং দ্যাট ওয়ে।'

ফেলুদা কয়েক সেকেন্ডের জন্য কী জানি ভেবে যেতে রাজী হয়ে গেল।

'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। দ্যাট ইজ ভেরি কাইন্ড অফ ইউ।'

আমরা গাড়ির দিকে যাবার সময় লালমোহনবাবু ফিসফিস করে বললেন, 'এরা আবার চলন্ত মোটরগাড়ি থেকে নামিয়ে দিতে চাইবে না তো?'

গাড়ি কেবলর দিকে রওনা দিল। লাঠিওয়ালা ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'আর ইউ ফ্রম ক্যালকাটা?'

ফেলুদা বলল, 'হ্যাঁ।'

বাঁ দিকে বালির উপর দূরে দেখলাম দেবীকুণ্ডের মতো কতগুলো স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে। ফেলুদা বলল ও জিনিসটা নাকি রাজস্থানের সব শহরেই রয়েছে।

আমাদের গাড়ি ক্রমে পাহাড়ের গা বেয়ে চড়াই উঠতে আরম্ভ করল।

মিনিটখানেক ওঠার পর পিছন থেকে আরেকটা গাড়ির শব্দ পেলাম। গাড়িটা ক্রমাগত হর্ন দিচ্ছে। অথচ আমরা যে খুব আস্তে চলছিলাম তাও নয়। তাহলে লোকটা বার বার হর্ন দিচ্ছে কেন?

ফেলুদা দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে পিছনে বসেছিল। সে হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখে নিয়ে আমাদের গাড়ির ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, 'রোক্কে, রোক্কে!'

আমাদের গাড়ি রাস্তার এক পাশে থামতেই আমাদের ডান পাশে এসে দাঁড়াল একটা ট্যাক্সি—তার স্টিয়ারিং ধরে হাসিমুখে বসে আমাদের সেলাম জানাচ্ছেন গুরুবচন সিং।

আমরা তিনজনেই নেমে পড়লাম। ফেলুদা ভদ্রলোক দু'জনকে ইংরিজিতে বলল—আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। আমাদের নিজেদের ট্যাক্সিটা পথে খারাপ হয়ে গিয়েছিল—সেটা এসে পড়েছে।

গুরুবচন বলল ভোর সাড়ে ছটায় নাকি একটা চেনা ট্যাক্সি জয়সলমীর থেকে ফিরছিল—তার কাছ থেকে স্পেয়ার চেয়ে নিয়েছে। নব্বই মাইল রাস্তা নাকি সে দু'ঘণ্টায় এসেছে। এখানে এসে পেট্রোল স্টেশনটায় দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ কালো অ্যান্ডারকার্টার ভিতর আমাদের দেখতে পায়।

আরো খানিকটা পথ যেতেই আমরা একটা বাজারের মধ্যে এসে পড়লাম। চারদিকে দোকানপাট গিজগিজ করছে, লাউডস্পীকারে হিন্দী ফিল্মের গান হচ্ছে, একটা ছোট্ট সিনেমা হাউসের বাইরে আবার হিন্দী ছবির বিজ্ঞাপনও রয়েছে।

'আপলোগ কিব্লা দেখনে মাংতা?' গুরুবচন সিং জিজ্ঞেস করল। ফেলুদা হ্যাঁ বলতে গুরুবচন সিং ট্যাক্সি খামাল। 'ইয়ে হ্যায় কিব্লাকা গেট।'

ডান দিকে চেয়ে দেখি এক পেব্লায় ফটক—তারপর পাথরে বাঁধানো রাস্তা চড়াই উঠে গেছে আরেকটা ফটকের দিকে। বুঝলাম, এটা বাইরের গেট আর ভেতরেরটা আসল গেট। দ্বিতীয় গেটের পিছন থেকেই খড়াই উঠে গেছে জয়সলমীরের সোনার কেব্লা।

গেটের বাইরে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখলেই প্রহরী বলে বোঝা যায়। ফেলুদা তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল সকালের দিকে কোনো বাঙালী ভদ্রলোক একটা ছোট ছেলেকে সঙ্গে করে কেব্লা দেখতে এসেছিলেন কিনা। ফেলুদা হাত দিয়ে মুকুলের হাইটটাও বুঝিয়ে দিল।

—আয়া থা, কিন্তু এখন নেই, চলে গেছে।

—কখন?

—আধ ঘণ্টা হবে।

—গাড়িতে এসেছিল?

—হ্যাঁ—এক টেক্সি থা।

—কোন্ দিকে গেছে বলতে পার?

প্রহরী পশ্চিম দিকের রাস্তাটা দেখিয়ে দিল। আমরা সেই রাস্তা ধরে অলিগলি দোকানপাটের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগলাম। লালমোহনবাবু সামনে বসেছেন গুরুবচনের পাশে, আমি আর ফেলুদা পিছনে। কিছুক্ষণ চলার পর ফেলুদা হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'আপনার অস্ট্রাট আনেননি তো সঙ্গে?'

লালমোহনবাবু অন্যমনস্কতার মধ্যে হঠাৎ প্রশ্ন শুনে চমকে বললেন, 'ভোপালি? ইয়ে-মানে-গিয়ে-আপনার—ভোজালি?'

'হ্যাঁ। আপনার নেপালী ভোজালি।'

'সে তো স্টকেসে স্যার।'

'তাহলে আপনার পাশে রাখা জাপান এয়ার লাইন্সের ব্যাগ থেকে মন্দার বোসের রিভলভারটা বার করে কোটের তলায় বেটের মধ্যে গুঁজুন—যাতে বাইরে থেকে বোঝা না যায়।'

লালমোহনবাবুর নড়াচড়া থেকে বুঝলাম তিনি ফেলুদার আদেশ পালন করছেন। এই সময় তার মুখটা দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করছিল।

'কিছু না,' ফেলুদা বলল, 'গোলমাল দেখলে স্রেফ ট্যাক থেকে ওটি বার করে

সামনের দিকে পয়েন্ট করে দাঁড়িয়ে থাকবেন।’

‘আর পে-পেছন দিয়ে যদি—’

‘পেছনে কিছু হচ্ছে বুঝলে আপনি নিজে ঘুরে যাবেন, তখনই সেটা সামনে হয়ে যাবে।’

‘আর আপনি? আপনি বুঝি আজ, মানে, নন-ভায়োলেন্ট?’

‘সেটা প্রয়োজন বুঝে।’

ট্যাক্সিটা বাজার ছাড়িয়ে একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ল। আমরা এর মধ্যে আরো দু-একজনকে জিজ্ঞেস করে অন্য ট্যাক্সিটা কোন পথে গেছে জেনে নিয়েছি। তাছাড়া রাস্তার বালির উপর মাঝে মাঝে টায়ারের দাগ দেখতে পাচ্ছি আর তাতেই বুঝতে পারছি যে আমরা হেমাঙ্গ হাজারার রাস্তাতেই চলেছি।

গুরুবচন সিং বলল, ‘ইয়ে হ্যায় মোহনগড় জানেকা রাস্তা। আউর এক মিল জানা সেক্তা। উস্কে বাদ রাস্তা বহৎ খারাপ হ্যায়। জীপ ছোড়কে দুস্কা গাড়ি নেহি যাতা।’

এক মাইলও অবিশ্যি যেতে হল না। কিছু দূর গিয়েই দেখতে পেলাম রাস্তার এক ধারে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার ডান দিকে খানিকটা দূরে রয়েছে একসঙ্গে অনেকগুলো পরিত্যক্ত একতলা ছাত ছাড়া খুপরি মতো পাথরের বাড়ি। বুঝলাম, এটাও হচ্ছে একটা প্রাচীন গ্রাম, যেমন গ্রাম আমরা এর আগে আরো দু-একটা দেখেছি। এসব গ্রাম থেকে লোকজন নাকি বহুকাল আগে চলে গেছে; শুধু দেয়ালগুলো পাথরের তৈরি বলে এখনো দাঁড়িয়ে আছে।

গুরুবচন সিংকে অপেক্ষা করতে বলে আমরা বাড়িগুলোর দিকে এগোলাম। সদরর্জী দেখলাম গাড়ি থেকে নেমে অন্য ট্যাক্সির দিকে এগিয়ে গেল—বোধহয় জাতভাইয়ের সঙ্গে আড্ডা মারতে।

চারিদিক থমথম করছে। পিছন দিকে চাইলে দূরে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের মাথায় জয়সলমীরের কেলা। রাস্তার উলটো দিকে খাড়াই উঠে গেছে পাহাড়। তার ঠিক পায়ের কাছে একটা প্রকাণ্ড খোলা জায়গা জুড়ে মাটিতে পোঁতা শিল-নোড়ার মতো হলদে পাথরের সারি। ফেলুদা ফিসফিস করে বলল, ‘যোদ্ধাদের কবর।’

লালমোহনবাবু খসখসে মিহি গলায় বললেন, ‘আমার কিন্তু আবার লো ব্লাড প্রেশার।’

‘কিছু ভাববেন না’, ফেলুদা বলল, ‘দেখতে দেখতে হাই হয়ে যেমনটি চাই তেমনটি হয়ে যাবে।’

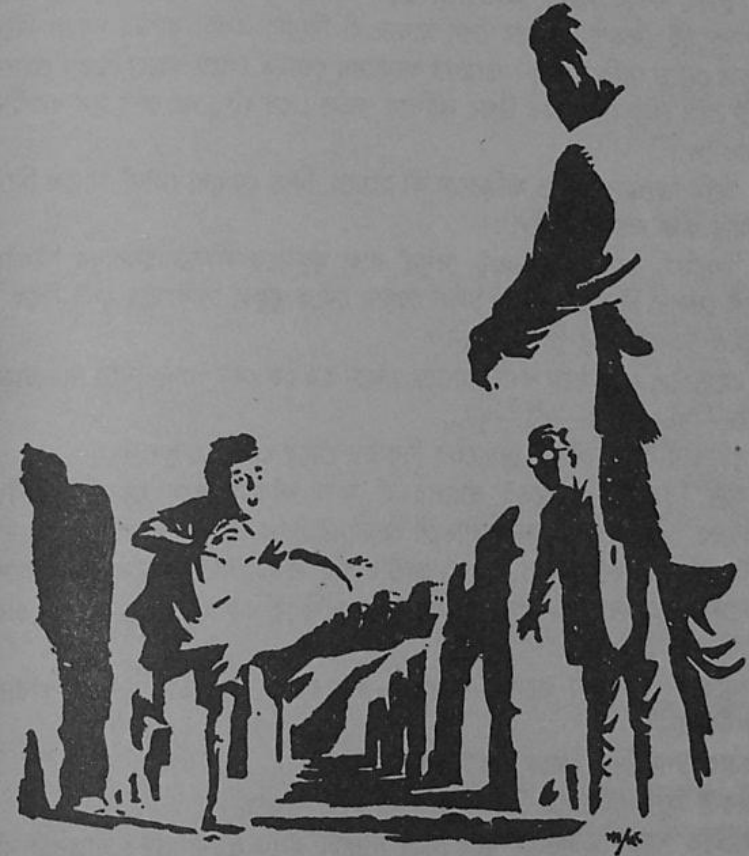
বাড়িগুলোর কাছে এসে পড়েছি। সারি সারি বাড়ির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সোজা রাস্তা। বেশ বুঝলাম এ গ্রাম বাংলাদেশের গ্রামের মতো নয়। এর মধ্যে

একটা সহজ জ্যামিতিক প্ল্যান আছে।

কিন্তু ট্যাক্সির যাত্রীরা কোথায়? মুকুল কোথায়? ডক্টর হেমাঙ্গ হাজারা কোথায়?

মুকুলের কিছু হয়নি তো?

হঠাৎ খেয়াল হল কানে একটা শব্দ আসছে—এখনো খুবই আন্তে—কিন্তু কান পাতলে শোনা যায়। খট—খট—খট...



অত্যন্ত সাবধানে একটুও শব্দ না করে আরো কয়েক পা এগিয়ে দেখলাম, একটা চৌরাস্তায় এসে পড়েছি। আমরা এখনো দুটো রাস্তার ক্রসের মাঝখানে

দাঁড়িয়ে আছি। ডান দিক দিয়ে শব্দটা আসছে। রাস্তার দু'দিকে দশ-বারোটা বাড়ির সারি—তাদের দেয়াল আর দরজার ফাঁকগুলো শুধু দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা ডানদিকের রাস্তাটা ধরেই পা টিপে টিপে এগোতে লাগলাম।

ফেলুদা দাঁতের ফাঁক দিয়ে প্রায় শোনা যায় না এমনভাবে বলল, 'রিভলভার'—আর সেই সঙ্গে তার নিজের হাতটাও চলে গেল কোটের ভিতর। আড়চোখে দেখলাম লালমোহনবাবুর হাতেও রিভলভার এসে গেছে, আর সেটা অসম্ভব কাঁপছে।

হঠাৎ একটা খচমচ আওয়াজ শুনে আমরা থমকে দাঁড়লাম, আর তার পরমুহূর্তেই দেখলাম রাস্তার শেষ মাথায় বাঁ দিকের একটা বাড়ির দরজা দিয়ে মুকুল দৌড়ে বেরিয়ে এল—তারপর আমাদের দেখতে পেয়ে আরো দ্বিগুণ জোরে ছুটে এসে ফেলুদার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে হাঁপাচ্ছে, তার মুখ রক্তহীন ফ্যাকাসে।

আমি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম কী হয়েছে, কিন্তু ফেলুদা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আমার কথা বন্ধ করে দিল।

ফিসফিস করে 'একে একটু দেখুন' বলে মুকুলকে লালমোহনবাবুর জিম্মায় রেখে ফেলুদা নিঃশব্দে এগিয়ে চলল যেখান থেকে মুকুল বেরিয়েছে সেই দিকে। আমিও চললাম তার পিছন পিছন।

এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে শব্দটা বাড়ছে। মনে হয় কে যেন পাথর নিয়ে নাড়াচাড়া করছে—খট্—খটাং—খট্—খট্...

বাড়িটার কাছে পৌঁছে দেয়ালের দিকটায় ঘেঁষে গেল ফেলুদা।

আর তিন পা বাড়াতেই দরজার হাঁ করা ফাঁকটা দিয়ে দেখলাম ডক্টর হাজরাকে। ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে পিঠ করে পাগলের মতো একটা ভাঙা পাথরের স্তূপ থেকে একটার পর একটা পাথর তুলে এক পাশে ফেলছেন। আমরা যে এসে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছি, সেটা তাঁর খেয়াল নেই।

আরেক পা সামনে এগোল ফেলুদা—তার হাতে রিভলভার ডক্টর হাজরার দিকে উঁচোনো।

হঠাৎ উপর দিক থেকে একটা ঝটপট শব্দ।

একটা ময়ূর পাঁচিলের উপর থেকে লাফিয়ে পড়েছে।

মাটিতে পড়েই তীরবেগে ছুটে গিয়ে ময়ূরটা উপড় হওয়া ডক্টর হাজরার বাঁ কানের ঠিক নিচে একটা সাংঘাতিক ঠোকর মারল। ডক্টর হাজরা যন্ত্রণায় আতর্জন করে হাত দিয়ে ঠোকরানোর জায়গাটা চেপে ধরতেই তার সাদা সার্টের আঙ্গিনটা লাল হয়ে উঠল।

এদিকে ময়ূরটা ঠোকর মেরেই চলেছে। তার মধ্যেই ডক্টর হাজরা পালাতে গিয়ে আমাদের সামনে দেখে ভূত দেখার মতো ভাব করলেন। আমরা দরজা ছেড়ে পিছিয়ে দাঁড়লাম, আর ময়ূর তাকে ঠুকরে ঘর থেকে বার করে দিল।

'গুণ্ডনের জায়গায় যে ময়ূরের বাসা থাকবে, আর তার মধ্যে যে ডিম থাকবে—এটা বোধহয় আপনি ভাবতে পারেননি—তাই না?'

ফেলুদার গলার স্বর ইম্পাত, তার রিভলভার ডক্টর হাজরার দিকে তাগ করা। বেশ বুঝতে পারছিলাম যে ডক্টর হাজরাই শয়তান, আর তার শাস্তিও হয়েছে চমৎকার, কিন্তু অন্য অনেক কিছুই এখনো এত ধোঁয়াটে রয়েছে যে মাথাটা কেমন জানি গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল।

একটা গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। ডক্টর হাজরা মাটিতে উপুর হয়ে আছেন। তার ঘাড়টা আস্তে আস্তে ফেলুদার দিকে ফিরল, তাঁর বাঁ হাতটা এখন একটা রক্তাক্ত রুমাল সমেত ক্ষতের উপর চাপা।

ফেলুদা বলল, 'আর কোনো আশা নেই জানেন! এবার আপনার দু'দিকের রাস্তাই বন্ধ।'

ফেলুদার কথা শেষ হবার আগেই ডক্টর হাজরা হঠাৎ চোখের পলকে দাঁড়িয়ে উঠে একটা উন্মাদ দৌড় দিলেন উল্টো দিকে। ফেলুদা রিভলভারটা নামিয়ে নিল—কারণ সত্যিই পালাবার কোনো পথ নেই। উল্টো দিক থেকে আমাদের দু'জন চেনা ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন। যার হাতে লাঠি নেই, তিনি খপ করে ক্রিকেট বল লোফার মতো ডক্টর হাজরাকে বগলদাবা করে নিলেন।

এবারে লাঠিওয়ালা ভদ্রলোকটি ফেলুদার দিকে এগিয়ে এলেন। ফেলুদা রিভলভারটা বাঁ হাতে চালান দিয়ে ডান হাতটা ভদ্রলোকের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আসুন ডক্টর হাজরা।'

অ্যাঁ! ইনিই ডক্টর হাজরা?

ভদ্রলোক ফেলুদার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন, 'আপনিই তো বোধহয় প্রদোষ মিত্রের?'

'আপ্তে হ্যাঁ। আপনার নাগরা পরার দরুন ফোসকাটা এখনো সারেনি বলে মনে হচ্ছে...'

আসল ডক্টর হাজরা হেসে বললেন, 'পরশু সুধীরবাবুকে ট্রাঙ্ক কল করেছিলাম। উনিই বললেন আপনি এসেছেন। যা বর্ণনা দিলেন তা থেকে চিনতে কোনো অসুবিধা হয়নি। আলাপ করিয়ে দিই—ইনি হলেন ইন্সপেক্টর রাঠোর।'

'আর উনি?' ফেলুদা হাত-কড়া পরা মাথা হেঁট-করা ময়ূরের ঠোকর-খাওয়া ভদ্রলোকটির দিকে দেখাল। 'উনিই বুঝি ভবানন্দ?'

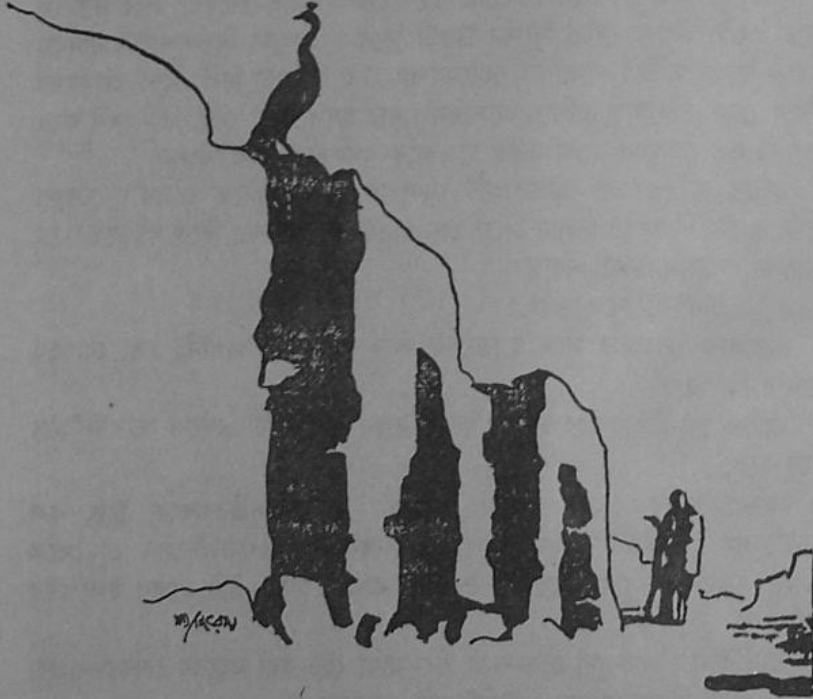
‘ইয়েস’, বললেন ডক্টর হাজরা, ‘ওরফে অমিয়নাথ বর্মণ, ওরফে দ্য গ্রেট বারম্যান—উইজার্ড অফ দ্য ইস্ট।’

॥ ১২ ॥

ভবানন্দ এখন রাজস্থানী পুলিশের জিন্মায়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ—ডক্টর হেমান্দ হাজরাকে খুন করার চেষ্টা, তার জিনিসপত্র নিয়ে সটকে পড়া, নিজের নাম ভাঁড়িয়ে হেমান্দ হাজরার ভূমিকা গ্রহণ করা ইত্যাদি। আমরা ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে উটের দুধ দেওয়া কফি খাচ্ছি। মুকুল সামনের বাগানে দিব্যি ফুঁর্তিতে খেলে বেড়াচ্ছে, কারণ সে জানে আজই সে কলকাতা রওনা হবে। সোনার কেলা দেখার পর তার আর রাজস্থানে থাকার ইচ্ছে নেই।

ফেলুদা আসল ডক্টর হাজরার দিকে ফিরে বলল, ‘ভবানন্দ শিকাগোতে সত্যিই ভণ্ডামি করছিল তো? কাগজে যা বেরিয়েছিল তা সত্যি তো?’

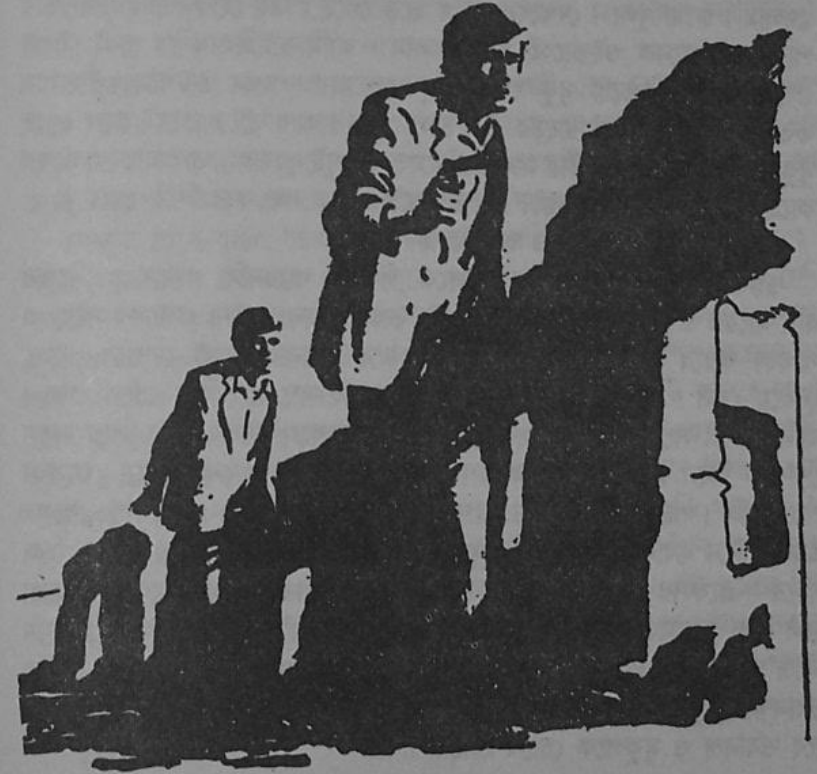
হাজরা বললেন, ‘বোল আনা সত্যি। ভবানন্দ আর তার সহকারী মিলে যে



কত দেশে কত কুকীর্তি করেছে তার ইয়ত্তা নেই। তা ছাড়া শিকাগোয় আরো ব্যাপার আছে। নিজের ভণ্ডামির সঙ্গে সঙ্গে আমার মিথ্যে বদনাম রটাচ্ছিল, আমার কাজের বিস্তার অসুবিধা করছিল। কাজেই শেষটায় বাধ্য হয়ে স্টেপ নিতে হল। অবিশ্যি এ হল চার বছর আগের কথা। ওরা কবে দেশে ফিরেছে জানি না। আমি ফিরেছি মাত্র তিন মাস হল। সুধীরবাবুর দোকানে গিয়েছিলাম, সেখানে তার ছেলের কথা শুনে তাকে দেখতে যাই। তার পরের ব্যাপার তো আপনি জানেনই। আমি যখন মুকুলকে নিয়ে রাজস্থানে আসা স্থির করলাম, তখন কিন্তু ভাবতেই পারিনি যে আমার পিছনে লোক লাগবে।

‘এক টিলে দুই পাখি কে না মারতে চায় বলুন!’ ফেলুদা বলল। ‘একে গুপ্তধনের আশা, তার উপর আপনার উপর প্রতিশোধ।...তা, এদের সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয়নি আপনার?’

‘মোটাই না। প্রথম দেখা হয় একেবারে বান্দিকুই স্টেশনের রিফ্রেশমেন্ট



ক্রমে। আমি আশ্রয় একদিন থেকে না গেলে ট্রেনে ওদের সঙ্গে দেখা হত না।
ভদ্রলোকেরা নিজে থেকে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন।’

‘আপনি চিনতে পারলেন না?’

‘কী করে চিনবে? শিকাগোতে তো এরা ছিলেন একেবারে শ্মশ্রুগুফ সম্বলিত
মহাঋষি মহেশ!’

‘তারপর?’

‘তারপর আমাদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেলো, ম্যাজিক দেখিয়ে মুকুলের
সঙ্গে ভাব জমালো, একই ট্রেনে একই কামরায় উঠল। কিষণগড়ে নেমে মুকুলকে
কেলা দেখাব সেটা আগেই ঠিক করেছিলাম, কিন্তু এরাও যে আমার পিছু পিছু
নেমেছে সেটা জানতে পারিনি। আমি কেলায় যাবার কিছু পরেই এরাও
পৌঁছেছে। জনমানবশূন্য জায়গা, চোরের মতো এসেছে, আড়ালে আড়ালে তাকে
তাকে থেকেছে, সুযোগ পেয়ে পাহাড়ের উপর থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে।
গড়াতে গড়াতে শ’ খানেক ফুট নিচে গিয়ে একটা ঝোপড়ায় আটকে পড়ে বেঁচে
গেলাম। জামা খুললে দেখবেন সর্বাঙ্গ ছড়ে গেছে। যাই হোক—এই ঝোপড়ার
পাশে ঘন্টাখানেক ওইভাবেই রয়ে গেলাম। আমি চাইছিলাম যে ওরা আপদ
গেছে ভেবে নিশ্চিন্তে মুকুলকে নিয়ে চলে যায়। যখন স্টেশনে পৌঁছালাম
ততক্ষণে আটটার মারোয়াড়ের ট্রেন চলে গেছে। আর তাতে করেই চলে গেছে
মুকুল, এবং আমার যাবতীয় মালপত্র সমেত ওই দুই ধুরন্ধর। তার মানে লোকের
কাছে আমার সঠিক পরিচয়টা দেবার রাস্তাটাও তারা বন্ধ করে দিয়ে গেছে।’

‘মুকুল ওদের সঙ্গে যেতে আপত্তি করল না?’

ডক্টর হাজরা হাসলেন। ‘মুকুলকে চিনতে পারেননি এখনো? নিজের
বাপ-মায়ের ওপরই যখন ওর টান নেই, তখন দু’জন অচেনা লোকের মধ্যে ও
পার্থক্য করবে কেন? ভবানন্দ বলেছে ওকে সোনার কেলা দেখাবে—ব্যস,
ফুরিয়ে গেল। যাই হোক—হাল তো ছাড়লামই না, বরং জিদ চেপে গেল।
মানি-ব্যাগটা সঙ্গেই ছিল। নিজের ছেঁড়া জামাকাপড় পুঁটলির মধ্যে নিয়ে নতুন
পোশাক কিনে রাজস্থানী সাজলাম। নাগরা পরা অভ্যেস নেই, পায়ে ফোসকা
পড়ে গেল। পরদিন কিষণগড়ে আপনাদের কামরায় উঠলাম। মারওয়াড় থেকেও
একই ট্রেনে যোধপুর এলাম। রঘুনাথ সরাইয়ে উঠলাম। চেনা লোক ছিল
শহরে—প্রফেসর ত্রিবেদী—তাকে গোড়ায় কিছু জানালাম না। বেশি হৈ-হল্লা
হলে ওরা পালাতে পারে, কিংবা মুকুল ভয় পেয়ে বেঁকে বসতে পারে। আমি
নিজে আঁচ করেছিলাম জয়সলমীরই আসল জায়গা, এখন খালি অপেক্ষা—কবে
ভবানন্দও মুকুলকে নিয়ে জয়সলমীরে পাড়ি দেয়। তার আগে পর্যন্ত আমার কাজ
হবে ভবানন্দ ও মুকুলকে চোখে চোখে রাখা।’

‘সেদিন সার্কিট হাউসের বাইরে তো আপনিই ঘুরছিলেন?’

‘হ্যাঁ। আর তাতেও তো এক ফ্যাসাদ! মুকুল দেখি আমাকে চিনে ফেলেছে।
অস্তুত সেরকম একটা ভাব করেই গेट থেকে বেরিয়ে সোজা আমার দিকে চলে
আসছিল।’

‘তারপর আপনি ভবানন্দকে ফলো করে পোকরানের গাড়িতে উঠলেন?’

‘হ্যাঁ। আর সবচেয়ে মজা—ট্রেন থেকে দেখতে পেলাম আপনারা গাড়ি
থামাতে চেষ্টা করছেন।’

‘সেটা নিশ্চয় ভবানন্দও দেখেছিল, আর তাই জেনে গিয়েছিল রামদেওরাত্তেই
হয়ত আমরা ট্রেন ধরব।’

ডক্টর হাজরা বলে চললেন, ‘ট্রেনে ওঠার আগে ত্রিবেদীকে ফোন করে
জয়সলমীরে পুলিশকে খবর দিতে বলে দিয়েছিলাম। তার আগেই অবশ্য ওর
বাড়ি থেকেই কলকাতায় ফোন করে আপনার আসার খবর পেয়েছি, আর
ত্রিবেদীর কাছ থেকে একটি স্যুট ধার করে ভদ্রলোক সেজেছি।’

ফেলুদা বলল, ‘পোকরানে গিয়ে বোধহয় দেখলেন ভবানন্দের অ্যাসিস্ট্যান্ট
ট্যাক্সি নিয়ে হাজির, তাই না?’

‘ওইখানেই তো গুণ্ডগোল হয়ে গেল। আই লস্ট দেম। দশ ঘণ্টা অপেক্ষা
করে আবার রাতের ট্রেন ধরতে হল। সে গাড়িতে যে আপনি আছেন তা তো
জানি না। আপনাদের প্রথম দেখলুম এই ডাকবাংলাতে। এখন আমার প্রশ্ন
হচ্ছে—আপনি কখন প্রথম ভবানন্দকে সন্দেহ করলেন?’

ফেলুদা হেসে বলল, ‘ভবানন্দকে সন্দেহ করেছিলাম বললে ভুল বলা হবে।
করেছিলাম ডক্টর হাজরাকে। যোধপুরে নয়, বিকানিরে। দেবীকুণ্ডে গিয়ে দেখি
ভদ্রলোক হাত-মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন। তার ঠিক আগেই একটা দেশলাই
কুড়িয়ে পাই—টেঙ্কা মার্ক। এটা রাজস্থানে বিক্রি হয় না। তারপর ভদ্রলোককে
ওই বেগতিক অবস্থায় দেখে মনে হল যে-লোক এই কুকর্মটি করেছে তারই
হয়ত দেশলাই। কিন্তু তারপর দেখলাম বাঁধনেও গুণ্ডগোল। একজন লোকের
হাত-পা এক সঙ্গে বেঁধে দিলে সে লোক অসহায় হয়ে পড়তে পারে, কিন্তু যেখানে
শুধু হাত দুটো পেছনে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সেখানে একটু বুদ্ধি থাকলেই পা
দুটোকে ভাঁজ করে তার তলা দিয়ে হাত দুটো সামনে এনে বাঁধন খুলে ফেলা
যায়। বুঝতে পারলাম ভদ্রলোক নিজেই নিজেকে বেঁধেছেন। এটা বুঝেও কিন্তু
ভাবছি, ডক্টর হাজরারই আসল কালপ্রিট। শেষটায় চোখ খুলে গেল আজ সকালে
ট্রেনে—আপনার প্যাডে লেখা ভবানন্দের একটা চিঠির দিকে চেয়ে থাকতে
থাকতে।’

‘কীরকম?’

‘কাগজের ওপরে আপনার নাম ছাপা হয়েছে, তাতে J দিয়ে হাজরা লেখা। আর ইনি নাম সেই করেছেন চিঠির নিচে তাতে দেখি Z। তখনই বুঝলাম এ হাজরা আসলে হাজরাই নন। কিন্তু ইনি তাহলে কে? নিশ্চয় যারা কলকাতায় নীলু ছেলেটিকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাদেরই একজন। আর অন্যটি হচ্ছেন মন্দার বোস—যার ডান হাতের একটা নখ বড়, আর যার মুখে সিগারের গন্ধ আমিও পেয়েছি, নীলুও পেয়েছে। কিন্তু তাহলে আসল হাজরা কোন ব্যক্তি এবং তিনি এখন কোথায়? এর উত্তর একটাই হতে পারে—হাজরা হলেন তিনিই, যিনি নাগরা পরে পায়ে ফোসকা করেছিলেন, কিষণগড়ে আমাদের কামরায় উঠেছিলেন, সার্কিট হাউসের এবং বিকানির কেলার আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছিলেন, এবং জয়সলমীরের ডাকবাংলোয় লাঠি হাতে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন।’

ডক্টর হাজরা বললেন, ‘সুধীরবাবু আপনাকে খবর দিয়ে খুবই বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলেন, কারণ আমি একা বোধহয় জুত করে উঠতে পারতাম না। ভবানন্দর অ্যাসিস্ট্যান্টকে তো আপনারাই জব্দ করেছেন। এবারে তাঁর হাতেও হাতকড়াটি পড়লেই ষোলো কলা পূর্ণ হয়।’

ফেলুদা লালমোহনবাবুর দিকে দেখিয়ে বলল, ‘মন্দার বোসকে প্রথম সন্দেহ করার পিছনে কিন্তু এনার যথেষ্ট কনট্রিবিউশন আছে।’

লালমোহনবাবু এর মধ্যে অনেকবার একটা কথা বলতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু পারেননি। এবার তিনি সেটা বলে ফেললেন—

‘আচ্ছা স্যার, তাহলে গুপ্তধনের ব্যাপারটা কী হচ্ছে?’

‘ওটা ময়ূরে পাহারা দিচ্ছে দিক না!’ বললেন ডক্টর হাজরা। ‘ওদের বেশি ঘাঁটালে কী ফল হয় সেটা তো দেখলেন!’

ফেলুদা বলল, ‘আপাতত আপনার কাছে যে গুপ্তধনটা রয়েছে সেটা তো ফেরত দিন মশাই। অবিশ্যি যেভাবে উঁচিয়ে রয়েছে আপনার কোটটা কোমরের কাছে, তাতে গুপ্ত আর বলা চলে না।’

লালমোহনবাবু বেশ একটু মন-মরা ভাবেই মন্দার বোসের রিভলভারটা বার করে ফেলুদাকে দিয়ে দিলেন।

সেটা হাতে নিয়ে ‘থ্যাঙ্ক ইউ’ বলেই ফেলুদা হঠাৎ কেমন জানি গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর রিভলভারটা নেড়েচেড়ে দেখল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, ‘বলিহারি মিস্টার ট্রটার—এভাবে ভাঁওতা দিলেন প্রদোষ মিত্তিরকে?’

‘কী ব্যাপার? কী হল?’—আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম।

‘আরে এ যে একেবারেই ফাঁকি—মেড ইন জাপান—ম্যাজিসিয়ানরা স্টেজে ব্যবহার করে এই রিভলভার!’

সকলে হেসে ফেটে পড়ার ঠিক আগে ফেলুদার হাত থেকে রিভলভারটা নিয়ে দাঁত বার করে জটায়ু বললেন, ‘ফর মাই কালেকশন—অ্যান্ড অ্যাজ এ স্মৃতিচিহ্ন অফ আওয়ার পাওয়ারফুল অ্যাডভেঞ্চার ইন রাজস্থান! থ্যাঙ্ক ইউ স্যার!’

ছিন্নমস্তার অভিশাপ



রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু চোখের সামনে থেকে বইটা সরিয়ে ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'রামমোহন রায়ের নাতির সার্কাস ছিল সেটা জানতেন?'

ফেলুদার মুখের উপর রুমাল চাপা, তাই সে শুধু মাথা নাড়িয়ে না জানিয়ে দিল।

প্রায় দশ মিনিট ধরে একটা পর্বতপ্রমাণ খড়বোঝাই লরি আমাদের যে শুধু পাশ দিচ্ছে না তা নয়, সমানে পিছন থেকে রেলগাড়ির মতো কালো ধোঁয়া ছেড়ে প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছে। লালমোহনবাবুর গাড়ির ড্রাইভার হরিপদবাবু বার বার হর্ন দিয়েও কোনো ফল হয়নি। লরির পিছনের ফুলের নকশা, নদীতে সূর্য অস্ত যাওয়ার দৃশ্য, হর্ন প্লীজ, টা-টা গুডবাই, থ্যাঙ্ক ইউ সব মুখস্থ হয়ে গেছে। লালমোহনবাবু সার্কাস সম্বন্ধে বইটা কিছুদিন হল জোগাড় করেছেন; অনেক দিন আগের লেখা বই, নাম 'বাঙালীর সার্কাস'। বইটা ওঁর ঝোলার মধ্যে ছিল, লরির জ্বালায় সামনে কিছু দেখবার জো নেই বলে সেটা বার করে পড়তে শুরু করেছেন। ইচ্ছে আছে সার্কাস নিয়ে একটা রহস্য উপন্যাস লেখার, তাই ফেলুদার পরামর্শ অনুযায়ী বিষয়টা নিয়ে একটু পড়াশুনা করে রাখছেন। সার্কাসের কথা অবিশ্যি এমনিতেই হচ্ছিল, কারণ আজ সকালেই রাঁচি শহরে দ্য গ্রেট ম্যাজেস্টিক সার্কাসের বিজ্ঞাপন দেখেছি। হাজারিবাগে এসেছে সার্কাস, আর আমরা যাচ্ছিও হাজারিবাগেই। ওখানে সন্ধ্যাবেলা আর কিছু করার না থাকলে একদিন গিয়ে সার্কাস দেখে আসব সেটাও তিনজনে প্ল্যান করে রেখেছি।

শীতের মুখটাতে কোথাও একটা যাবার ইচ্ছে ছিল; লালমোহনবাবুর নতুন বই পুজোয় বেরিয়েছে, তিন সপ্তাহে দু হাজার বিক্রি, ভদ্রলোকের মেজাজ খুশ, হাত

খালি। নতুন বইয়ের নাম 'ভ্যানকুভারের ভ্যামপায়ার'-এ ফেলুদার আপত্তি ছিল ; ও বলেছিল ভ্যানকুভার একটা পেলায় আধুনিক শহর, ওখানে ভ্যাম্পায়ার থাকতেই পারে না ; তাতে লালমোহনবাবু বললেন হর্নিম্যানের জিওগ্রাফির বই তন্নতন্ন করে যেটে ঠাঁর মনে হয়েছে ওটাই বেস্ট নাম। ফেলুদা কোডাময় একটা তদন্ত করে এসেছে গত সেপ্টেম্বরে, মক্কেল সর্বেশ্বর সহায়ের একটা বাড়ি আছে হাজারিবাগে, সেটা প্রায়ই খালি পড়ে থাকে, তাই ফেলুদার কাজে খুশি হয়ে ভদ্রলোক তাঁর বাড়িটা অফার করেছেন দিন দশেকের জন্য। চৌকিদার আছে, সে-ই দেখাশুনা করে, আর তার বৌ রান্না করে। খাওয়ার খরচ ছাড়া আর কোনো খরচ লাগবে না আমাদের।

লালমোহনবাবুর নতুন অ্যাম্বাসাডরেই যাওয়া ঠিক হল ; বললেন, 'লঙ রানে গাড়িটা কীরকম সার্ভিস দেয় সেটা দেখা দরকার।' গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে আসানসোল-ধানবাদ হয়ে আসা যেত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খড়গপুর-রাঁচি হয়ে আসাই ঠিক হল। খড়গপুর পর্যন্ত ফেলুদা চালিয়েছে, তারপর থেকে ড্রাইভারই চালাচ্ছে। গতকাল সকাল আটটায় রওনা হয়ে খড়গপুরে লাঞ্চ সেরে সন্ধ্যায় রাঁচি পৌঁছই। সেখানে অ্যাম্বার হোটেলে থেকে আজ সকাল নটায় হাজারিবাগ রওনা দিই। পঞ্চাশ মাইল রাস্তা, খালি পেলে সোয়া ঘন্টায় পৌঁছে যাওয়া যায়, কিন্তু এই লরির জ্বালায় সেটা নির্ঘাত দেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে।

আরো মিনিট পাঁচেক হর্ন দেবার পর লরিটা পাশ দিল, আর আমরাও সামনে খোলা পেয়ে হাঁপ ছাড়লাম। দু'পাশে বাবলা গাছের সারি, তার অনেকগুলোতেই বাবুইয়ের বাসা, দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পথের ধারেও টিলা পড়ছে। লালমোহনবাবু বই বন্ধ করে দৃশ্য দেখে আহা-বাহা করছেন আর মাঝে মাঝে বেমানান রবীন্দ্র-সঙ্গীত গুনগুন করছেন, যেমন অপ্রান মাসে ফাগুনের নবীন আনন্দে। ঠাঁর চেহারা গান মানায় না, গলার কথা ছেড়েই দিলাম। মুশকিল হচ্ছে, উনি বলেন কলকাতার ডামাডোল থেকে বেরিয়ে নেচারের কনট্যাক্টে এলেই নাকি ঠাঁর গান আসে, যদিও স্টক কম বলে সব সময়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট গান মনে আসে না।

তবে এটা বলতেই হবে যে ঠাঁর দৌলতে এই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সার্কাস সম্বন্ধে অনেক তথ্য জেনে ফেলেছি। কে জানত আজ থেকে একশো বছর আগে বাঙালীর সার্কাস ভারতবর্ষে এত নাম কিনেছিল? সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল প্রোফেসর বোসের গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস। এই সার্কাসে নাকি বাঙালী মেয়েরাও খেলা দেখাত, এমনকি বাঘের খেলাও। আর সেই সঙ্গে রাশিয়ান, আমেরিকান, জার্মান আর ফরাসী খেলোয়াড়ও ছিল। গাস্ বার্নস বলে একজন আমেরিকানকে রেখেছিলেন প্রোফেসর প্রিয়নাথ বোস বাঘ-সিংহ ট্রেন করার জন্য। ১৯২০-এ

প্রিয়নাথ বোস মারা যান। আর তার পর থেকেই বাঙালী সার্কাসের দিন ফুরিয়ে আসে।

'এই গ্রেট ম্যাজেস্টিক কোন দেশী সার্কাস মশাই?' জিগ্যেস করলেন লালমোহনবাবু।

'দক্ষিণ ভারতীয়ই হবে', বলল ফেলুদা, 'সার্কাসটা আজকাল ওদের একচেটে হয়ে গেছে।'

'ভালো ট্র্যাপীজ আছে কিনা সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন। ছেলেবেলায় হার্মস্টোন আর কার্লেকার সার্কাসে যা ট্র্যাপীজ দেখিচি তা ভোলবার নয়।'

লালমোহনবাবুর গল্পে নাকি ট্র্যাপীজের একটা বড় ভূমিকা থাকবে। শূন্যে সব লোমহর্ষক খেলার মাঝখানে একজন ট্র্যাপীজের খেলোয়াড় বুলন্ত অবস্থায় আরেকজনকে বিষাক্ত ইনজেকশন দিয়ে খুন করবে। রহস্যের সমাধান করতে হিরো প্রথর রুদ্রকে নাকি ট্র্যাপীজের খেলা শিখতে হবে। ফেলুদা শুনে বলল, 'যাক, একটা জিনিস তাহলে আপনার হিরোর এখনো শিখতে বাকি।'

৭২ কিলোমিটারের পোস্টটা পেরিয়ে কিছুদূর গিয়েই আরেকটা অ্যাম্বাসাডর দেখা গেল। সেটা রাস্তার এক ধারে বনেট খোলা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, আর তার পাশেই দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক হাত তুলে যে ভঙ্গিটা করছেন সেটা রেলের স্টেশনে খুব দেখা যায়। সেখানে সেটা গুড-বাই, আর এখানে হয়ে গেছে থামতে বলার সংকেত। হরিপদবাবু ব্রেক কষলেন।

'ইয়ে, আপনারা হাজারিবাগ যাচ্ছেন কি?'

ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। গায়ের রং ফরসা, চোখে চশমা, পরনে খয়েরি প্যান্টের উপর সাদা সার্ট আর সবুজ হাত-কাটা পুলোভার। সঙ্গে ড্রাইভার আছে, যার শরীরের উপরের অর্ধেকটা এখন বনেটের নিচে।

প্রশ্নের উত্তরে ফেলুদা 'আজ্ঞে হ্যাঁ' বলায় ভদ্রলোক বললেন, 'আমার গাড়িটা গণ্ডগোল করছে, বুঝেছেন। বোধহয় সিরিয়াস। তাই ভাবছিলাম...'

'আপনি আমাদের সঙ্গে আসতে চাইলে আসতে পারেন।'

'সো কাইন্ড অফ ইউ!'—ভদ্রলোক বোধহয় ভাবতে পারেননি যে না চাইতেই ফেলুদা অফারটা করবে।—'আমি ওখান থেকে একটা মেকানিক নিয়ে ট্যাক্সি করে চলে আসব। তাছাড়া তো আর কোনো ইয়ে দেখছি না।'

'আপনার সঙ্গে লাগেজ কী?'

'একটা সুটকেস, তবে সেটা অবিশ্যি পরে নিয়ে যেতে পারি। এখান থেকে যেতে আসতে তিন কোয়ার্টারের বেশি লাগবে না।'

'চলে আসুন।'

ভদ্রলোক ড্রাইভারকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে আমাদের গাড়িতে উঠে আরো

দ'বার বললেন সো কাইন্ড অফ ইউ । তারপর বাকি পথটা আমরা কিছু না জিগ্যেস করতেই নিজের বিষয়ে একগাদা বলে গেলেন । ওঁর নাম প্রীতীন্দ্র চৌধুরী । বাপ বছর দশেক হল রিটারার করে হাজারিবাগে বাড়ি করে আছেন, আগে রাঁচিতে অ্যাডভোকেট ছিলেন, নাম মহেশ চৌধুরী । এ অঞ্চলের নামকরা লোক ।

'আপনি কলকাতাতেই থাকেন ?' জিগ্যেস করল ফেলুদা ।

'হ্যাঁ । আমি আছি ইলেকট্রনিকসে । ইন্ডোভিশনের নাম শুনেছেন ?'

ইন্ডোভিশন নামে একটা নতুন টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন কিছুদিন থেকে কাগজে দেখছি, সেটা নাকি এঁদেরই তৈরি ।

'আমার বাবার সন্তর পূর্ণ হচ্ছে কাল', বললেন ভদ্রলোক, 'বড়দা আমার স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে দিন তিনেক হল পৌঁছে গেছেন । আমার আবার দিল্লিতে একটা কাজ পড়ে গেসল, আসা মুশকিল হচ্ছিল, কিন্তু বাবা টেলিগ্রাম করলেন মাস্ট্র কাম বলে ।—একটু থামবেন গাড়িটা কাইন্ডলি ?'

গাড়ি থামল ; কেন তা বুঝতে পারছি না । ভদ্রলোক তাঁর হাতের ব্যাগটা থেকে একটা ছোট্ট ক্যাসেট রেকর্ডার বার করে গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার পাশেই একটা শালবনে ঢুকে মিনিট খানেকের মধ্যেই ফিরে এসে বললেন, 'একটা ফ্লাইক্যাচার ডাকছিল ; লাকিলি পেয়ে গেলাম । পাখির ডাক রেকর্ড করাটা আমার একটা নেশা । সো কাইন্ড অফ ইউ ।'

ধন্যবাদটা অবিশ্যি তাঁর অনুরোধে গাড়ি থামানোর জন্য ।

আশ্চর্য, ভদ্রলোক নিজের সম্বন্ধে এত বলে গেলেও, আমাদের কোনো পরিচয় জানতে চাইলেন না । ফেলুদা অবিশ্যি বলে যে একেকজন লোক থাকে যারা অন্যের পরিচয় নেওয়ার চেয়ে নিজের পরিচয় দিতে অনেক বেশি ব্যগ্র ।

হাজারিবাগ টাউনে পৌঁছে ইউরেকা অটোমোবিলস-এ প্রীতীন্দ্রবাবুকে নামিয়ে দেবার পর আরেকবার সো কাইন্ড অফ ইউ বলে ভদ্রলোক হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, 'ভালো কথা, আপনারা উঠছেন কোথায় ?'

জবাবটা দিতে ফেলুদার গলা তুলতে হল, কারণ গাড়ির কাছেই কেন জানি লোকের ভিড় জমেছে, আর সবাই বেশ উত্তেজিতভাবে কথা বলছে । কী বিষয়ে কথা হচ্ছে সেটা অবিশ্যি পরে জেনেছিলাম ।

ফেলুদা বলল, 'সঠিক নির্দেশ দিতে পারব না, কারণ আমরা এই প্রথম আসছি এখানে । এটা বলতে পারি যে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড রেস্ট হাউস আর কর্নেল মোহান্তির বাড়ির খুব কাছে ।'

'ও, তার মানে আমাদের বাড়ি থেকে মিনিট সাতেকের হাঁটা পথ ।—টেলিফোন আছে ?'

'সেভেন ফোর টু ।'

'বেশ, বেশ ।'

'আর আমার নাম মিত্র । পি সি মিত্র ।'

'দেখেছেন, নামটাই জানা হয়নি ।'

ভদ্রলোককে ছেড়ে দিয়ে রওনা হবার পর ফেলুদা বলল, 'নতুন মাল বাজারে ছাড়ছে বলে বোধহয় টেন্স হয়ে আছে ।'

'বাতিকগ্রস্ত,' বললেন লালমোহনবাবু ।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড রেস্ট হাউসের কথা জিগ্যেস করে আমাদের বাড়ির রাস্তা খুঁজে বার করতে কোনো অসুবিধা হল না । কর্নেল জি সি মোহান্তির নাম লেখা মার্বেল ফলকওয়ালা গেট ছাড়িয়ে তিনটে বাড়ি পরেই এস সহায় লেখা বুগেনভিলিয়ায় ঢাকা গেটের বাইরে এসে হর্ন দিতেই একজন বেঁটে মাঝবয়সী লোক এসে গেটটা খুলে দিয়ে সেলাম ঠুকল । মোরাম ঢাকা পথে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একতলা বাংলা টাইপের বাড়ির সামনে আমাদের গাড়ি থামল । মাঝবয়সী লোকটাও দৌড়ে এসেছে পিছন পিছন, জিগ্যেস করে জানলাম সে-ই চৌকিদার, নাম বুলাকিপ্রসাদ ।

গাড়ি থেকে নেমে বুঝলাম জায়গাটা কী নির্জন । বাংলাটা ঘিরে বেশ বড় কম্পাউন্ড (লালমোহনবাবু বললেন অ্যাট লীস্ট তিন বিঘে), একদিকে বাগানে তিন চার রকম ফুল ফুটে আছে, অন্য দিকে অনেকগুলো বড় বড় গাছ, তার মধ্যে তেঁতুল, আম আর অর্জুন চিনতে পারলাম । কম্পাউন্ডের পাঁচিলের উপর দিয়ে উত্তর দিকে একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে, সেটাই নাকি কানারি হিল, এখান থেকে মাইল দুয়েক ।

বাড়িটা তিনজনের পক্ষে একেবারে ফরমাশ দিয়ে তৈরি । সামনে তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে চওড়া বারান্দার পর পাশাপাশি তিনটে ঘর । মাঝেরটা বেঠকখানা, আর দু'দিকে দুটো শোবার ঘর । পিছন দিকে আছে খাবার ঘর, রান্নাঘর ইত্যাদি । সানসেট দেখা যাবে বলে লালমোহনবাবু পশ্চিমের বেডরুমটা নিলেন ।

সুটকেস থেকে জিনিস বার করে বাইরে রাখছি, এমন সময় বুলাকিপ্রসাদ আমার ঘরে চা নিয়ে এসে ট্রেটা টেবিলের উপর রেখে যে কথাটা বলল, তাতে আমাদের দু'জনেরই কাজ বন্ধ করে ওর দিকে চাইতে হল । লালমোহনবাবু সবে ঘরে ঢুকেছেন, তিনিও দরজার মুখটাতেই দাঁড়িয়ে গেলেন ।

'আপলোগ যব বাহার যাঁয়ে,' বলল বুলাকিপ্রসাদ 'পয়দল যানেসে যারা সমহালকে যানা ।'

'চোর ডাকাতের কথা বলছে নাকি মশাই ?' বললেন লালমোহনবাবু ।

'নেহী, বাবু ; বাঘ ভাগ গিয়া মজিস্টি সর্কস সে ।'

সর্বনাশ! লোকটা বলে কী!

জিগোস করতে জানা গেল আজই সকালে নাকি একটা তাগড়াই বাঘ সার্কাসের খাঁচা থেকে পালিয়েছে। কী করে পালিয়েছে সেটা বুলাকিপ্ৰসাদ জানে না, কিন্তু সেই বাঘের ভয়ে সারা হাজারিবাগ শহর তটস্থ। বাঘের খেলাই নাকি এই সার্কাসের যাকে বলে স্টার অ্যাট্রাকশন। সার্কাসের বিজ্ঞাপনও যা দেখেছি, তাতে বাঘের ছবিটাই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। ফেলুদার অবিশ্যি চোখই আলাদা, তাই সে আমাদের চেয়ে বেশি দেখেছে। বলল, বাঘের খেলা যিনি দেখান তিনি নাকি মারাঠী, নাম কারাভিকার, আর নামটা নাকি বিজ্ঞাপনে দেওয়া ছিল।

লালমোহনবাবু খবরটা শুনে কিছুক্ষণ চূপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন তাঁর গল্লে বাঘ পালানোর ঘটনা একটা রাখা যায় কিনা সেটা তিনি ভাবছিলেন, কাজেই এটাকে টেলিপ্যাথি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।—‘তবে আপনি মশাই একেবারে ইনকস্টিটে হয়ে থাকুন, গোয়েন্দা জানলে আপনাকে নিষাৎ ওই বাঘ সন্ধানের কাজে লাগিয়ে দেবে।’

ইনকস্টিটে অবিশ্যি ইনকগনিটোর জটায়ু সংস্করণ। লালমোহনবাবু মাঝে মাঝে ইংরিজি কথায় এরকম ওলট পালট করে ফেলেন। খবরটা শুনে এত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে তাঁকে আর শুধরে দেওয়া হল না। ফেলুদা অবিশ্যি অকারণে কখনই ওর পেশাটা প্রকাশ করে না। আর গোয়েন্দা বলেই যে ওকে যে কেউ যে কোনো তদন্তে ফাঁসিয়ে দেবে সেটারও কোনো সম্ভাবনা নেই।

বুলাকিপ্ৰসাদ আরও বলল যে সার্কাসটা নাকি আগে শহরের মাঝখানে কার্জন মাঠে বসত, এইবারই নাকি প্রথম সেটা শহরের এক ধারে একটা নতুন জায়গায় বসেছে। এই মাঠটার উত্তরে নাকি বিশেষ বসতি নেই। বাঘ যদি সেদিক দিয়ে বেরোয় তাহলে রাস্তা পেরিয়ে কিছুদূর গিয়েই জঙ্গল পাবে। কাছাকাছি আদিবাসীদের গ্রাম আছে, খিদে পেলে সেখান থেকে গরু বাছুর টেনে নিয়ে যাওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়।

মোটকথা, ঘটনাটা চাঞ্চল্যকর। আপসোস এই যে হাজারিবাগের মতো জায়গায় এসে বাঘের ভয়ে স্বচ্ছন্দে হেঁটে বেড়ানো যাবে না।

চা খাওয়ার পর লালমোহনবাবু প্রস্তাব করলেন যে দুপুরে একবার গ্রেট ম্যাজেস্টিকে টু মারা হোক। ঘটনাটা ঠিক কীভাবে ঘটেছে সেটা জানতে পারলে নাকি ওঁর খুব কাজে দেবে, ‘টু মারা মানে কি টিকিট কেটে সার্কাস দেখার কথা ভাবছেন?’ ফেলুদা জিগোস করল।

‘ঠিক তা নয়,’ বললেন লালমোহনবাবু, ‘আমি ভাবছিলাম যদি খোদ মালিকের সঙ্গে দেখা করা যায়। অনেক ডিটেলস জানা যেত ওঁর কাছে।’

‘সেটা ফেলু মিণ্ডিরের সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়।’

॥ ২ ॥

দুপুরে বুলাকিপ্ৰসাদের বৌয়ের রান্না। মুরগীর কারি আর অড়হড়ের ডাল খেয়ে গাড়িতে করেই বেরিয়ে পড়লাম আমরা। বুঝতে পারলাম ফেলুদারও যথেষ্ট কৌতূহল আছে এই বাঘ পালানোর ব্যাপারে। বেরোবার আগে থানায় একটা ফোন করল। কোডার্মায় ওকে বিহার পুলিশের সঙ্গে কাজ করতে হয়েছিল, সর্বশ্বের সহায়কেও এখানে সবাই চেনে, তাই নাম করতেই ইনস্পেক্টর রাউত ফেলুদাকে চিনে ফেললেন। আসলে পুলিশের সাহায্য ছাড়া হয়ত এই জরুরী অবস্থায় সার্কাসের মালিকের সঙ্গে দেখা করা মুশকিল হত। রাউত বললেন, সার্কাসের সামনে পুলিশের লোক থাকবে, ফেলুদার কোনো অসুবিধা হবে না। ফেলুদা এটাও বলে দিল যে সে কোনোরকম তদন্ত করতে যাচ্ছে না, কেবল কৌতূহল মেটাতে যাচ্ছে।

সমস্ত শহরে যে সাড়া পড়ে গেছে সেটা গাড়িতে যেতে যেতে বেশ বুঝতে পারছিলাম। শুধু যে রাস্তার মোড়ে জটলা তা নয়, একটা চৌমাথায় দেখলাম ঢাঁড়া পিটিয়ে লোকদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে। ফেলুদা একটা পানের দোকানে চারমিনার কিনতে নেমেছিল, সেখানে দোকানদার বলল যে বাঘটাকে নাকি উত্তরে ডাহিরি বলে একটা আদিবাসী গ্রামের কাছাকাছি দেখা গেছে, তবে কোনো উৎপাতের কথা এখনো শোনা যায়নি।

সার্কাসের তাঁবু দেখলেই বুকের ভিতরটা কেমন জানি করে ওঠে, ছেলেবেলা ফেলুদার সঙ্গেই কত সার্কাস দেখেছি সে কথা মনে পড়ে যায়। গ্রেট ম্যাজেস্টিকের সাদা আর নীল ডোরাকাটা ছিমছাম তাঁবুটা দেখলেই বোঝা যায় এটা জাত সার্কাস। তাঁবুর চুড়োয় ফরফর করে হলদে ফ্ল্যাগ উড়ছে, চুড়ো থেকে বেড়া অবধি টেনে আনা দড়িতে আরো অজস্র রঙিন ফ্ল্যাগ। তাঁবুর গেটের বাইরে কমপক্ষে হাজার লোক, তারা অনেকেই টিকিট কিনতে এসেছে। বাঘ পালানোয় সার্কাস বন্ধ হয়নি, শুধু আপাতত বাঘের খেলাটাই স্থগিত। আরো কতরকম খেলা যে সে সার্কাসে দেখানো হয় সেটা হাতে আঁকা প্রকাণ্ড বড় বড় বিজ্ঞাপনে বোঝানো হয়েছে। শিল্পী খুব পাকা নন, তবে লোকের মনে চনমনে ভাব আনতে এই যথেষ্ট।

পুলিশের লোক গেটের বাইরেই ছিল। ফেলুদা কার্ডটা দিতেই খুব খাতির করে

ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। বলল, মালিক মিঃ কুট্টিকেও বলা আছে, তিনি তাঁর ঘরে অপেক্ষা করছেন।

তীবুটাকে ঘিরে বেশ খানিকটা জায়গা ছেড়ে তারপর টিনের বেড়া। এই বেড়ার মধ্যেই একধারে দাঁড়িয়ে আছে দ্য গ্রেট ম্যাজেস্টিক সার্কাসের মালিক মিঃ কুট্টির ক্যারাম্যান। বলা যায় একটা সুদৃশ্য চলন্ত বাড়ি। দু'পাশের সার বাঁধা কাঁচের জানালায় নকশা করা পর্দার ফাঁক দিয়ে টুকরো টুকরো রোদ ঢুকেছে ভিতরে আবছা অন্ধকারে। মিঃ কুট্টি চেয়ার ছেড়ে উঠে আমাদের তিনজনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বসবার জন্য মিনি-সোফা দোঁখিয়ে দিলেন। ভদ্রলোকের গায়ের রং মাজা, বয়স পঞ্চাশের বেশি না হলেও মাথার চুল ধপধপে সাদা, হাসলে বোঝা যায় দাঁতও চুলের সঙ্গে মানানসই, যদিও ফলস টীথ নয়।

ফেলুদা প্রথমেই বলে নিল যে ও পুলিশের লোক নয়, সার্কাস ওর খুব প্রিয় জিনিস, গ্রেট ম্যাজেস্টিকের খ্যাতির কথা ও জানে, হাজারিবাগে এসে সার্কাস দেখার ইচ্ছে ছিল, আপসোস এই যে একটা দুর্ঘটনার জন্য আসল খেলাটাই দেখা হবে না। সেই সঙ্গে লালমোহনবাবুরও পরিচয় করিয়ে দিল একজন বিশিষ্ট লেখক বলে। —‘সার্কাস নিয়ে একটা গল্প লেখার কথা ভাবছেন মিঃ গাঙ্গুলী।’

মিঃ কুট্টি বললেন, সার্কাসে আসার আগে ছ'বছর উনি কলকাতায় একটা জাহাজ কোম্পানিতে ছিলেন, বাঙালীদের ভালোবাসেন, কারণ বাঙালীরাই নাকি সার্কাসের সত্যিকার কদর করে। আমরা সার্কাস দেখায় নিরুৎসাহ বোধ করছি জেনে বললেন যে বাঘের খেলা ছাড়াও অনেক কিছু দেখার আছে গ্রেট ম্যাজেস্টিকে। —‘কাল আমাদের স্পেশাল শো ছিল, হাজারিবাগের অনেক নামকরা লোককে আমরা ইনভাইট করেছিলাম। আপনাদেরও ইনভাইট করছি।’

‘ব্যাপারটা হল কীভাবে?’ লালমোহনবাবু হিন্দি আর ইংরিজি মিশিয়ে জিগ্যেস করলেন। (আসলে জিগ্যেস করেছিলেন—‘শের তো ভাগা, বাট হাউ?’)

‘ভেরি আনফরচুনেট, মিঃ গ্যাংগুলী,’ বললেন মিঃ কুট্টি। ‘বাঘের খাঁচার দরজাটা ঠিকভাবে বন্ধ করা হয়নি। বাঘ নিজেই সেটাকে মাথা দিয়ে ঠেলে তুলে পালিয়েছে। তার উপর আরেকটা গলতি হয়েছে এই যে টিনের বেড়ার একটা অংশ কে জানি ফাঁক করে বাইরে যাবে বলে শর্টকাট করেছিল তারপর আর বন্ধ করেনি। কে দোষী সেটা আমরা বার করেছি, আর তার জন্য প্রপার স্টেপস নিচ্ছি।’

ফেলুদা বলল, ‘বন্ধেতে একবার ঠিক এইভাবে বাঘ পালিয়েছিল না?’

‘হ্যাঁ, ন্যাশনাল সার্কাস। শহরের রাস্তায় বেরিয়ে গিয়েছিল বাঘ। কিন্তু বেশি দূর যাবার আগেই রিং-মাস্টার তাকে ধরে নিয়েছিল।’

এখনকার বাঘ পালানোর ব্যাপারে আরো খবর জানলাম কুট্টির কাছে। কম করে জনা পঞ্চাশেক লোক নাকি বাঘটাকে তাঁবুর বাইরে দেখেছে। এক পেট্রোল স্টেশনের মালিকের বাড়ির উঠোনে নাকি বাঘটা ঢুকেছিল। ভদ্রলোকের স্ত্রী সেটাকে দেখতে পেয়ে ভিরমি যান। এক নেপালী-ভদ্রলোক স্কুটারে যাচ্ছিলেন, তিনি বাঘটাকে রাস্তা পেরোতে দেখে সোজা ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা মেরে পায়ের তিনটে হাড় ভেঙে এখন হাসপাতালে আছেন।

‘আচ্ছা, আপনাদের তো রিং-মাস্টার আছে নিশ্চয়ই?’

রিং-মাস্টার কথাটা নতুন শিখে সেটা ব্যবহার করার লোভ সামলাতে পারলেন না জটায়ু।

‘কে, কারাগুণ্ডিকার? তার শরীর কিছুদিন থেকে এমনিতেই খারাপ যাচ্ছে। বয়স হয়েছে নিয়ারলি ফর্টি। ঘাড়ে একটা ব্যথা হয় মাঝে মাঝে, তাই নিয়েই খেলা দেখায়। আমার কথা শুনবে না, ডাক্তারও দেখাবে না। মাস খানেক হল তাই আমি আরেকজন লোক রেখেছি। নাম চন্দ্রন। কেবলের লোক। ভেরি গুড। সেও বাঘ ট্রেন করে, কারাগুণ্ডিকার অসুস্থ হলে সে-ই খেলা দেখায়।’

‘কাল স্পেশ্যাল শো-তে কে দেখিয়েছিল?’ ফেলুদা জিগ্যেস করল।

‘কাল কারাগুণ্ডিকারই দেখিয়েছিল। একটা খেলা ও ছাড়া আর কেউ দেখাতে পারে না। খেলার ক্লাইম্যাক্সে দু'হাতে বাঘের মুখ ফাঁক করে তার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দেয়। দুঃখের বিষয়, কাল একটা বিশ্রী গুণ্ডোগল হয়ে যায়। দু'বার চেষ্টা করেও যখন বাঘ মুখ খুলল না, তখন কারাগুণ্ডিকার হঠাৎ চেষ্টা থামিয়ে দিয়ে খেলা শেষ করে দেয়। ফলে হাততালির সঙ্গে তাকে কিছু টিটকিরিও শুনতে হয়েছিল।’

‘আপনি তাতে কোনো স্টেপ নেননি?’

‘নিরেছি বৈকি। পুরনো লোক, কিন্তু তাও কথা শোনাতে হল। ও সতেরো বছর কাজ করছে সার্কাসে। প্রথম তিন বছর গোল্ডেনে ছিল, বাকি সময়টা এখানে। ওর যা নাম তা আমার সার্কাসে খেলা দেখিয়েই। এখন বলছে কাজ ছেড়ে দেবে। খুবই দুঃখের কথা, কারণ অন্তত আরো বছর তিনেক ও কাজ করতে পারত বলে আমার বিশ্বাস।’

‘বাঘ খুঁজতে সার্কাসের লোক যায়নি?’

‘কারাগুণ্ডিকারেরই যাবার কথা ছিল, কিন্তু ও রাজি হয়নি। তাই চন্দ্রনকে যেতে হয়েছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকের সঙ্গে।’

লালমোহনবাবুর সাহস বেড়ে গেছে। বললেন, ‘কারাগুণ্ডিকারের সঙ্গে দেখা করা যায়?’

‘কোনো গ্যারান্টি দিতে পারি না,’ বললেন মিঃ কুট্টি, ‘খুব মুড়ি লোক। মুরুগেশের সঙ্গে যান আপনারা, গিয়ে দেখুন সে দেখা করে কিনা।’

মুকুগেশ হল মিঃ কুট্রির পার্সোনাল বেয়ারা। সে বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল, মনিবের হুকুমে আমাদের তিনজনকে নিয়ে গেল রিং-মাস্টারের তাঁবুতে।

তাঁবুর ভিতরে দুটো ভাগ ; একটা বসার জায়গা, আরেকটা শোবার। আশ্চর্য এই যে খবর দিতেই বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলেন রিং-মাস্টার। ভদ্রলোকের চেহারা দেখে বলে দিতে হয় না যে উনি একজন অত্যন্ত শক্তিশালী পুরুষ, বাঘের খেলা দেখানোর পক্ষে এর চেয়ে উপযুক্ত চেহারা আর হয় না। লম্বায় ফেলুদার সমান, চওড়ায় ওর দেড়া। ফর্সা রঙে কুচকুচে কালো চাড়া-দেওয়া গৌফটা আশ্চর্য খুলেছে, চোখের দৃষ্টি এখন উদাস হলেও হঠাৎ হঠাৎ এক একটা কথা বলতে জ্বলে ওঠে। ভদ্রলোক জানিয়ে দিলেন যে তিনি মারাঠী মালয়ালম তামিল আর ভাঙা ভাঙা ইংরিজি আর হিন্দি জানেন। শেষের দুটো ভাষাতেই কথা হল।

কারাণ্ডিকার প্রথমেই জানতে চাইলেন আমরা কোনো খবরের কাগজ থেকে আসছি কিনা। বুঝলাম ভদ্রলোক লালমোহনবাবুর হাতে খাতা পেনসিল দেখেই প্রশ্নটা করেছেন। ফেলুদা প্রশ্নের জবাবটা যেন বেশ হিসেব করে দিল।

‘যদি তাই হয়, তাহলে আপনার কোনো আপত্তি আছে?’

‘আপত্তি তো নেইই, বরং সেটা হলে খুশিই হব। এটা পাবলিকের জানা দরকার যে বাঘ পালানোর জন্য ট্রেনার কারাণ্ডিকার দায়ী নয়, দায়ী সার্কাসের মালিক। বাঘ দু’জন ট্রেনারকে মানে না, একজনকেই মানে। অন্য ট্রেনার আসার পর থেকেই সুলতানের মেজাজ খারাপ হতে শুরু করেছিল। আমি সেটা মিঃ কুট্রিকে বলেছিলাম, উনি গা করেননি। এখন তার ফল ভোগ করছেন।’

‘আপনি বাঘটাকে ঝুঁজতে গেলেন না যে?’ ফেলুদা জিগ্যেস করল।

‘ওরাই ঝুঁজুক না,’ গভীর অভিমানের সঙ্গে বললেন কারাণ্ডিকার।

লালমোহনবাবু বিড়বিড় করে ফেলুদাকে বাংলায় বললেন, ‘একটু জিগ্যেস করুন তো তেমন তেমন দরকার পড়লে উনি যাবেন কিনা। খবরটা পেলে বাঘ ধরা দেখা যেত। অবিশ্যি একা নয়, ইন ইওর কম্প্যানি। খুব থ্রিলিং ব্যাপার হবে নিশ্চয়ই।’

ফেলুদা জিগ্যেস করাতে কারাণ্ডিকার বললেন যে বাঘকে গুলি করে মারার প্রস্তাব উঠলে তাঁকে যেতেই হবে বাধা দিতে, কারণ সুলতান ওঁর আত্মীয়ের বাড়ী।

আমিও একটা জিনিস জিগ্যেস করার কথা ভাবছিলাম, শেষ পর্যন্ত ফেলুদাই করল।

‘আপনার মুখে কি বাঘ কোনোদিন আঁচড় মেরেছিল?’

‘নট সুলতান,’ বললেন কারাণ্ডিকার। ‘গোল্ডেন সার্কাসের বাঘ। গাল আর নাকের খানিকটা মাংস তুলে নিয়েছিল।’

কথাটা বলে কারাণ্ডিকার তাঁর সার্ট খুলে ফেললেন। দেখলাম বুকে পিঠে কাঁধে কত যে আঁচড়ের দাগ রয়েছে তার হিসেব নেই।

আমরা ভদ্রলোককে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়লাম। তাঁবু থেকে বেরোবার সময় ফেলুদা বলল, ‘আপনি এখন এখানেই থাকবেন?’

কারাণ্ডিকার গভীর হয়ে বললেন, ‘আজ সতেরো বছর আমি সার্কাসের তাঁবুকেই ঘর বলে জেনেছি। এবার বোধহয় নতুন ডেরা দেখতে হবে।’

লালমোহনবাবু মিঃ কুট্রিকে বলে রেখেছিলেন যে তিনি ম্যাজেস্টিকের পশুশালাটা একবার দেখতে চান। মুকুগেশের সঙ্গে গিয়ে আমরা সার্কাসের অবশিষ্ট দুটি বাঘ, একটা বেশ বড় ভাল্লুক, একটা জলহস্তী, তিনটে হাতী, গোটা ছয়েক ঘোড়া আর সুলতানের গা হুমহুম করা খালি খাঁচাটা দেখে বাড়ি ফিরতে ফিরতে হয়ে গেল পাঁচটা। বুলাকিপ্ৰসাদকে চা দেবার জন্য ডেকে পাঠাতে সে বলল, চৌধুরী সাহেবের বাড়ি থেকে একজন বাবু এসেছিলেন, বলে গেছেন আবার আসবেন।

সাড়ে ছটায় এলেন প্রীতীন্দ্র চৌধুরী। ইতিমধ্যে সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে ঝপ করে ঠাণ্ডা পড়েছে, আমরা সবাই কোট পুলোভার চাপিয়ে নিয়েছি, লালমোহনবাবুর মাফিক্যাপটা পরার মতো ঠাণ্ডা এখনো পড়েনি, কিন্তু ওঁর টাক বলে উনি রিস্ক না নিয়ে এর মধ্যেই ওটা চাপিয়ে বসে আছেন।

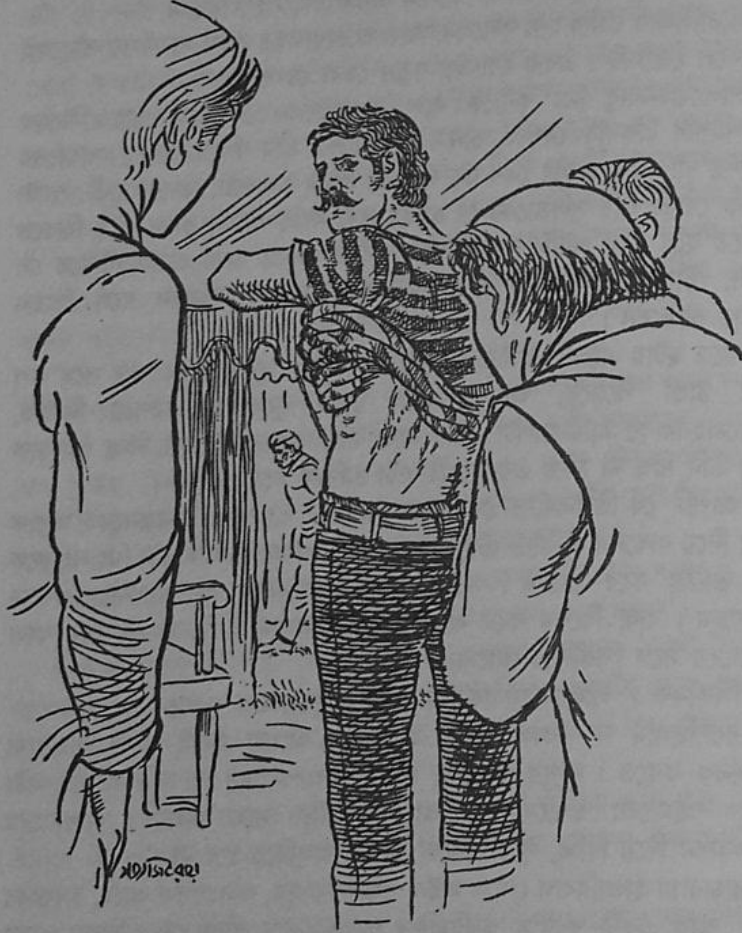
‘আপনি যে ডিটেকটিভ সেটা তো বলেননি!’ আমাদের তিনজনকেই অবাক করে দিয়ে বললেন প্রীতীন্দ্র চৌধুরী।—‘বাবা তো আপনার মক্কেল মিঃ সহায়কে খুব ভালো করে চেনেন। সহায় ওঁকে জানিয়েছেন যে আপনারা এখানে আসছেন। বাবা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন আপনারা তিনজনেই যেন কাল আমাদের সঙ্গে পিকনিকে আসেন।’

‘পিকনিক?’ লালমোহনবাবু ভুরু কপালে তুলে প্রশ্ন করলেন।

‘বলেছিলাম না—কাল বাবার জন্মদিন। আমরা সবাই যাচ্ছি রাজরাণী পিকনিক করতে। দুপুরে ওখানেই খাওয়া। আপনারা তো গাড়ি রয়েছে, নটা নাগাদ আমাদের ওখানে চলে আসুন। বাড়ির নাম কৈলাস। আপনারা ডিরেকশন দিয়ে দিচ্ছি, ঝুঁজে পেতে কোনো অসুবিধে হবে না।’

রাজরাণী হাজারিবাগ থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূর, জলপ্রপাত আছে, চমৎকার দৃশ্য, আর একটা পুরানো কালীমন্দির আছে—নাম ছিন্নমস্তার মন্দির। এসব আমরা আসবার আগেই জেনে এসেছি, আর পিকনিকের নেমস্তন্ন না হলে নিজেরাই যেতাম।

প্রীতীনবাবু আরো বললেন যে আমরা যদি একটু আগে আগে যাই, তাহলে মহেশবাবুর প্রজাপতি আর পাথরের কালেকশনটাও দেখা হয়ে যেতে পারে।



‘কিন্তু পিকনিকে যে যাচ্ছেন আপনারা, বাঘ পালানোর খবরটা জানেন কি ? ধরা গলায় প্রশ্ন করলেন জটায়ু ।

‘জানি বৈকি !’ হেসে বললেন প্রীতীনবাবু, ‘কিন্তু তার জন্য ভয় কী ? সঙ্গে বন্দুক থাকবে । আমার বড়দা ক্র্যাক শট । তাছাড়া বাঘতো শুনেছি উত্তরে হানা দিচ্ছে, রাজরাপ্তা তো দক্ষিণে, রামগড়ের দিকে । কোনো ভয় নেই ।’

ঠিক হল আমরা সাড়ে আটটা নাগাদ মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে পৌঁছে যাব । লালমোহনবাবু ‘কৈলাস নাম দিল কেন, মশাই’-এর উত্তরে ফেলুদা বলল, শিবের বাসস্থান কৈলাস, আর মহেশ শিবের নাম, তাই কৈলাস ।

প্রীতীনবাবু চলে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুরঘুটি অন্ধকার হয়ে এল । আমরা বারান্দায় বেতের চেয়ারে এসে বাতিটা জ্বাললাম না, যাতে চাঁদের আলো উপভোগ করা যায় । ছিন্নমস্তার মন্দিরের কথাটা লালমোহনবাবু জানতেন না, তাই বোধহয় মাঝে মাঝে নামটা বিড়বিড় করছিলেন । সাতবারের বার ছিন্ বলেই থেমে যেতে হল, কারণ ফেলুদা হাত তুলেছে ।

আমরা তিনজনেই চুপ, ঝিমি পোকাকার ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই, এমন সময় শোনা গেল—বেশ দূর থেকে, তাও গায়ের রক্ত জল করা—বাঘের গর্জন । একবার, দুবার, তিনবার ।

সুলতান ডাকছে ।

কোনদিক থেকে, কতদূর থেকে, সেটা বুঝতে হলে শিকারীর কান চাই ।

॥ ৩ ॥

আমি ভেবেছিলাম যে সার্কাসের বাঘ পালানোটাই বুঝি হাজারিবাগের আসল ঘটনা হবে ; কিন্তু তা ছাড়াও যে আরো কিছু ঘটবে, আর ফেলুদা যে সেই ঘটনার জালে জড়িয়ে পড়বে, সেটা কে জানত ? ২৩শে নভেম্বর মহেশ চৌধুরীর বার্থডে পিকনিকের কথাটা অনেকদিন মনে থাকবে, আর সেই সঙ্গে মনে থাকবে রাজরাপ্তার আশ্চর্য সুন্দর রক্ষ পরিবেশে ছিন্নমস্তার মন্দির ।

কাল রাত্রে বাঘের ডাক শোনার পর থেকেই লালমোহনবাবুর মুখটা জানি কেমন হয়ে গিয়েছিল, ভাবছিলাম বলি উনি আমাদের ঘরে আমার সঙ্গে শোন, আর ফেলুদা পশ্চিমের ঘরটা নিক, কিন্তু সেদিকে আবার ভদ্রলোকের গৌ আছে । চৌকিদারের কাছে টাঙি আছে জেনে, আর লোকটা বেঁটে হলেও সাহসী জেনে ভদ্রলোক খানিকটা আশ্বাস পেয়ে নিজের তিন সেলের টর্চের বদলে আমাদের পাঁচ সেলটা নিয়ে দশটা নাগাদ নিজের ঘরে চলে গেলেন । বড় টর্চ নেওয়ার কারণ এই যে, ফেলুদা বলেছে তীর আলো চোখে ফেললে বাঘ নাকি অনেক সময় আপনা

থেকেই সরে পড়ে।—‘অবিশ্যি জানালার বাইরে যদি গর্জন শোনেন, তখন টর্চ জ্বালানোর কথা, আর সেই টর্চ জানালার বাইরে বাঘের চোখে ফেলার কথা, মনে থাকবে কিনা সেটা জানি না।’

যাই হোক, রাত্রে বাঘ এসে থাকলেও সে গর্জন করেনি, তাই টর্চ ফেলারও কোনো দরকার হয়নি।

আমরা প্রীতীনবাবুর নির্দেশ অনুযায়ী ঠিক সাড়ে আটটার সময় কৈলাসের লাল ফটকের সামনে গিয়ে হাজির হলাম। বাইরে থেকে বাড়িটা দেখে লালমোহনবাবু মন্তব্য করলেন যে বোঝাই যাচ্ছে এ শিব হল সাহেব শিব। সত্যিই, বছর দশেক আগে তৈরি হলেও বাড়ির চেহারাটা সেই পঞ্চাশ বছর আগের ব্রিটিশ আমলের বাড়ির মতো।

দারোয়ান গেট খুলে দিতে আমরা গাড়িটা বাইরে রেখে কাঁকর বিছানো রাস্তা দিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। আরো তিনটে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কম্পাউন্ডের এক পাশে: একটা কালকের দেখা প্রীতীনবাবুর কালো অ্যামবাসাডর, একটা সাদা ফিয়াট, আর একটা পুরানো হলদে পনটিয়াক।

‘একটা ক্লু পাওয়া গেছে মশাই।’

লালমোহনবাবু বাগান আর রাস্তার মাঝখানে সাদা রং করা ইটের বেড়ার পাশ থেকে একটা কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে ফেলুদাকে দিলেন। ফেলুদা বলল, ‘আপনি রহস্যের অবর্তমানেই ক্লয়ের সন্ধান পাচ্ছেন?’

‘জিনিসটা কীরকম মিস্টিরিয়াস মনে হচ্ছে না?’

একটা রুলটানা খাতার পাতা, তাতে সবুজ কালিতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা কিছু অর্থহীন ইংরিজি কথা। মিস্তির কিছুই নেই, বোঝাই যাচ্ছে সেটা বাচ্চার হাতের লেখা, আর সেই কারণেই কথাগুলোর কোনো মানে নেই। যেমন—OKAHA, RKAHA, LOKC।

‘ওকাহা যে জাপানী নাম সেতো বোঝাই যাচ্ছে’ বললেন লালমোহনবাবু।

‘বাঙলা নামটা না চিনে আগেই জাপানী নামটা চিনে ফেললেন?’—বলে ফেলুদা কাগজটা পকেটে পুরে নিল।

একজন ভীষণ বুড়ো মুসলমান বেয়ারা দাঁড়িয়েছিল গাড়িবারান্দার নিচে, সে আমাদের সেলাম করে ‘আইয়ে’ বলে ভিতরে নিয়ে গেল। একটা চেনা গলা আগে থেকেই পাচ্ছিলাম, বৈঠকখানার চৌকাঠ পেরোতেই প্রীতীনবাবু আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

‘আসুন, আসুন—সো কাইন্ড অফ ইউ টু কাম।’

ঘরে ঢুকে প্রথমেই চোখ চলে যায় দেয়ালের দিকে। তিন দেয়াল জুড়ে ছবি

বদলে টাঙানো রয়েছে ফ্রেমে বাঁধানো মহেশ চৌধুরীর সংগ্রহ করা পিনে আঁটা সার সার ডানা মেলা প্রজাপতি। প্রতি ফ্রেমে আটটা, সব মিলিয়ে চৌষট্টি, আর তাদের রঙের বাহারে পুরো ঘরটা যেন হাসছে।

যাঁর সংগ্রহ, তিনি সোফায় বসে ছিলেন, আমাদের দেখে হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালেন। বুঝলাম এককালে ভদ্রলোক বেশ শক্ত সুপুরুষ ছিলেন। টকটকে রঙ, দাড়িগোঁফ পরিষ্কার করে কামানো, চোখে রিমলেস চশমা, পরনে ফিনফিনে ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি আর ঘন কাজ করা কাশ্মীরী শাল। বুঝলাম এটা মহেশ চৌধুরীর সন্তর বছরের জন্মদিন উপলক্ষে স্পেশাল পোশাক।

প্রীতীনবাবু শুধু ফেলুদার নামটাই জানেন, তাই বাকি দুজনের পরিচয় ফেলুদাকেই দিতে হল। ভদ্রলোক কিছু বলার আগেই লালমোহনবাবু আমাদের অবাধ করে দিয়ে বললেন, ‘হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, স্যার!’

ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন।—‘থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ!’ বুড়োমানুষের আবার জন্মদিন। এসব আমার বৌমার কাণ্ড।—যাক আপনারা এসে গিয়ে খুব ভালোই হল। হোয়ার ইজ দ্য ডেড বডি খুঁজে বার করতে অসুবিধা হয়নি তো?’

প্রশ্নটা শুনে আমার আর লালমোহনবাবুর মুখ একসঙ্গে হাঁ হয়ে গেছে। ফেলুদা কিন্তু ভুরুটা একটু তুলেই নামিয়ে নিল। ‘আজ্ঞে না, অসুবিধা হয়নি।’

‘ভেরি গুড। আমি বুঝেছিলাম আপনি যখন গোয়েন্দা তখন হয়ত আমার সাংকেতিক ভাষা বুঝতে পারবেন। তবে আপনার দুই বন্ধু মনে হচ্ছে বোরেননি।’

ফেলুদা বুঝিয়ে দিল। ‘কৈলাস হচ্ছে “কই লাশ”?’

এবারে লক্ষ করলাম ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা চিতাবাঘের ছালের উপর বসে একটি বছর পাঁচেকের মেয়ে ডান হাতে একটা চিমটির মতো জিনিস নিয়ে বাঁ হাতে ধরা একটি বিলিতি ডলের ভুরুর জায়গায় এক মনে চিমটি কাটছে। বোধহয় পুতুলের ভুরু প্লাক করা হচ্ছে। আমি ওর দিকে চেয়ে আছি বলেই বোধহয় মহেশবাবু বললেন, ‘ওটি আমার নাতনী; ওর নাম জোড়া মৌমাছি।’

‘আর তুমি জোড়া কাটারি’, বলল মেয়েটি।

‘বুঝলেনতো মিঃ মিস্তির?’

ফেলুদা বলল, ‘বুঝলাম, আপনার নাতনী হলেন বিবি, আর আপনি তার দাদু।’

লালমোহনবাবু আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছেন দেখে বুঝিয়ে দিলাম বিবি হচ্ছে Bee-Bee, আর দাদুর ‘দা’ হল কাটারি আর ‘দু’ হল দুই। ফেলুদা আর আমি অনেক সময়ই বাড়িতে বসে কথার খেলা তৈরি করে খেলি,



তাই এগুলো বুঝতে অসুবিধা হল না।

প্রীতীনবাবু 'দাদাকে ডাকি' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন; আমরা তিনজনে সোফায় বসলাম। মহেশবাবুর ঠোঁটের কোণে হাসি, তিনি একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন ফেলুদার দিকে। ফেলুদার তাতে কোনো উসখুসে ভাব নেই, সেও দিব্যি উন্টে চেয়ে আছে ভদ্রলোকের দিকে।

'ওয়েল, ওয়েল, ওয়েল', অবশেষে বললেন মহেশ চৌধুরী, 'সহায় আপনার খুব সুখ্যাতি করছিল, তাই আপনি এসেছেন শুনে তিরিকে বললুম, ভদ্রলোককে ডাক, তাকে একবার দেখি। আমার জীবনেও তো অনেক রহস্য, দেখুন যদি তার দু একটাও সমাধান করে দিতে পারেন।'

'তিরি মানে আপনার তৃতীয় পুত্র কি?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'রাইট এগেন', বললেন ভদ্রলোক। 'আমি যে কথা নিয়ে খেলতে ভালোবাসি সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।'

'ও বাতিকটা আমারও আছে।'

'সে তো খুব ভালো কথা। আমার নিজের ছেলদের মধ্যে টেকা তবু একটু আধটু বোঝে, তিরির মাথা এদিকে একেবারেই খেলে না। তা যাক্ গে—আপনি গোয়েন্দাগিরি করছেন কদিন?'

'বছর আষ্টেক।'

'আর উনি কী করেন? মিঃ গাঙ্গুলী?'

'উনি লেখেন। রহস্য উপন্যাস। জটায়ু ছদ্মনামে।'

'বাঃ! আপনাদের কম্বিনেশনটি বেশ ভালো। একজন রহস্য-প্লট পাকান, আরেকজন রহস্যের জট ছাড়ান। ভেরি গুড।'

ফেলুদা বলল, 'আপনার প্রজাপতি আর পাথরের সংগ্রহ তো দেখতেই পাচ্ছি; এ ছাড়া আরো কিছু জমিয়েছেন কি কোনোদিন?'

পাথরগুলো রাখা ছিল ঘরের একপাশে একটা বড় কাঁচের আলমারির ভিতর। এত রকম রঙের পাথর যে হয় তা আমার ধারণাই ছিল না। কিন্তু ফেলুদা হঠাৎ এ প্রশ্ন করল কেন? ভদ্রলোকও বেশ অবাক হয়ে বললেন, 'অন্য সংগ্রহের কথা হঠাৎ জিগ্যেস করলেন কেন?'

'আপনার নাতনীর হাতের চিমটেটাকে পুরানো টুইজারস বলে মনে হচ্ছে তাই—'

'ব্রিলিয়ান্ট! ব্রিলিয়ান্ট!'—ভদ্রলোক ফেলুদার কথার উপর তারিফ চাপিয়ে দিলেন।—'আপনার অদ্ভুত চোখ। আপনি ঠিক ধরেছেন, ওটা স্ট্যাম্প কালেকটরের চিমটেই বটে। ডাকটিকিট এককালে জমিয়েছি বইকি, আর বেশ যত্ন নিয়ে সিরিয়াসলি জমিয়েছি। এখনও মাঝে মাঝে গিবন্সের ক্যাটালগের

পাতা উলটেই। ওটাই আমার প্রথম হবি। যখন ওকালতি করি তখন আমার এক মক্কেল, নাম দোরাবজী, আমার উপর কৃতজ্ঞতাবশে তার একটি আস্ত পুরানো, অ্যালবাম আমাকে দিয়ে দেয়। তার নিজের অবিশ্যি শখ মিটে গিয়েছিল, কিন্তু এ জিনিস সহজে কেউ দেয় না। বেশ কিছু দুপ্রাপ্য টিকিট ছিল সেই অ্যালবামে।

আমি নিজে স্ট্যাম্প জমাই, আর ফেলুদারও এক সময় ডাকটিকিটের নেশা হয়েছিল। ও বলল, 'সে অ্যালবাম দেখা যায়?'

'আজ্ঞে?'—ভদ্রলোক যেন একটু অন্যান্যনস্ক হয়ে পড়েছিলেন—'অ্যালবাম? অ্যালবাম তো নেই ভাই। সেটা খোয়া গেছে।'

'খোয়া গেছে?'

'বলছি না—আমার জীবনে অনেক রহস্য। রহস্যও বলতে পারেন, ট্র্যাজিডিও বলতে পারেন। তবে আজকের দিনটায় সেসব আলোচনা থাক।—এসো টেকা, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

টেকা মানে বোঝাই যাচ্ছে ভদ্রলোকের বড় ছেলে। প্রীতীনবাবুর সঙ্গে এসে ঘরে ঢুকলেন। বয়সে প্রীতীনবাবুর চেয়ে বেশ কিছুটা বড়। ইনিও সুপুরুষ, যদিও মোটার দিকে, আর প্রীতীনবাবুর মতো ছটফটে নন; বেশ একটা ভারভার্তিক ভাব।

'তিরিকে মাইক সম্বন্ধে জিগ্যেস করলে আপনি ভালো জবাব পাবেন', বললেন মহেশ চৌধুরী, 'আর ইনি মাইকার কারবারি! অরুণেন্দ্র। কলকাতায় অফিস, হাজারিবাগ যাতায়াত আছে কর্মসূত্রে।'

'আর দুরি বুঝি উনি?' ফেলুদা রুপোর ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছবির দিকে দেখাল। ফ্যামিলি গ্রুপ। মহেশবাবু, তাঁর স্ত্রী, আর তিন ছেলে। অস্তুত বছর পঁচিশ আগে তোলা, কারণ বাপের দু'পাশে দাঁড়ানো দু'জন ছেলেই হাফ প্যান্ট পরা, আর তৃতীয়টি মায়ের কোলে। দাঁড়ানো ছেলে দুটির মধ্যে যে ছোট সেই নিশ্চয় মহেশবাবুর দ্বিতীয় ছেলে।

'ঠিকই বলেছেন আপনি,' বললেন মহেশবাবু, 'তবে দুরির সঙ্গে আলাপের সৌভাগ্য আপনার হবে কিনা জানি না, কারণ সে ভাগলওয়া।'

অরুণবাবু ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। 'বীরেন বিলেত চলে যায় উনিশ বছর বয়সে; তারপর আর ফেরেনি।'

'ফেরেনি কি?'—মহেশবাবুর প্রশ্নে কোথায় যেন একটা খটকার সুর।

'ফিরলে কি আর তুমি জানতে না, বাবা?'

'কী জানি!'—সেই একই সুরে বললেন মহেশ চৌধুরী। 'গত দশ বছরতোসে আমাকে চিঠিও লেখেনি।'

ঘরে কেমন একটা থমথমে ভাব এসে গেছিল বলেই বোধহয় সেটা দূর করার

জন্য মহেশবাবু হঠাৎ চাঙা হয়ে সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন।—'চলুন, আপনাদের আমার বাড়িটা একটু ঘুরিয়ে দেখাই। অখিল আর ইয়ে যখন এখনো এল না, তখন হাতে কিছুটা সময় আছে।'

'তুমি উঠছ কেন বাবা', বললেন অরুণবাবু, 'আমিই দেখিয়ে আনছি।'

'নো স্যার, আমার প্ল্যান করা আমার বাড়ি, আমিই দেখাব। আসুন, মিঃ মিস্তির।'

দোতলায় উত্তরে রাস্তার দিকে একটা চমৎকার চওড়া বারান্দা, সেখান থেকে কানারি হিল দেখা যায়। বেডরুম তিনটে, তিনটেতেই এখন লোক রয়েছে। মাকেরটায় থাকেন মহেশবাবু নিজে, এক পাশে বড় ছেলে, অন্য পাশে স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে প্রীতীনবাবু। নিচে একটা গেস্টরুম আছে, তাতে এখন রয়েছেন মহেশবাবুর বন্ধু অখিল চক্রবর্তী। অরুণবাবুর দুই সন্তানের মধ্যে বড়টি ছেলে, সে এখন বিলেতে, আর মেয়েটির সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা বলে সে মায়ের সঙ্গে কলকাতায় রয়ে গেছে।

মহেশবাবুর বেডরুমেও দেখলাম কিছু পাথর আর প্রজাপতি রয়েছে। একটা বুকশেল্ফে পাশাপাশি রাখা অনেকগুলো একরকম দেখতে বইয়ের দিকে ফেলুদার দৃষ্টি গিয়েছিল, ভদ্রলোক বললেন, ওগুলো ঠঁর ডায়রি। চল্লিশ বছর একটানা ডায়রি লিখেছেন উনি। খাটের পাশে টেবিলে একটা ছোট্ট বাঁধানো ছবি দেখে লালমোহনবাবু বলে উঠলেন, 'আরে, এ যে দেখছি মুক্তানন্দের ছবি।'

মহেশবাবু হেসে বললেন, 'আমার বন্ধু অখিল দিয়েছে ওটা।' তারপর ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'তিনটে মহাদেশের শক্তি ঐর পিছনে।'

'কারেক্ট!' বললেন লালমোহনবাবু, 'বিরাত তান্ত্রিক সাধু। ইন্ডিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা—সর্বত্র ঐর শিষ্য।'

'আপনি তো অনেক খবর রাখেন দেখছি,' বললেন মহেশ চৌধুরী, 'আপনিও ঐর শিষ্য নাকি?'

'আজ্ঞে না, তবে আমার পাড়ায় আছেন একজন।'

দোতলায় থাকতেই একটা গাড়ির শব্দ পেয়েছিলাম, নিচে এসে দেখি, যে-দুজনের কথা মহেশবাবু বলছিলেন, তাঁরা এসে গেছেন। একজন মহেশবাবুরই বয়সী, সাধারণ ধৃতি পাঞ্জাবি আর গাঢ় খয়েরি রঙের আলোয়ান গায়ে। ইনি যে উকিল-টুকিল ছিলেন না কোনোদিন সেটা বলে দিতে হয় না, আর সাহেবীরও কোনো গন্ধ নেই ঐর মধ্যে। অন্য ভদ্রলোককে মনে হল চল্লিশের নিচে বয়স, বেশ হাসিখুশি সপ্রতিভ ভাব, মহেশবাবু আসতেই তাঁকে টিপ করে প্রণাম করলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির হাতে মিষ্টির হাঁড়ি ছিল, সেটা তিনি প্রীতীনবাবুর হাতে চালান দিয়ে মহেশবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'আমার কথা যদি শোনতো

পিকনিকের পরিকল্পনাটা বাদ নাও। একে যাত্রা অশুভ, তার উপর বাঘ পালিয়েছে। শাদুলবাবাজী যদি মুক্তানন্দের শিষ্যটিষ্য হন তাহলে একবার ছিন্নমস্তায় হাজিরা দেওয়াটা কিছুই আশ্চর্য নয়।

মহেশবাবু আমাদের দিকে ফিরে বললেন, ‘আলাপ করিয়ে দিই—এই কুডাক-ডাকা ভদ্রলোকটি হলেন আমার অনেকদিনের বন্ধু শ্রীঅখিলবন্ধু চক্রবর্তী, এক্স-স্কুলমাস্টার, জ্যোতিষচর্চা আর আয়ুর্বেদ হচ্ছে এনার হবি; আর ইনি হলেন শ্রীমান শঙ্করলাল মিশ্র, আমার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র, বলতে পারেন আমার মিসিং পুত্রের স্থান অনেকটা অধিকার করে আছেন।’

সবাই যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে দেখে অখিলবাবু আরেকবার বললেন, ‘তাহলে আমার নিষেধ কেউ মানছে না?’

‘না ভাই’, বললেন মহেশ চৌধুরী, ‘আমি খবর পেয়েছি বাঘের নাম সুলতান, কাজেই সে মুসলমান, তান্ত্রিক নয়।—ভালো কথা, মিঃ মিত্তির যদি সময় পানতো সার্কাসটা একবার দেখে নেবেন। আমাদের ইনভাইট করেছিল পরশু। বৌমা আর বিবিদিদিমণিকে নিয়ে আমি দেখে এসেছি। দিশী সার্কাস যে এত উন্নতি করেছে জানতাম না। আর বাঘের খেলার তোতুলনাই নেই।’

‘কিন্তু পরশু নাকি বাঘের খেলায় গোলমাল হয়েছিল?’ প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু।

‘সেটা খেলোয়াড়ের কোনো গুণগোলে নয়। জানোয়ারেরও তো মুড বলে একটা জিনিস আছে। সে-তো আর কলের পুতুল না যে চাবি টিপলেই লফঝাম্প করবে।’

‘কিন্তু সেই মুডের ঠেলাতো এখন সামলানো দায়,’ বললেন অরুণবাবু। ‘শহরে তোপ্যানিক। ওটাকে এফ্ফুনি মেরে ফেলা উচিত। বিলিতি সার্কাস হলে এ জিনিস কক্ষনো হত না।’

মহেশবাবু একটা শুকনো হাসি হেসে বললেন, ‘হ্যাঁ—তুমি তো আবার বন্যপশু-সংহার সমিতির সভাপতি কিনা, তোমার হাততো নিশাপিশ করবেই।’

রাজরাণা রওনা হবার আগে আরেকজনের সঙ্গে আলাপ হল। উনি হলেন শ্রীতীনবাবুর স্ত্রী নীলিমা দেবী। ঐকে দেখে বুঝলাম যে চৌধুরী পরিবারের সকলেই বেশ ভালো দেখতে।

রাজরাণা হাজারিবাগ থেকে আশি কিলোমিটার। ৪৮ কিলোমিটার গিয়ে রামগড় পড়ে, সেখান থেকে বাঁয়ে রাস্তা ধরে গোলা বলে একটা জায়গা হয়ে

ভেড়া নদী পর্যন্ত গাড়ি যায়। নদী হেঁটে পেরিয়ে খানিকদূর গিয়েই রাজরাণা।

শঙ্করলাল মিশ্রের গাড়ি নেই। তিনি আমাদের গাড়িতেই এলেন। দু’জন বেয়ারাকেও নেওয়া হয়েছে পিকনিকের দলে, তাদের একজন হল বুড়ো নূর মহম্মদ, যে মহেশবাবুর ওকালতির জীবনের শুরু থেকে আছে। অন্য জন হল ষণ্ডা মার্কা জগৎ সিং, যার জিন্মায় রয়েছে অরুণবাবুর বন্দুক আর টোটোর বাস্ক।

মিঃ মিশ্রকে দেখেই বেশ ভালো লেগেছিল, তার সঙ্গে কথা বলে আরো ভালো লাগল। ভদ্রলোকের জীবনের ঘটনাও শোনবার মতো। শঙ্করলালের বাবা দীনদয়াল মিশ্র ছিলেন মহেশবাবুর দারোয়ান। আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে, যখন শঙ্করলালের বয়স চার—দীনদয়াল নাকি একদিন হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায়। দু’দিন পরে এক কাঠুরে তার মৃতদেহ দেখতে পায় মহেশবাবুর বাড়ি থেকে প্রায় সাত-আট মাইল দূরে একটা জঙ্গলের মধ্যে। কোনো জানোয়ারের হাতে তার মৃত্যু হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু দীনদয়াল ওই জঙ্গলে কেন গিয়েছিল সেটা জানা যায়নি। একটা পুরানো শিবমন্দির আছে সেখানে, কিন্তু দীনদয়াল কোনোদিন সেখানে যেত না।

এই ঘটনার পর থেকে নাকি মহেশবাবুর ভীষণ মায়া পড়ে যায় বাপহারা চার বছরের শিশু শঙ্করলালের উপর। তিনি শঙ্করলালকে মানুষ করার ভার নেন। শঙ্করলালও খুব বুদ্ধিমান ছেলে ছিল; পরীক্ষায় বৃত্তি পায়, বি এ পাশ করে রাঁচিতে শঙ্কর বুক স্টোর্স নামে একটা বইয়ের দোকান খোলে। হাজারিবাগে ব্রাঞ্চ আছে, দু’জায়গাতেই যাতায়াত আছে ভদ্রলোকের।

এই খবরটা শুনে অবিশ্যি লালমোহনবাবু জিগ্যেস করার লোভ সামলাতে পারলেন না এই বইয়ের দোকানে বাঙলা বইও পাওয়া যায় কিনা। ‘নিশ্চয়ই’, বললেন শঙ্করলাল, ‘আপনার বইও বিক্রী করেছি আমরা।’

ফেলুদা সব শুনে বলল, ‘মহেশবাবুর দ্বিতীয় ছেলে তাহলে আপনারই বয়সী ছিলেন?’

‘বীরেন্দ্র ছিল আমার চেয়ে কয়েক মাসের ছোট’, বললো শঙ্করলাল। ‘আমরা দুজন ইস্কুলো এক ক্লাসেই পড়েছি, যদিও কলেজের পড়াটা ওরা তিন ভাইই করেছে কলকাতায় ওদের এক জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে থেকে। বীরেনের পড়াশুনায় মন ছিল না। সে ছিল বেপরোয়া, রোম্যান্টিক প্রকৃতির ছেলে। উনিশ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।’

ফেলুদা বলল, ‘মহেশবাবু কি সাধুসংসর্গ-টর্গ করেন নাকি?’

‘আগে করতেন না মোটেই, তবে ওঁর জীবনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমি যদিও দেখিনি, তবে শুনেছি এককালে মিলিটারি মেজাজ ছিল, প্রচুর মদ্যপান করতেন। সব ছেড়ে দিয়েছেন। সাধুসঙ্গ না করলেও, আমার বিশ্বাস আজ

রাজরাণায় পিকনিকের কারণ ছিন্নমস্তার মন্দির ।

‘এটা কেন বলছেন?’

‘উনি বাইরে বিশেষ প্রকাশ করেন না, কিন্তু আমি এর আগেও কয়েকবার রাজরাণা গিয়েছি ঠুঁর সঙ্গে । মন্দিরের সামনে এলে ঠুঁর মুখের ভাব বদলে যায় এটা লক্ষ করেছি ।’

‘অতীতে কি এমন কোনো ঘটনা ঘটে থাকতে পারে যার ফলে এটা হওয়া সম্ভব?’

‘সেটা আমি বলতে পারব না । ভুলে যাবেন না, আমি ছিলাম ঠুঁর দারোয়ানের ছেলে ।’

সাড়ে দশটা নাগাদ পরপর তিনখানা গাড়ি এসে থামল ভেড়া নদীর ধারে । আমাদের গাড়িটা ছিল সবচেয়ে পিছনে ; আমাদের সামনে শ্রীতীনবাবুর গাড়ি । তিনিই প্রথমে নামলেন গাড়ি থেকে, হাতে টেপ রেকর্ডার আর নেমেই চলে গেলেন বাঁয়ে জঙ্গলের দিকে । আমরা সবাই নামলাম । মহেশবাবু ছিলেন প্রথম গাড়িতে, তিনি আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, ‘তাড়া নেই, নদী পেরিয়েই রাজরাণা, সঙ্গে ফ্লাস্কে কফি আছে, একটু রিল্যাক্স করে তবে ওপারে যাত্রা ।’

আমরা সবাই নদীর দিকে এগিয়ে গেলাম । পাহাড়ে নদী, যাকে বলে খরস্রোতা । বর্ষার ঠিক পরে এ নদী পেরোনো নাকি মুশকিল, কারণ তখন জল থাকে হাঁটু অবধি । ছোট বড় মেজ সেজো নানান সাইজের সাদা কালো খয়েরি পাটকিলে ছিটদার সব পাথর ডিঙিয়ে পাশ কাটিয়ে, যুগ যুগ ধরে সেগুলোকে মোলায়েম করে, পালিশ করে ব্যস্তবাগীশ ভেড়া নদী তড়িঘড়ি ছুটে চলেছে দামোদরে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে । এই ঝাঁপের জায়গাই হল রাজরাণা ।

নীলিমা দেবী কফি ঢেলে দিলেন কাগজের কাপে, আমরা সবাই একে একে গিয়ে নিয়ে নিলাম । শ্রীতীনবাবুকে বোধহয় নদীর শব্দ বাঁচিয়ে পাখির ডাক রেকর্ড করতে হবে বলে বনের একটু ভিতর দিকে যেতে হয়েছে । পাখি যে ডাকছে নানারকম সেটা ঠিকই ।

এখানে এসে নতুন যাদের সঙ্গে আলাপ হল, ফেলুদার কায়দায় তাদের একটু স্টাডি করার চেষ্টা করলাম ।

বয়সে যে সবচেয়ে ছোট, সে তার ডলটাকে একটা পাথরের উপর বসিয়ে দিয়ে বলল, ‘চুপাটি করে বসে থাক । দুটুমি করলেই ভেড়া নদীতে ফেলে দেব, তখন দেখবে মজা ।’

অরুণবাবু হাত থেকে কাগজের কাপ ফেলে দিয়ে একটু দূরে একটা ঝোপের পিছনে অদৃশ্য হলেন, আর তার পরেই ঝোপের মাথার উপর ধোঁয়া দেখে বুঝলাম এই বয়সেও ভদ্রলোক বাপের সামনে সিগারেট খান না ।

মহেশ চৌধুরী হাত দুটো পিছনে জড়ো করে নদীর কাছেই দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে জলের দিকে চেয়ে আছেন ।

ফেলুদা দুটো পাথর ঠোকাঠুকি করে সেগুলো চকমকি কিনা পরীক্ষা করছিল, অখিলবাবু তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, ‘আপনার রাশিটা কি জানা আছে?’ ফেলুদা বলল, ‘কুন্ড । সেটা গোয়েন্দার পক্ষে ভালো না খারাপ?’

নীলিমা দেবী মাটি থেকে একটা বুনো হলদে ফুল তুলে সেটা খোঁপায় গুঁজে লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে কী একটা বলায় লালমোহনবাবু মাথাটা পিছনে হেলিয়ে স্মার্টলি হাসতে গিয়ে এক লাফে বাঁয়ে সরে গেলেন, আর নীলিমা দেবী খোলা হাসি হেসে বললেন, ‘সে কী, আপনি গিরগিটি দেখে ভয় পাচ্ছেন?’

শঙ্করলালকে খুঁজতে গিয়ে দেখি উনি ইতিমধ্যে কখন জানি নদী পেরিয়ে গিয়ে ওপারে একজন গেরুয়াধারী ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন । একটা বাসে কিছু যাত্রী এসেছিল, তারা একটুক্ষণ আগেই নদী পেরিয়েছে সেটা দেখেছিলাম ।

কফি খাওয়া শেষ, শ্রীতীনবাবুও এসে গেছেন, তাই আমরা ওপারে যাবার জন্য তৈরি হলাম । ধুতি, শাড়ি, প্যান্ট সবই একটু ওপরদিকে উঠে গেল, বিবি চড়ে বসল বুড়ো নূর মহম্মদের পিঠে, লালমোহনবাবু জলে নামবার আগে মনে হল চোখ বুজে কী জানি বিড়বিড় করে নিলেন, পেরোবার সময় বার তিনেক বেসামাল হতে হতে সামলে নিলেন, আর ওপারে পৌঁছিয়েই বললেন ব্যাপারটা যে এত সহজ সেটা উনি ভাবতেই পারেননি ।

বাকি পথটার দু পাশে গাছপালা ছিল, যদিও সেটাকে জঙ্গল বলা চলে না । তাও লালমোহনবাবু সেদিকে বারবার আড়চোখে চাওয়াতে বুঝলাম উনি বাঘের কথা ভোলেননি ।

একটা মোড় ঘুরতেই থিয়েটারের পর্দা সরে যাওয়ার মতো চোখের সামনে রাজরাণা বেরিয়ে পড়াতে লালমোহনবাবু এত জোরে বাঃ বললেন যে পাশের গাছ থেকে একসঙ্গে দুটো ঘুঘু উড়ে পালাল ।

অবিশ্যি বাঃ বলার যথেষ্ট কারণ ছিল । আমরা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি সেখান থেকে দুটো নদীই দেখা যাচ্ছে । বাঁ দিকে উত্তরে ভেড়া, আর ডাইনে নিচে দামোদর । জলপ্রপাতের জায়গাটা দেখতে হলে আরো এগিয়ে বাঁয়ে যেতে হবে, যদিও শকটটা এখান থেকেই পাচ্ছি । সামনে আর নদীর ওপারে বিশাল বিশাল কচ্ছপের পিঠের মতো পাথর, দূরে বন, আর আরো দূরে আবছা পাহাড়ের লাইন ।

মন্দির আমাদের বাঁয়ে বিশ হাতের মধ্যে । বোঝাই যায় অনেকদিনের পুরানো, কিন্তু সেটাকে আবার নতুন করে সাজগোজ পরানো হয়েছে । এই ক’দিন আগেই কালীপূজোতে এখানে মোষ বলি হয়েছে বলে শুনলাম । লালমোহনবাবু বললেন এককালে নিঘর্ষিত নরবলি হত । অবিশ্যি সেটা যে খুব ভুল বলেছেন তা হয়ত না ।

বাসে যেসব যাত্রী এসেছে তাদের দৃশ্য দেখার উৎসাহ নেই, তারা সবাই মন্দিরের সামনে জড়ো হয়েছে। শঙ্করলাল ঠিকই বলেছিলেন। মহেশ চৌধুরী প্রায় মিনিট খানেক ধরে মন্দিরের দরজার দিকে চেয়ে রইলেন, যদিও অন্ধকারে বিগ্রহটা দেখাই যায় না। তারপর ধীরে ধীরে চলে গেলেন অন্যরা যেদিকে গেছে সেইদিকে। আমরা তিনজনও সেইদিকেই এগিয়ে গেলাম।

খানিকটা যেতেই ফলসটা দেখতে পেলাম। যেখানে বালির উপর শতরঞ্চি পাতা হচ্ছে সেখান থেকে ওটা দেখা যাবে। লালমোহনবাবু বললেন, 'এটা কিন্তু ফাউ হয়ে গেল মশাই। হাজারিবাগ এসে সেকেন্ড দিনেই একজন রিটার্ডার্ড অ্যাডভোকেটের জন্মদিনে পিকনিকে ইনভাইটেড হবেন, এটা কি ভাবতে পেরেছিলেন?'

'এ তো সবে শুরু', বলল ফেলুদা।

'বলছেন?'

'দাবা খেলেছেন কখনো?'

'রক্ষক করুন মশাই।'

'তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে। দাবার শেষ দিকে যখন দু'পক্ষের পাঁচটি কি সাতটি ঘুঁটি বোর্ডের এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন অনড় অবস্থাতেই তাদের পরস্পরের মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ চলতে থাকে। যারা খেলছে তারা তাদের প্রত্যেকটি স্নায়ু দিয়ে ব্যাপারটা অনুভব করে। এই চৌধুরী পরিবারটিকে দেখে আমার দাবার ঘুঁটির কথা মনে হচ্ছে, যদিও কে সাদা কে কালো, কে রাজা কে মন্ত্রী, তা এখনো বুঝিনি।'

আমরা মন্দির আর পিকনিকের জায়গার মাঝামাঝি একটা জায়গায় একটা অশ্বখগাছের তলায় পাথরের উপর বসলাম। এগারোটাও বাজেনি এখনো, খাবার তাড়া নেই, সবাইয়ের মধ্যে একটা নিশ্চিন্ত ঢিলেঢালা ভাব। অখিলবাবু বালিতে উবু হয়ে বসে বিবিকে হাত নেড়ে কী যেন বোঝাচ্ছেন; নীলিমা দেবী শতরঞ্চিতে বসে তাঁর ব্যাগের ভিতর থেকে একটা ইংরিজি পেপারব্যাক বার করলেন, সেটা নিঘাত ডিটেকটিভ বই; প্রীতীনবাবু একটি টিবির উপর বসে তাঁর টেপ রেকর্ডারে একটা নতুন ক্যাসেট ভরলেন; অরুণবাবু জগৎ সিংয়ের কাছ থেকে তাঁর বন্দুকটা নিলেন, মহেশবাবু মাটি থেকে একটা পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে সেটা নেড়ে চেড়ে দেখে আবার ফেলে দিলেন। 'শঙ্করলালকে দেখছি না', বললেন লালমোহনবাবু।

'আছেন, তবে দূরে', বলল ফেলুদা।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম মন্দির ছাড়িয়ে আরো বেশ কিছুটা দক্ষিণে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে শঙ্করলাল কিছুক্ষণ আগে দেখা সেই গেরুয়াধারীটির

সঙ্গে কথা বলছেন। 'একটু যেন সাস্পিশাস বলে মনে হচ্ছে', মন্তব্য করলেন লালমোহনবাবু।

ফেলুদারও সাস্পিশাস মনে হচ্ছে কিনা সেটা জানবার আগেই আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন অরুণবাবু, তাঁর হাতে বন্দুক। 'ওটা দিয়ে কি বাঘ মারা যায়?' জিগ্যেস করল ফেলুদা।

'সার্কাসের বাঘ এতদূর আসবে না', হেসে বললেন অরুণবাবু। 'সাম্বার মেরেছি এটা দিয়ে, তবে সাধারণত পাখিটাখিই মারি। এটা টোয়েন্টি-টু।'

'তাই তো দেখছি।'

'আপনি শিকার করেন?'

'শুধু মানুষ।'

'আপনার কি কোনো এজেন্সি আছে নাকি? না প্রাইভেট?'

ফেলুদা তার প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর লেখা একটা কার্ড অরুণবাবুকে দিয়ে দিল। ভদ্রলোক বললেন, 'থ্যাঙ্কস। কখন কাজে লেগে যায় বলা তো যায় না।'

ভদ্রলোক যেদিক দিয়ে এসেছিলেন সেইদিকেই চলে গেলেন। ফেলুদা এই ফাঁকে কখন যে সেই সকালের কাগজটা পকেট থেকে বের করেছে সেটা দেখতেই পাইনি। লালমোহনবাবু কাগজটার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'বাঙলা নামের কথা কী বলছিলেন মশাই?'

'এই দেখুন।'

ফেলুদা পাশাপাশি লেখা চারটে ইংরিজি অক্ষরের দিকে দেখাল। লালমোহনবাবু ভুরু ভুরু বললেন, 'ওটা তোমানে হচ্ছে লক্ষ লিখতে গিয়ে বানান ভুল করে LOKC লিখেছে।'

'এলোকেশী!' আমি টেঁচিয়ে উঠলাম। এরকম ভাবে ইংরিজি অক্ষরে বাঙলা কথা আমিও লিখেছি ছেলেবেলায়।

'বাঃ', বললেন লালমোহনবাবু, 'সত্যিই তো। আর এই জাপানী নামটা?'

'ওকাহা? এটা একটা বাংলা সেনটেন্স। OKAHA!'

'ও, কে, এ, এইচ, এ? এটা একটা বাংলা সেনটেন্স? একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি?'

'ও, কে, এ, এইচ, এ—এটা তাড়াতাড়ি বলুন তো, না থেমে। দেখুন তো কী রকম শোনায়।'

এবার লালমোহনবাবুর মুখে একটা বিস্ময় আর খুশি মেশানো ভাব দেখা দিল। 'ও কে এয়েচে! ওয়াভারফুল!...বাঃ, বাঃ, এইত, জলের মতো সোজা—SO—এসো; DO—দিও; NADO—এনে দিও; NHE—এনেচি।—ও বাব্বা! এটা যে বিরাট সেনটেন্স; এর তো শেষ নেই

মশাই!—AKLO ATBB BBSO ADK SO RO ADK SO AT KLO
PC LO ROT OT DD OK OJT RO OG এ আমার সাথি নেই।’

‘ধৈর্য নেই বলুন। তোপসে পড়। পাংচুয়েট করে নিলে জলের মতোসোজা।’

খুব বেশি না ঠেকেই পড়ে গেলাম আমি।—

‘এ কে এল? এটি বিবি। বিবি এস। এদিকে এস। আরো এদিকে এস। এটি কে এল? পিসি এল। আর ওটি? ওটি দিদি। ও কে? ও জেঠি। আর ও? ও কি।’

‘ওটা কোথায় পেলেন আপনারা?’ মহেশবাবু হাসিমুখে আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছেন।

‘আপনার বাগানের ধারে পড়ে ছিল,’ বলল ফেলুদা।

‘বিবিদিদিমণির সঙ্গে একটু খেলা করছিলাম আর কী।’

‘সেটা আন্দাজ করেছি,’ বলল ফেলুদা। আমরা তিনজনেই উঠতে যাচ্ছিলাম, ভদ্রলোক বাধা দিয়ে আমাদের পাশেই পাথরের উপর বসে পড়লেন।

‘আরেকটি কাগজ দেখাব আপনাদের।’

মহেশবাবুর মুখে আর হাসি নেই। পকেট থেকে মানিবাগ বার করে তার ভিতর থেকে একটা পুরানো ভাঁজ করা পোস্টকার্ড বার করলেন।—‘আমার দ্বিতীয় পুত্রের শেষ পোস্টকার্ড।’

ফেলুদা পোস্টকার্ডটা নিয়ে ভাঁজ খুলল। একদিকে রঙিন ছবি। লেক সমেত জুরিখ শহরের দৃশ্য। উল্টোদিকে শুধুই নাম ঠিকানা দেখে আমরা সকলেই বেশ অবাক।

মহেশবাবু বললেন, ‘শেষের দিকে ও তাই করত। শুধু জানান দিয়ে দিত কোথায় আছে। আগেও দু’এক লাইনের বেশি লেখেনি কখনো।’

ভদ্রলোক ফেলুদার হাত থেকে পোস্টকার্ডটা নিয়ে আবার ভাঁজ করে ব্যাগে রেখে দিলেন।

ফেলুদা বলল, ‘বীরেনবাবু বিলেতে কী করতেন সেটা জানতে পেরেছিলেন?’

মহেশবাবু মাথা নাড়লেন। মামুলি চাকরি করার ছেলে ছিল না বীরেন। সে ছিল যাকে বলে রেবেল। একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। গতানুগতিকের একেবারে বাইরে। তার আবার একটি হিরো ছিল। বাঙালী হিরো। একশো বছর আগে তিনিও নাকি বাড়ি থেকে পালিয়ে জাহাজের খালাসী হয়ে বিলেত যান। তারপর শেষ পর্যন্ত ব্রেজিল না মেক্সিকো কোথায় গিয়ে আর্মিতে ঢুকে কর্নেল হয়ে সেখানকার যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব দেখান।’

‘সুরেশ বিশ্বাস কি?’ ফেলুদা জিগ্যেস করল। লালমোহনবাবুরও চোখ চকচক করে উঠেছে। বললেন, ‘ইয়েস ইয়েস, সুরেশ বিশ্বাস। ব্রেজিলে মারা যান

ভদ্রলোক। কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস।’

মহেশবাবু বললেন, ‘ঠিক বলেছেন। ওই নাম। কোথেকে তার একটা জীবনী জোগাড় করেছিল, আর সেটা পড়েই ওর অ্যাডভেঞ্চারের শখ হয়। আমি বাধা দিইনি। জানতাম দিলে কোনো ফল হবে না। উধাও হয়ে গেল। তারপর মাস দুয়েক পরে এল ইউরোপ থেকে এক চিঠি। হল্যান্ড, সুইডেন, জার্মানি, অস্ট্রিয়া...কী করছে কিছু বলে না, শুধু জানিয়ে দেয় সে আছে। চলে গেছে বলে যেমন দুঃখ হত, তেমনি নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে বলে গর্বও হত। তারপর সিঙ্গিটি সেভনের পর আর চিঠি নেই।’

মহেশবাবু কিছুক্ষণ উদাস চোখে দূরের গাছপালার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, ‘সে আর আমার কাছে আসবে না। এত সুখ আমার কপালে নেই। আমার উপরে যে অভিশাপ লেগেছে!’

‘সে কি হে, তুমি আবার অভিশাপ-টভিশাপে বিশ্বাস কর কবে থেকে?—অখিলবাবু আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। মহেশবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘তুমি আমার কোষ্ঠীই বিচার করেছ অখিল, মানুষটাকে বিচার করনি।’

‘ওইখানেই তো ভুল’, বললেন অখিলবাবু, ‘মানুষের কুষ্ঠী, মানুষের রাশি গ্রহ লগ্ন—এ সবের থেকেতো আলাদা নয় মানুষ। তোমায় বলেছিলুম সেই ফটিটুতে, যে তোমার জীবনে একটা বড় চেঞ্জ আসছে—মনে আছে তোমার?—শুনুন মশাই—’ ফেলুদার দিকে ফিরলেন অখিলবাবু—‘এই যে দেখছেন ঐকে, এখন দেখলে বুঝতে পারবেন কি যে ইনি এককালে রাঁচি টু নেতারহাট যাবার পথে ঐর একটি পুরানো ফোর্ড গাড়ি বিকল হয়ে যাওয়ায় তার উপর রাগ করে সেটাকে পাহাড় থেকে হাজার ফুট নিচে ফেলে দিয়েছিলেন?’

মহেশবাবু উঠে পড়েছিলেন। বললেন, ‘বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বদলায় সেটা বলে দিতে কি জ্যোতিষীর দরকার হয়?’

কথাটা বলে মহেশবাবু উত্তরদিকে চলে গেলেন, বোধহয় পাথরের সন্ধানে। অখিলবাবু বসলেন তাঁর জায়গায়। গল্প বলার মুডে ছিলেন ভদ্রলোক। বললেন, ‘আশ্চর্য লোক এই মহেশ। আমি ওঁর পড়শী ছিলাম। যদিও অন্য দিক দিয়ে ব্যবধান বিস্তর। আমি শিক্ষক, আর ও উদীয়মান অ্যাডভোকেট। ওর ছেলেদের টিউশনি করেছি কিছুদিন, সেই থেকে আলাপ। অ্যালোপ্যাথিতে আস্থা ছিল না, তাই অসুখ-টসুখ করলে মাঝে মাঝে শিকড় বাকল চেয়ে নিত আমার কাছে। সামাজিক ব্যবধানটা কোনোদিন বুঝতে দিত না। আমার ছেলেকেও নিজের ছেলের মতোই স্নেহ করত। কোনো স্নবারি ছিল না।’

‘আপনার ছেলে কী করে?’

‘কে, অধীর? অধীর ইঞ্জিনিয়ার। বোকারোয় আছে। খড়্গপুরে পাশ করে

ডুসেলডর্ফে চাকরি নিয়ে চলে গেসল । বিদেশেই ছিল বছর দশেক, তারপর—

একটা বিস্ফোরণের শব্দ অখিলবাবুর কথা থামিয়ে দিল । ‘বন্দুক !’—চৈচিয়ে উঠল বিবি—‘জেঠু পাখি মেরেছে ! আমরা রান্ধিরে তিতিরের মাংস খাব !’

‘দেখি মহেশ আবার কোথায় গেল ।’ অখিলবাবু যেন কিছুটা চিন্তিত ভাবেই উঠে পড়লেন । ‘পাথর খুঁজতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে-টড়ে গেলে জন্মদিনটাই...’

‘পিকনিক বলে মনেই হচ্ছে না ।’ প্রীতীনবাবুর স্ত্রী হাতের বইটা বন্ধ করে শতরঞ্জির উপর রেখে উঠে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন । ‘সবাই এমন ছড়িয়ে আছে কেন বলুন তো ?’

‘খিদে পেলেই সুড়সুড় করে এসে হাজির হবে,’ বলল ফেলুদা ।

‘কিছু খেললে হত না ?’

‘তাস ?’ বললেন লালমোহনবাবু, ‘আমি কিন্তু জু ছাড়া আর কিছু জানি না ।’

‘তাও আবার ঢিলে,’ বলল ফেলুদা ।

‘তাসতোআনিনি সঙ্গে,’ বললেন নীলিমা দেবী । ‘এমনি মুখে মুখে কিছু খেলা যেতে পারে ।’

‘জল-মাটি-আকাশ হলে লালমোহনবাবু যোগ দিতে পারেন,’ বলল ফেলুদা ।

‘সেটা আবার কী মশাই ?’

‘খুব সহজ,’ বললেন নীলিমা দেবী, ‘ধরুন, আপনার দিকে তাকিয়ে আমি জল, মাটি, আকাশ এই তিনটির যে কোনো একটা বলে দশ গুণতে শুরু করব । জল বললে জলের, মাটি বললে মাটির, আর আকাশ বললে আকাশের একটা প্রাণীর নাম করতে হবে আপনাকে ওই দশ গোনার মধ্যে ।’

‘এটা খুব কঠিন খেলা বুঝি ?’

‘খেলে দেখুন একবার । আমি আপনাকেই প্রশ্ন করছি ।’

‘বেশ । রেডি ।’ লালমোহনবাবু দম নিয়ে সোজা হয়ে যোগাসনে বসলেন । নীলিমা দেবী ভদ্রলোকের চোখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ চৈচিয়ে উঠলেন—

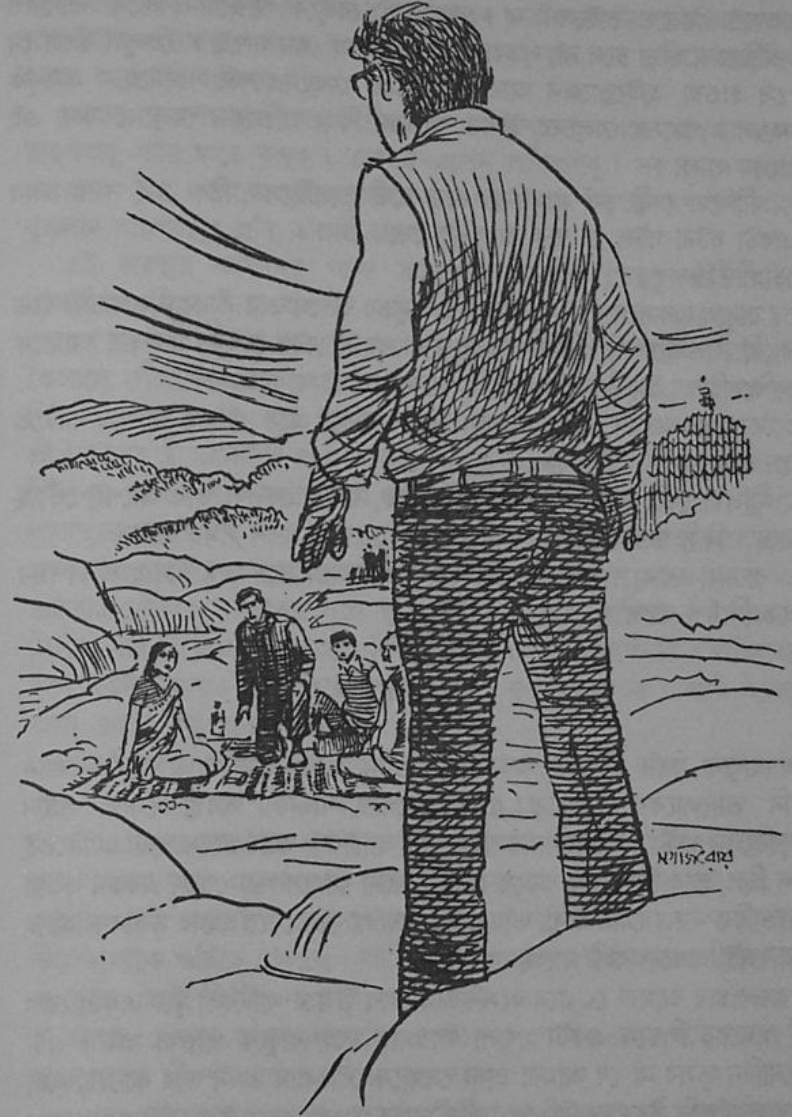
‘আকাশ ! এক দুই তিন চার পাঁচ—’

‘এঁ-এঁ-এঁ—’

‘ছয় সাত আট নয়—’

‘বেঙুর !’

ফেলুদা অবিশ্যি জানতে চাইল বেঙুরটা কোন গ্রহের আকাশে চরে বেড়ায় । তাতে লালমোহনবাবু বললেন যে ব্যাঙ, হাঙর আর বেলুন—এই তিনটে তিনি ভেবে রেখেছিলেন, বলার সময় তালগোল পাকিয়ে গেছে । তাতে ফেলুদা বলল যে বেলুনকে প্রাণী বলা যায় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে ; কিন্তু লালমোহনবাবু



কথাটা মানতে চাইলেন না। বললেন, 'বেলুনে অক্সিজেন লাগে, প্রাণীরও অক্সিজেন ছাড়া চলে না, সুতরাং প্রাণী বলব না কেন মশাই?' ফেলুদা বলল যে সে হাওয়া, হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামের বেলুনের কথা শুনেছে, এমনকি কয়লার গ্যাসের বেলুনের কথাও শুনেছে, কিন্তু অক্সিজেন বেলুনের কথা এই প্রথম শুনল।

নীলিমা দেবী তর্ক থামানোর জন্য হাত তুলেছিলেন, ঠিক সেই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল যে তর্ক আপনাই থেমে গেল।

প্রীতীনবাবু।

মানুষে একসঙ্গে দুঃখ আর আতঙ্ক অনুভব করলে তার কীরকম ভাবভঙ্গী হতে পারে, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির করা তার একটা ড্রইং ফেলুদা একবার আমাকে দেখিয়েছিল। প্রীতীনবাবুর চেহারা অবিকল সেই ছবির মতো।

ভদ্রলোক একটা ঝোপের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়লেন।

নীলিমা দেবী ছুটে গেলেন স্বামীর দিকে, যদিও ফেলুদা তার আগেই পৌঁছে গেছে। কিন্তু ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে কথা বেরোতে বেশ সময় লাগল।

'বা...বা...বাবা!' বললেন প্রীতীনবাবু, আর সঙ্গে সঙ্গে তার ডান হাতটা পিছন দিকে নির্দেশ করল।

॥ ৫ ॥

মহেশবাবুকে যখন বাড়িতে আনা হয় তখন প্রায় আড়াইটা। তখনও জ্ঞান হয়নি ভদ্রলোকের। মাথায় চোট লেগেছে, দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সটান পড়েছিলেন মাটিতে। ডাক্তার বলছেন হার্ট অ্যাটাক। ভদ্রলোকের হার্ট এমনতেই দুর্বল ছিল, তার উপর এই বয়সে হঠাৎ কোনো কারণে শক্ পেলে এরকম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। মোট কথা, তাঁর অবস্থা ভালো নয়, সেরে ওঠার সম্ভাবনা আছে কিনা সেটা এখনো বলা যাচ্ছে না।

রাজরাপ্পায় আমরা যেখানে বসেছিলাম, তার উত্তরে খানিকটা দূরে একটা বেশ বড় পাথরের পিছনে একটা খোলা জায়গায় মহেশবাবুকে পাওয়া যায়। এটা কোনোদিন ভুলব না যে আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন তাঁর কাছেই দুটো হলদে প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছিল। প্রীতীনবাবু পাহাড় বেয়ে উপর দিকের জঙ্গলে গিয়েছিলেন, ফেরার পথে কিছুদূর নেমে এসে একটা ঝোপ পেরিয়ে নিচের দিকে চেয়ে দেখেন মহেশবাবু পড়ে আছেন মাটিতে। তিনি ভেবেছিলেন ভদ্রলোক মারাই গেছেন, তাই ওরকম চেহারা করে এসেছিলেন খবর দিতে। ফেলুদা গিয়েই

মহেশবাবুর নাড়ী ধরে বলল তিনি বেঁচে আছেন। তাঁর মাথাটা পড়েছিল একটা থান ইটের সাইজের পাথরের উপর, তার ফলে খানিকটা রক্ত বেরিয়ে পড়েছিল পাথর আর বালির উপর।

আমরা মহেশবাবুর কাছে পৌঁছানোর মিনিটখানেক পরে প্রথম এলেন অরুণবাবু, তাঁর হাতে বন্দুক। তারপর এলেন অখিলবাবু। সব শেষে এলেন শঙ্করলাল মিশ্র। শেষের ভদ্রলোকটিকে যেরকম ভেঙে পড়তে দেখলাম, তাতে বুঝলাম মহেশবাবুর প্রতি তাঁর টান কত গভীর।

এই অবস্থায় আমাদের পক্ষে মহেশবাবুকে তুলে ভেড়া নদী পেরিয়ে হাজারিবাগ নিয়ে আসা অসম্ভব, তাই ভদ্রলোকের দুই ছেলে তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন শহরে। ডাক্তার আর অ্যান্থ্রল্যাপ নিয়ে আসতে লাগল প্রায় আড়াই ঘণ্টা, কৈলাসে পৌঁছতে আরো এক ঘণ্টা। আমরা কিছুক্ষণ কৈলাসেই রয়ে গেলাম। পিকনিক আর হয়নি, তাই কারুর খাওয়া হয়নি। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেই প্রীতীনবাবুর স্ত্রী আমাদের জন্য পরোটা, আলুরদম, মাংসের কাবাব ইত্যাদি এনে দিলেন। অশ্চর্য শক্ত বলতে হবে ভদ্রমহিলা। বিবি অবিশ্যি ব্যাপারটা বুঝতেই পারছে না, বলছে দাদু মাথা ঘুরে পড়ে গেছে। আমরা বৈঠকখানাতেই বসেছিলাম, অরুণবাবু ডাক্তারের সঙ্গে ছিলেন বাপের ঘরে, প্রীতীনবাবু মাঝে মাঝে এসে ভদ্রতার খাতিরে আমাদের সঙ্গে দু'একটা কথা বলে যাচ্ছিলেন। শঙ্করলাল নির্বাক, এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তিনি একবারও মুখ খোলেননি। অখিলবাবুর মুখে একটাই কথা—'এত করে বললাম, তাও কথা শুনল না। আমি জানতাম আজ একটা কিছু অঘটন ঘটবে।'

চারটে নাগাদ আমরা উঠে পড়লাম। প্রীতীনবাবু ছিলেন, তাঁকে বললাম কাল এসে খবর নিয়ে যাব কেমন থাকেন মহেশবাবু।

বাড়ি ফিরে এসে হাত মুখ ধুয়ে বারান্দায় এসে বসলাম তিনজন। একদিনে অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটলে মাথাটা কেমন যেন ভেঁা ভেঁা করে, আমার সেই অবস্থা। ফেলুদা কথা বলছে না, তার মানে তার ভাবনা চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে ফেলছে। আমি জানি ও এখন বেশি কথা বলা পছন্দ করে না, তাও একটা জিনিস না বলে পারলাম না।

'আচ্ছা ফেলুদা, ডাক্তার বলেছেন একটা শক্ পেলে এরকম হতে পারে, কিন্তু রাজরাপ্পাতে কী শক্ পেতে পারেন মহেশবাবু?'

'গুড কোয়েশ্চন,' বলল ফেলুদা, 'আজকের ঘটনার ওই একটা ব্যাপারই আমার কাছে অর্থপূর্ণ। অবিশ্যি শক্ পেয়েছেন কিনা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না এখনো।'

'সেটা ভদ্রলোক সুস্থ হয়ে উঠলেই ক্রিয়ার হয়ে যাবে,' বললেন

লালমোহনবাবু ।

‘উঠবেন কি সুস্থ হয়ে ?’

মহেশবাবু সম্বন্ধে ফেলুদার মনে যে কৌতূহলের ভাব জেগে উঠেছে, সেটা আজ কৈলাসের বৈঠকখানায় বসেই বুঝতে পারছিলাম । বেশির ভাগ সময়টাই ও ঘরের জিনিসপত্র, আলমারির বই, এই সব দেখে কাটিয়েছে । ভাবটা যে তদন্ত করছে তা নয়, বেশ টিলেঢালা, কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম যে ও সব কিছু মনে মনে নোট করে নিচ্ছে । সেই ফ্যামিলি গ্রুপটা ও হাতে তুলে নিয়ে দেখল প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে ।

আদিবাসী গ্রাম থেকে মাদলের শব্দ ভেসে আসছে । হঠাৎ খেয়াল হল যে আজ ম্যাজেস্টিক সার্কাসের বাঘটার কোনো খবর পাওয়া যায়নি । অবিশ্যি ধরা পড়লে নিশ্চয়ই জানা যেত । অন্তত বুলাকিপ্রসাদ নিশ্চয়ই জানাত ।

ঠাণ্ডাটা পড়েছে, লালমোহনবাবু তাই মাস্কিাপটা আরো টেনে নামিয়ে নিয়ে বললেন, ‘সিগনিফিক্যান্ট ব্যাপার ।’

ভদ্রলোক বোধহয় ভেবেছিলেন আমরা দুজনেই জিগ্যেস করব ব্যাপারটা কী ; সেটা না করাতে শেষে নিজেই বললেন, ‘যে সময়টা ঘটনাটা ঘটল, তখন কিন্তু মিসেস প্রীতীন আর খুকী ছাড়া আর কে কী করছিল তা আমরা কেউই জানি না ।’

‘কেন জানব না,’ বলল ফেলুদা । ‘অরুণবাবু পাখি মারার চেষ্টা করছিলেন, প্রীতীনবাবু পাখির ডাক রেকর্ড করছিলেন, অখিলবাবু মহেশবাবুকে খুঁজছিলেন, শঙ্করলাল তাঁর সন্ন্যাসী বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিলেন, আর বেয়ারা দু’জন আমাদের বিশ হাত দূরে শিমুল গাছের তলায় বসে বিড়ি খাচ্ছিল ।’

‘বেয়ারাদের তো আমিও দেখেছি মশাই, কিন্তু আর সবাই সত্যি কথা বলছে কিনা সেটা জানচেন কী করে ?’

‘যাঁদের সঙ্গে মাত্র কয়েক ঘণ্টার আলাপ তাঁদের আচরণ সম্বন্ধে এত চট করে সন্দেহ প্রকাশ করতে আমি রাজি নই ।’

‘তা বটে, তা বটে ।’

ডিনারের মাঝখানে লালমোহনবাবু হঠাৎ একটা নতুন কথা ব্যবহার করলেন—‘সুপার-কেলেঙ্কারি’ । এটাও বলা দরকার যে কথাটা বলার সময় তিনি চেয়ার ছেড়ে প্রায় ছ’ইঞ্চি লাফিয়ে উঠেছিলেন । ফেলুদা স্বভাবতই জিগ্যেস করল ব্যাপারটা কী ।

‘আরে মশাই, একটা জরুরী কথাই বলা হয়নি । সাংঘাতিক ক্লু । যেখানে ডেডবডি—থুড়ি, মহেশবাবু পড়েছিলেন, তার একপাশে পায়ে কী জানি ঠেকতে চেয়ে দেখি প্রীতীনবাবুর টেপ রেকর্ডার ।’

‘সেটা এনেছেন সঙ্গে ?’

‘ভাবলুম পরে তুলব, তুলে ভদ্রলোককে দেব, তা তখন যা অবস্থা.....ফেরার সময় দেখি সেটা আর নেই ।’

‘প্রীতীনবাবু তুলে নিয়েছিলেন বোধহয় ।’

‘দূর মশাই, প্রীতীনবাবু ওই দিকটাতেই য়েসেননি । তাছাড়া জিনিসটা পড়েছিল একটা ঝোপড়ার মধ্যে ; পায়ে না ঠেকলে চোখেই পড়ত না ।’

ফেলুদা ব্যাপারটা নিয়ে কী যেন মন্তব্য করতে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা টেলিফোন এল ।

অরুণবাবু ।

ফেলুদা দু একটা কথা বলেই ফোনটা রেখে বলল, ‘কৈলাস চল । মহেশবাবুর জ্ঞান হয়েছে । আমার নাম করছেন ।’

গাড়িতে কৈলাস যেতে লাগল এক মিনিট ।

মহেশবাবুর ঘরে সকলেই রয়েছেন, এক বিবি ছাড়া । ভদ্রলোকের মাথায় ব্যান্ডেজ, চোখ আধবোজা, হাত দুটো বুকের উপর জড়ো করা । ফেলুদাকে দেখে মুখে যে হাসিটা দেখা দিল সেটা প্রায় চোখে ধরাই পড়ে না । তারপর তাঁর ডান হাতটা উঠে তর্জনীটা সোজা হল ।

‘কা কা...’

‘একটা কাজের কথা বলছেন কি ?’ ফেলুদা জিগ্যেস করল ।

ভদ্রলোকের মাথাটা সামান্য নড়ে উঠল হ্যাঁ-য়ের ভঙ্গিতে । তারপর তর্জনীর পাশে মাঝের আঙুলটাও উঠে দাঁড়াল । একের জায়গায় দুই ।

‘উই.....উই...’

এইটুকু বলে দুটো আঙুল আবার ভাঁজ হয়ে গিয়ে সেই জায়গায় বুড়ো আঙুলটা সোজা হয়ে উঠে এদিক ওদিক নড়ল ।

তারপর ভদ্রলোক বেশ কষ্ট করে ঘাড়টা ডানদিকে ঘোরালেন । ওদিকে বেডসাইড টেবিল । তার উপর মুক্তানন্দের ছবি ।

ছবির দিকে হাতটা বাড়ানোর চেষ্টা করতে অরুণবাবু ছবিটা বাপের দিকে এগিয়ে দিলেন । মহেশবাবু সেটা নিজে না নিয়ে ফেলুদার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন । অরুণবাবু ছবিটা ফেলুদাকে দেবার পর মহেশবাবু আবার দু আঙুল দেখালেন । কী যেন একটা বলতেও চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারলেন না ।

এর পরে আর কোনো কথা বলতে পারেননি মহেশ চৌধুরী ।

তিন মহাদেশের শক্তি যাঁর পিছনে, সেই মুক্তনন্দের ফ্রেমে বাঁধানো পাসপোর্ট সাইজের ছবি এখন আমাদের ঘরে। আমরা চলে আসার ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই মহেশবাবু মারা যান। যাবার আগে ফেলুদার উপর যে তিনি কী দায়িত্ব দিয়ে গেছেন সেটা ফেলুদা বুঝলেও, আমি বুঝিনি। আর লালমোহনবাবুও নিশ্চয়ই বোঝেননি, কারণ উনি বললেন মহেশবাবু নাকি ফেলুদাকে মুক্তনন্দের শিষ্য হতে বলে গেছেন। ফেলুদা যখন জিগ্যেস করল যে ছবিটা দেবার পরে দুটো আঙুল দেখানোর মানে কী, তখন লালমোহনবাবু বললেন মুক্তনন্দের শিষ্য হলে ফেলুদার শক্তি ডবল হয়ে যাবে এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন ভদ্রলোক। ‘অবিশ্যি কাঁচকলা দেখালেন কেন সেটা বোঝা গেল না।’ স্বীকার করলেন লালমোহনবাবু।

পরদিন সকালে অখিলবাবুর টেলিফোনে আমরা মৃত্যুসংবাদটা পেলাম।

এগারোটা নাগাদ শ্মশান থেকে ফেরার পথে লালমোহনবাবু জিগ্যেস করলেন, ‘কৈলাসে যাবেন, না বাড়ি যাবেন?’ ফেলুদা বলল, ‘এবেলা ওদিকটা না মাড়ানোই ভালো: অনেকে সমবেদনা জানাতে আসবে, কাজ হবে না কিছুই।’

‘কী কাজের কথা বলছেন?’

‘তথ্য সংগ্রহ।’

দুপুরে খাবার পর বারান্দায় বসে ফেলুদা ওর সবুজ খাতায় কিছু নোট লিখল।

সেটা শেষ হলে পর এইরকম দাঁড়াল—

- ১। মহেশ চৌধুরী—জন্ম ২৩শে নভেম্বর ১৯০৭, মৃত্যু ২৪শে নভেম্বর ১৯৭৭ (স্বাভাবিক হার্ট অ্যাটাক? শক?)। হেঁয়ালিপ্রিয়। ডাকটিকিট, প্রজাপতি, পাথর। দোরাবজীর দেওয়া মূল্যবান স্ট্যাম্প অ্যালবাম লোপাট (how?) মেজো ছেলের প্রতি টান। অন্য দুটির প্রতি মনোভাব কেমন? শঙ্করলালের প্রতি অপত্য স্নেহ। স্নবারি ছিল না। অতীতে মেজাজী, মদ্যপ। শেষ বয়সে সাঙ্ঘিক, সদাশয়। অভিষাপ কেন?
- ২। ঐ স্ত্রী—মৃত্যু। করে?
- ৩। ঐ বড় ছেলে অরুণেন্দ্র—জন্ম (আন্দাজ) ১৯৩৬। অত্র ব্যবসায়ী। কলকাতা-হাজারিবাগ যাতায়াত। মুগয়াপ্রিয়। স্বল্পভাষী।
- ৪। ঐ মেজো ছেলে বীরেন্দ্র—জন্ম (আন্দাজ) ১৯৩৯। ‘অগ্নিস্কুলিঙ্গ’। ১৯ বছর বয়সে দেশ-ছাড়া। কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের ভক্ত। বাপকে বিদেশ থেকে চিঠি লিখত ‘৬৭ পর্যন্ত। জীবিত? মৃত? বাপের ধারণা সে ফিরে এসেছে?

- ৫। ছোট ছেলে প্রীতীন্দ্র—অরুণের সঙ্গে ব্যবধান অন্তত ৯-১০ বছর (ভিত্তি: ফ্যামিলি গ্রুপ)। অর্থাৎ জন্ম (আন্দাজ) ১৯৪৫। ইলেকট্রনিকস। পাখির গান। মিশুকে নয়। কথা বললে বেশি বলে, নিজের বিষয়। টেপ রেকর্ডার ফেলে এসেছিল রাজরাপ্রায়।
- ৬। প্রীতীনের স্ত্রী নীলিমা—বয়স ২৫/২৬। সহজ, সপ্রতিভ।
- ৭। অখিল চক্রবর্তী—বয়স আন্দাজ ৭০। এক্স-স্কুলমাস্টার। মহেশের বন্ধু। ভাগ্য গণনা, আয়ুর্বেদ।
- ৮। শঙ্করলাল মিশ্র—জন্ম (আন্দাজ) ১৯৩৯। বীরেনের সমবয়সী। মহেশের দারোয়ান দীনদয়ালের ছেলে। দীনদয়ালের মৃত্যু ১৯৪৩। প্রশ্ন—জঙ্গলে গিয়েছিল কেন? শঙ্করকে মানুষ করেন মহেশ। বর্তমানে বইয়ের দোকানের মালিক। মহেশের মৃত্যুতে মুহুমান।
- ৯। নূর মহম্মদ—বয়স ৭০-৮০। চল্লিশ বছরের উপর মহেশের বেয়ারা। ফেলুদা ঠিকই আন্দাজ করেছিল। দুপুরে খাওয়ার পর কৈলাসে গিয়ে শুনলাম সকালে অনেকেই এসেছিলেন, কিন্তু একটা নাগাদ সবাই চলে গেছেন। বৈঠকখানায় মহেশবাবুর দুই ছেলে আর অখিলবাবু ছিলেন, আমরা সেখানেই বসলাম। প্রীতীনবাবুর অস্থির ভাবটা যেন আরো বেড়ে গেছে; একটা আলাদা সোফার এক কোণে বসে খালি হাত কচলাচ্ছেন। অখিলবাবু মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন আর মাথা নাড়ছেন। অরুণবাবু যথারীতি গভীর ও শান্ত। ফেলুদা তাঁকেই প্রশ্নটা করল।

‘আপনারা কি কিছুদিন আছেন?’

‘কেন বলুন তো?’

‘আপনাদের একটু সাহায্যের দরকার। মহেশবাবু একটা কাজের ভার দিয়ে গেছেন আমাকে, কী কাজ সেটা অবিশ্যি স্পষ্ট করে বলার ক্ষমতা ছিল না তাঁর। আমি প্রথমে জানতে চাই—উনি কী বলতে চেয়েছিলেন সেটা আপনারা কেউ বুঝেছেন কিনা।’

অরুণবাবু একটু হেসে বললেন, ‘বাবার সুস্থ অবস্থাতেই তাঁর অনেক সংকেত আমাদের বুঝতে বেশ অসুবিধা হত। রাশভারী লোক হলেও ওঁর মধ্যে একটা ছেলেমানুষী দিক ছিল সেটার কিছুটা আভাস হয়ত আপনিও পেয়েছেন। আমার মনে হয় বাবা শেষ অবস্থায় যে কথাগুলো বললেন সেটার উপর বেশি গুরুত্ব না দেওয়াই ভালো।’

ফেলুদা বলল, ‘আমার কাছে নির্দেশগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ অর্থহীন বলে মনে হয়নি।’

‘তাই বুঝি?’

‘হ্যাঁ । তবে সব সংকেত ধরতে পেরেছি এটা বলতে পারব না । যেমন ধরুন, মুক্তানন্দের ছবি ।’ ফেলুদা অখিলবাবুর দিকে ফিরল । ‘আপনি ওটা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছু বলতে পারেন । ছবিটা তো বোধহয় আপনারই দেওয়া ।’

অখিলবাবু বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন, ‘হ্যাঁ, আমারই দেওয়া । মুক্তানন্দ রাঁচিতে এসেছিলেন একবার । আমার তো এসবের দিকে একটু ঝোঁক আছেই চিরকাল । বেশ জেনুইন লোক বলে মনে হয়েছিল । আমি মহেশকে ঠাট্টা করে বলেছিলাম—তুমি তো কোনোদিন সাধু-সন্ন্যাসীতে বিশ্বাস-টিস্থাস করলে না, শেষ বয়সে একটু এদিকে মন দাও না । তোমাকে একটা ছবি এনে দেব । ঘরে রেখে দিও । মুক্তানন্দের প্রভাব খারাপ হবে না । তিনটি মহাদেশে ঐর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে, না হয় তোমার উপরেও একটু পড়ল । —তা সে ছবি যে সে তার খাটের পাশে রেখে দিয়েছে সেটা কালই প্রথম দেখলাম । অসুখের আগেতোওর শোবার ঘরে যাইনি কখনো ।’

‘আপনি ওটা সম্বন্ধে জানেন কিছু ?’ ফেলুদা অরুণবাবুকে প্রশ্ন করল ।

অরুণবাবু মাথা নাড়লেন । ‘ও জিনিসটা যে বাবার কাছে ছিল সেটাই জানতাম না । বাবার শোবার ঘরে আমিও কালই প্রথম গেলাম ।’

‘আমিও জানতাম না ।’—প্রীতীনবাবুকে কিছু জিগ্যেস করার আগেই তিনি বলে উঠলেন ।

ফেলুদা বলল, ‘দুটো জিনিস পেলে আমার কাজের একটু সুবিধা হতে পারে ।’

‘কী জিনিস ?’ অরুণবাবু জিগ্যেস করলেন ।

‘প্রথমটা হল—মহেশবাবুকে লেখা তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের চিঠি ।’

‘বীরেনের চিঠি ?’ অরুণবাবু অবাক । ‘বীরেনের চিঠি দিয়ে ‘কী হবে ?’

‘আমার বিশ্বাস ওই ছবিটা মহেশবাবু বীরেনকে দেবার জন্য দিয়েছিলেন আমাকে ।’

‘হাউ স্ট্রেঞ্জ ! এ ধারণা কী করে হল আপনার ?’

ফেলুদা বলল, ‘ছবিটা আমাকে দিয়ে মহেশবাবু দুটো আঙুল দেখিয়েছিলেন সেটা আপনারাও দেখেছিলেন ; একটা সম্ভাবনা আছে যে দুই আঙুল মানে দুরি । আমার ভুল হতে পারে, কিন্তু আপাতত এই বিশ্বাসেই আমাকে কাজ চালিয়ে যেতে হবে ।’

‘কিন্তু বীরেনকে আপনি পাচ্ছেন কোথায় ?’

‘ধরুন মহেশবাবু যদি ঠিকই দেখে থাকেন ; যদি সে এখানে এসে থাকে ।’

অরুণবাবু তাঁর বাপের মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন ।

‘বাবা গত পাঁচ বছরে কতবার বীরেনকে দেখেছেন তা আপনি জানেন ? বিশ বছর যে ছেলে বিদেশে, বাবা তাঁর দুর্বল দৃষ্টি দিয়ে তাকে এক ঝলক দেখেই চিনে

ফেলবেন এটা আপনি ভাবছেন কী করে ?’

‘আপনি ভুল করছেন অরুণবাবু, আমি নিজে একবারও ভাবছি না যে বীরেনবাবু ফিরে এসেছেন । কিন্তু তিনি যদি দেশের বাইরেও কোথাও থেকে থাকেন, তাহলেও আমার দায়িত্ব দায়িত্বই থেকে যায় । তিনি কোথায় আছেন জেনে জিনিসটা তাঁর হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে ।’

অরুণবাবু একটু নরম হয়ে বললেন, ‘বেশ । আপনি দেখবেন বীরেনের চিঠি । বাবা সব চিঠি এক জায়গায় রাখতেন । বীরেনের চিঠিগুলো আলাদা করে বেছে রাখব ।’

‘ধন্যবাদ’, বলল ফেলুদা, ‘আর দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে—মহেশবাবুর ডায়রি । সম্ভব হলে সেগুলোও একবার দেখব ।’

আমি ভেবেছিলাম অরুণবাবু এতে আপত্তি করবেন, কিন্তু করলেন না । বললেন, ‘দেখতে চান দেখতে পারেন । বাবা তাঁর ডায়রির ব্যাপারে কোনো গোপনতা অবলম্বন করতেন না । তবে আপনি হতাশ হবেন, মিঃ মিস্ত্রি ।’

‘কেন ?’

‘বাবার মতো ওরকম নীরস ডায়রি আর কেউ লিখেছে কিনা জানি না । অত্যন্ত মামুলি তথ্য ছাড়া আর কিছু নেই ।’

‘হতাশ হবার ঝুঁকি নিতে আমার আপত্তি নেই ।’

চিঠির ব্যাপারে ঠিক হল অরুণবাবু আর প্রীতীনবাবু ভাইয়ের গুলো বেছে আলাদা করে রাখবেন, সেগুলো কাল সকালে ফেলুদাকে দেওয়া হবে । ডায়রিগুলো আজই নিয়ে যাব আমরা, আর কালই ফেরত দিয়ে দেব । বুঝলাম ফেলুদাকে আজ রাত জাগতে হবে, কারণ ডায়রির সংখ্যা চল্লিশ ।

তিনজনে ভাগাভাগি করে খবরের কাগজে মোড়া মহেশ চৌধুরীর ডায়রির সাতটা প্যাকেট নিয়ে কৈলাসের কাঁকরবিছানো পথ দিয়ে যখন ফটকের দিকে যাচ্ছি, তখন দেখলাম জোড়া-মৌমাছি তার বিলিতি ডল হাতে নিয়ে বাগানে ঘোরাফেরা করছে । পায়ের শব্দে সে হাঁটা থামিয়ে আমাদের দিকে ঘুরে দেখল । তারপর বলল, ‘দাদু আমাকে বলেনি ।’

হঠাৎ এমন একটা কথায় আমরা তিনজনেই থেমে গেলাম ।

‘কী বলেনি দাদু ?’ ফেলুদা জিগ্যেস করল ।

‘কী ঝুঁজছিল বলেনি ।’

‘কবে ?’

‘পরশু তরশু নরশু !’

‘তিনদিন ?’

‘একদিন ।’

‘কী হয়েছিল বল তো ।’

বিবি দূরে দাঁড়িয়েই চৈচিয়ে কথা বলছে, যদিও তার মন পুতুলের দিকে । সে পুতুলের মাথায় গোঁজার জন্য বাগান থেকে ফুল নিতে এসেছে । ফেলুদার প্রশ্নের উত্তরে বলল, ‘দাদুর যে ঘর আছে দোতলায়, যেখানে টেবিল আছে, বই আছে, আর সব জিনিস-টিনিস আছে, সেইখানে খুঁজছিল দাদু ।’

‘কী খুঁজছিলেন ?’

‘আমি তো জিগ্যেস করলাম । দাদু বলল, কী পাচ্ছি না, কী খুঁজছি ।’

‘আবোল তাবোল বকছে, মশাই,’ চাপা গলায় বললেন লালমোহনবাবু ।

‘আর কিছু বলেননি দাদু ?’ ফেলুদা জিগ্যেস করল ।

‘দাদু বলল এটা হেঁয়ালি, পরে মানে বলে দেব, এখন খুঁজতে দাও । তারপর আর বলল না দাদু । দাদু মরে গেল ।’

ইতিমধ্যে ডলের মাথায় ফুল গোঁজা হয়ে গেছে, বিবি বাড়ির দিকে চলে গেল, আর আমরাও হলাম বাড়িমুখো ।

॥ ৭ ॥

ফেলুদা এখন মহেশ চৌধুরীর ডায়রি নিয়ে বসবে, তাকে ডিসটার্ব না করাই ভালো, তাই আমরা দুজনে চারটে নাগাদ চা খেয়ে একটু ঘুরব বলে গাড়িতে করে বেরিয়ে পড়লাম । লালমোহনবাবুর ধারণা শহরের দিকে গেলে হয়ত সুলতানের লেটেষ্ট খবর পাওয়া যেতে পারে ।—‘মহেশ চৌধুরীর মৃত্যুর ব্যাপারে তোমার দাদা যতই রহস্যের গন্ধ পেয়ে থাকুন না কেন, আমার কাছে বাঘ পালানোর ঘটনাটা অনেক বেশি রোমাঞ্চকর ।’

বাঘের খবর পেতে বেশি দূর যেতে হল না । পেট্রোল নেবার দরকার ছিল, মেন রোডে বৃজভূষণ তেওয়ারীর পেট্রোল পাম্পের সামনে ভিড় দেখেই বুঝলাম বাঘের আলোচনা হচ্ছে, কারণ একজন ভদ্রলোক থাবা মারার ভঙ্গি করলেন কথা বলতে বলতে ।

লালমোহনবাবু গাড়ি থেকে নেমে সটান এগিয়ে গেলেন জটলার দিকে । ভদ্রলোক এককালে রাজস্থান যাবেন বলে বই পড়ে কিছুটা হিন্দী শিখেছিলেন. কিন্তু এখন সেটা ফেলুদার ভাষায় আরার শ্বেম্বালের স্ট্যান্ডার্ডে নেমে গেছে । তার মানে কেয়া ছয়া-র বেশি এগোনো মুশকিল হয় । তবু ভালো, ভিড়ের মধ্যে একজন বাঙালী বেরিয়ে গেল । তার কাছেই জানলাম যে হাজারিবাগের পূর্বে বিষ্ণুগড়ের

দিকে একটা বনের মধ্যে নাকি সুলতানকে পাওয়া গিয়েছিল । ট্রেনার চন্দ্রনের সঙ্গে বনবিভাগের শিকারী নাকি বাঘটার দিকে এগিয়ে যায় । একটা সময় মনে হয়েছিল যে বাঘটা ধরা দেবে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেটা চন্দ্রনকে একটা থাবা মেয়ে পালিয়ে যায় । গুলিও চলেছিল, কিন্তু বাঘটা জখম হয়েছে কিনা জানা যায়নি । চন্দ্রন অবিশ্যি জখম হয়েছে, তবে তেমন গুরুতরভাবে নয় । সে এখন হাসপাতালে ।

লালমোহনবাবু বললেন, ‘কাণ্ডারিকারের কোনো খবর জানেন ?’

এটা শুধরাতেই হল । বললাম, ‘কাণ্ডারিকার নয়, কারাণ্ডিকার—যিনি বাঘের আসল ট্রেনার ।’

ভদ্রলোক বললেন তার খবর জানেন না, তবে এটা জানেন যে বাঘের অভাবে নাকি সার্কাসের বিক্রি কিছুটা কমেছে ।

বাঘের দিকে গুলি চলেছে জেনে কারাণ্ডিকারের মনোভাব কী হল সেটা জানার জন্য ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল আমাদের দুজনেরই, তাই পেট্রোল নিয়ে সোজা চলে গেলাম গ্রেট ম্যাজেস্টিকে ।

ফেলুদা সঙ্গে থাকলে দেখেছি লালমোহনবাবু নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে কিছু করতে সাহস পান না ; আজ দেখলাম সোজা গেটে গিয়ে বললেন, ‘পুট মি থু টু মিস্টার কুট্রি প্লীজ ।’ গেটের লোকটা কী বুঝল জানি না । হয়ত সেদিন আমাদের চিনে রেখেছিল, তাই আর কিছু জিগ্যেস না করে আমাদের ঢুকতে দিল, আর আমরাও সোজা গিয়ে হাজির হলাম মিঃ কুট্রির ক্যারাভানে ।

কুট্রির কাছে যে খবরটা পেলাম সেটাকেও একটা হেঁয়ালি বলা চলে ।

কারাণ্ডিকার নাকি কাল রাত থেকে হাওয়া ।

‘দুদিন থেকেই পাবলিক আবার বাঘের খেলা ডিমান্ড করতে শুরু করেছে,’ বললেন মিঃ কুট্রি । ‘আমি নিজে কারাণ্ডিকারের কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়েছি । বলেছি সে ছাড়া আর কেউ বাঘ ট্রেন করবে না । কিন্তু তাও সে না বলে চলে গেল । এর মধ্যেও দু-একদিন বেরিয়েছে, কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আবার ফিরে এসেছে । কিন্তু আজ সে এখনও ফিরল না ।’

খবরটা শুনে সার্কাসের বাইরে বেরিয়ে এসে লালমোহনবাবু বললেন, ‘সুলতান-ক্যাপচারের দৃশ্য আর দেখা হল না, তপেশ । এমন সুযোগ আর আসবে না ।’

আমরাও মনটা খারাপ লাগছিল, তাই ঠিক করলাম গাড়িতে করে কোথাও একটু বেড়িয়ে আসব । উত্তরে যাব না দক্ষিণে যাব—অর্থাৎ কানারি হিলের দিকে যাব না রামগড়ের দিকে যাব—সেটা ঠিক করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত টস্ করলাম । দক্ষিণ পড়ল । লালমোহনবাবু বললেন, ‘ওদিকটাতেও একটা পাহাড়

আছে, সেদিন যাবার পথে দেখেছি। খাসা দৃশ্য।’

দৃশ্য ভালো ঠিকই, কিন্তু এগারো কিলোমিটারের পোস্টটা পেরিয়ে কিছু দূর গিয়েই একটা কালভার্টের ধারে যে ঘটনাটা ঘটল, সেটাকে মোটেই ভালো বলা চলে না।

মাত্র ছ’মাস আগে কেনা লালমোহনবাবুর অ্যাসাসডর বার তিনেক হেঁচকি তুলে মিনিটখানেক গো স্নো করে অবশেষে বেমালুম ধর্মঘটের দিকে চলে গেল। ‘বোধহয় তেল টানচে না’, বললেন হরিপদবাবু।

ঘড়িতে পাঁচটা কুড়ি। সূর্য আকাশের নিচের দিকে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না, কারণ পশ্চিমে দূরে শালবনের মাথার উপর মেঘ জমে আছে।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে কালভার্টের উপর গিয়ে বসলাম, হরিপদবাবু গাড়ি নিয়ে পড়লেন। লালমোহনবাবুকে এ ব্যাপারে পুরোপুরি ড্রাইভারের উপর নির্ভর করতে হয়, কারণ উনি গাড়ি সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। উনি বলেন, ‘আমার নিজের পায়ের ভেতর কটা হাড় আছে কটা মাসল আছে না জেনে যখন দিব্যি চলে ফিরে বেড়াচ্ছি, তখন গাড়ির ভেতর কী কলকজা আছে সেটা জানার কী নেসেসিটি ভাই?’

মেঘের গায়ে নিচের দিকে একটা খড়খড়ির মধ্যে দিয়ে একটবার উঁকি দিয়ে সূর্যদেব যখন আজকের মতো ছুটি নিলেন, হরিপদবাবু সেই সময় জানালেন যে তিনি রেডি—‘চলে আসুন, স্যার।’

কালভার্ট থেকে উঠে আরেকবার ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি পাঁচটা তেত্রিশ। সময়টা জরুরী, কারণ ঠিক তখনই আমরা দেখলাম সুলতানকে।

খবরটা আরো অনেক নাটকীয়ভাবে দিতে পারতাম, কিন্তু ফেলুদা বলে এটাই ঠিক।—‘গাদাগুচ্ছের মর্চে-ধরা বিশেষণ আর তথাকথিত লোম-খাড়া-করা শব্দ ব্যবহার না করে চোখে যা দেখলি সেইটে ঠিক ঠিক সোজাসুজি বলে গেলে কাজ দেবে ঢের বেশি।’ আমিও সেটাই করার চেষ্টা করছি।

খাঁচার বাইরে বাঘ এর আগেও একবার দেখেছি, যোটার কথা রয়েল বেঙ্গল রহস্যে আছে। কিন্তু সেখানে আমাদের সঙ্গে আরো অনেক লোক ছিল। শিকারী আর বন্দুকতোছিলই, সবচেয়ে বড় কথা—ফেলুদা ছিল। তার উপরে আমি আর লালমোহনবাবু ছিলাম গাছের উপর, বাঘের নাগালের বাইরে। এখানে আমরা তিনজন দাঁড়িয়ে আছি খোলা রাস্তায়, যার দুদিকে বন, অদূরে একটা পাহাড়, যাতে ভল্লুক আছেই, আর সময়টা সন্ধ্যা। এই সময় এই অবস্থায় আমাদের থেকে হাত পঞ্চাশেক দূরে পশ্চিম দিকের বন থেকে বেরিয়ে বাঘটা রাস্তার উপর উঠল। আমরা তিনজনে ঠিক একসঙ্গে একই সময় বাঘটা দেখেছি, কারণ আমার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দুজনও ঠিক সেইভাবেই কাঠ হয়ে গেল। হরিপদবাবুর বাঁ হাতটা

গাড়ির দরজার দিকে বাড়িয়েছিলেন, সেই বাড়ানোই রয়ে গেল; লালমোহনবাবু নাক ঝাড়বেন বলে ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীটা নাকের দুপাশে ধরে শরীরটা একটু সামনের দিকে ঝুকিয়েছিলেন, তিনি সেই ভাবেই রয়ে গেলেন; আমি ধুলো ঝাড়বার জন্য আমার ডান হাতটা আমার জীনসের পিছন দিকে নিয়েছিলাম, তার ফলে শরীরটা একটু বেঁকে গিয়েছিল, বাঘটা দেখার ফলে শরীরটা সেইরকম বেঁকেই রইল।

রাস্তায় উঠে বাঘটা ঠিক চার পা গিয়ে থেমে গেল। তারপর মাথাটা ঘোরালো আমাদের দিকে।

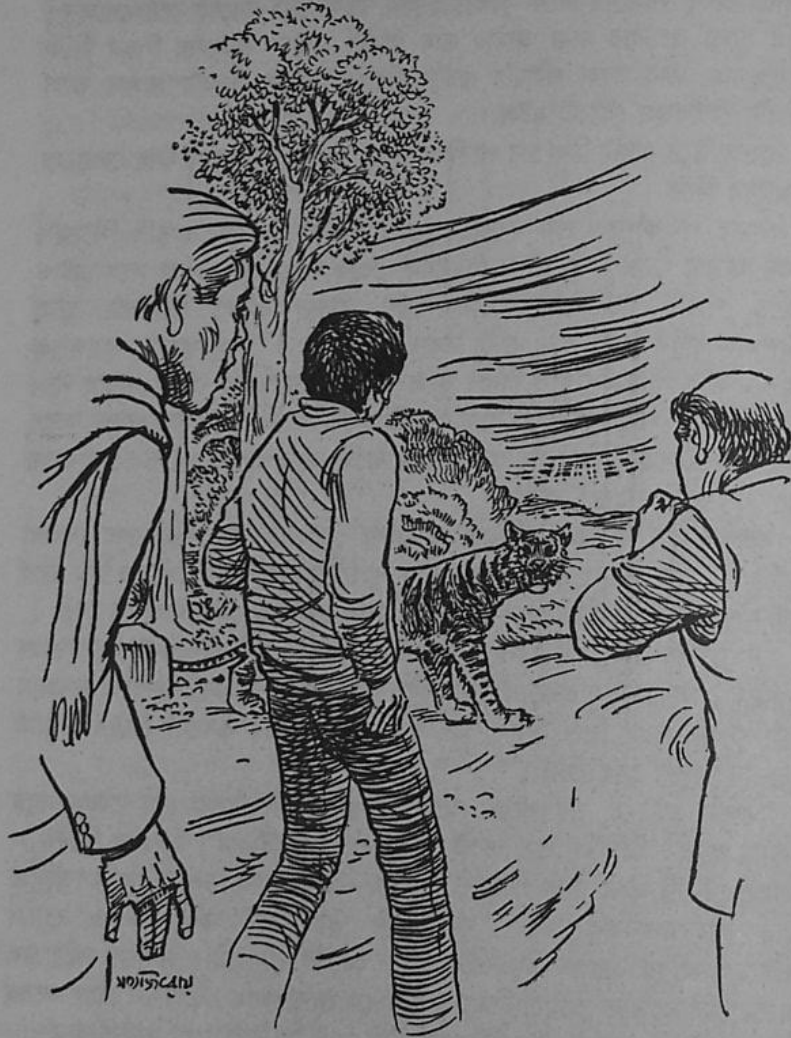
আমার পা কাঁপতে শুরু করেছে, বৃকের ভিতরে কে যেন হাতুড়ি পিটছে। অথচ আমার চোখ কিছুতেই বাঘের দিক থেকে সরছে না। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝতে পারছি যে আমার ডান পাশে আবছা কালো জিনিসটা হচ্ছে লালমোহনবাবুর মাথা, আর সেটা ক্রমশ নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। আন্দাজে বুঝলাম তাঁর পা অবশ্য হয়ে যাবার ফলে শরীরের ভার আর বইতে পারছে না। এটাও বুঝতে পারছিলাম যে আমার দৃষ্টিতে কী জানি গুণ্ডগোল হচ্ছে, কারণ বাঘের আউটলাইনটা বার বার ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, আর গায়ের কালো ডোরাগুলো স্থির না থেকে ভাইব্রেট করছে।

সুলতান যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আমাদের দেখল সেটার আন্দাজ দেওয়া মুশকিল। মনে হচ্ছিল সময়টা অফুরন্ত। লালমোহনবাবু পরে বললেন কম করে আট-দশ মিনিট; আমার মতে আট-দশ সেকেন্ড, কিন্তু সেটাও যথেষ্ট বেশি।

দেখা শেষ হলে পর মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে আরো চার পা ফেলে বাঘ রাস্তা পেরিয়ে গেল। সাহস একটু বাড়তে ধীরে ধীরে ডান দিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম শাল সেগুন সরল শিশু শিমুল আর আরো অনেক সব শুকনো গাছের জঙ্গলে সুলতান অদৃশ্য হয়ে গেল।

আশ্চর্য এই যে, এর পরেও আমরা অন্তত মিনিটখানেক (লালমোহনবাবুর বর্ণনায় পনেরো মিনিট) প্রায় একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর তিনজনে কেবল তিনটে কথা বলে গাড়িতে উঠলাম—হরিপদবাবু ‘চলুন’, আমি ‘আসুন’ আর লালমোহনবাবু ‘ছঃ’। খুব বেশি ভয় নিয়ে কথা বলতে গেলে লালমোহনবাবুর এরকম হয় এটা আমি আগেই দেখেছি। ডুর্যসে মহীতোষ সিংহরায়ের বাড়িতে আমরা তিনজন একঘরে শুয়েছিলাম। একদিন রাতে ঘরের বন্ধ দরজাটা হাওয়াতে খট খট করায় উনি ‘কে’ না বলে ‘খে’ বলেছিলেন।

হরিপদবাবুর নার্ভটা দেখলাম মোটামুটি ভালো। ফেরার পথে স্টিয়ারিং হুইলে হাতটাত কাঁপেনি। উনি নাকি এর আগেও রাস্তায় বাঘ দেখেছেন, জামসেদপুরে ড্রাইভারি করার সময়।



বাড়ি ফিরে দেখি ফেলুদা তখনো মহেশবাবুর ডায়রিতে ডুবে আছে। আমার মনে হচ্ছিল সুলতানের খবরটা লালমোহনবাবু দিতে পারলে খুশি হবেন, তাই আমি আর কিছু বললাম না। ভদ্রলোক লেখেন-টেখেন বলেই বোধহয় সরাসরি খবরটা না দিয়ে একটু পায়তারা কষে নিলেন। বার দু-তিন হুঁ হুঁ করে কী একটা গানের সুর ভেঁজে নিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, তপেশ, বাঘের পায়ের তলায় বোধহয় প্যাডিং থাকে, তাই না?'

আমি মজা দেখছি; বললাম, 'তাই তো শুনেছি।'

'নিশ্চয়ই তাই; নইলে এত কাছ দিয়ে গেল আর কোনো শব্দ হল না?'

লালমোহনবাবুর পায়তারা কিন্তু মাঠে মারা গেল। ফেলুদা আমাদের দিকে চাইলও না, কেবল একটা ডায়রি সরিয়ে রেখে আরেকটা হাতে নিয়ে বলল, 'আপনারা যদি বাঘটাকে দেখে থাকেন, তাহলে ক'টার সময় কোন্‌খানে দেখেছেন সেটা বন বিভাগে ফোন করে জানিয়ে দেওয়া উচিত ইমিডিয়েটলি।'

লালমোহনবাবু বললেন, 'টাইম পাঁচটা তেত্রিশ, লোকেশন রামগড়ের রাস্তায় এগারো কিলোমিটারের পোস্টের পরের কালভার্টের কাছে।'

'বেশ তো পাশের ঘরে ডিরেকটরি রয়েছে, আপিসে এখন কেউ নেই, আপনি একেবারে ডি-এফ-ওর বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিন। ওদের উপকার হবে।'

'আচ্ছা, হুঁ, তাহলে....' লালমোহনবাবু দেখলাম মাসলগুলোকে টান করে নিচ্ছেন।—'কীভাবে পুট করা যায় ব্যাপারটা? ইংরিজিতেই বলব তো;'

'হিন্দি ইংরিজি যেটায় বেশি দখল তাতেই বলবেন।'

'দি টাইগার হুইচ এস্কেপ্‌ড ফ্রম দি....এস্কেপ্‌ডই বলব তো?'

'সহজ করে নিয়ে র্যান অ্যাওয়ে বলতে পারেন।'

'এস্কেপটা বোধহয় ম্যানেজ করতে পারব।'

'তাহলে তাই বলুন।'

নম্বর বার করে দিলাম আমি। ফোনটাও বোধহয় আমি করলেই ভালো হত, কারণ লালমোহনবাবু 'দি সার্কাস হুইচ এস্কেপ্‌ড ফ্রম দি গ্রেট ম্যাজেস্টিক টাইগার—থুডি', বলে থেমে গেলেন। ভাগ্যিস ভদ্রলোক কথাটা খুব চোঁচিয়ে বলেছিলেন। ফেলুদা পাশের ঘর থেকে শুনতে পেয়ে দৌড়ে এসে টেলিফোনটা ওঁর হাত থেকে ছিনিয়ে খবরটা নিজেই দিয়ে দিল।

ফেলুদার ঘরেই চা এনে দিল বুলাকিপ্রসাদ। আমরা আসার আগেই বাঘের হাতে চন্দ্রনের জখম হবার খবরটা ফেলুদা বুলাকিপ্রসাদের কাছে পেয়ে

গিয়েছিল। ফেলুদার ধারণা কারাণ্ডিকার ছাড়া এই বাঘ জ্যান্ত ধরার সাধ্যি কারুর নেই।

লালমোহনবাবু গরম চায়ে একটা সশব্দ চুমুক দিয়ে বললেন, 'কিছু পোলেন ও ডায়রিটে ? নাকি অরুণবাবুর কথাই ঠিক ?'

'আপনিই বলুন না।'

ফেলুদা একটা ডায়রি খুলে লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে দিল।

লালমোহনবাবু পড়লেন 'Self elected President of club—meeting on 8.4.46'—তারপর আরেকটা পাতা খুলে পড়লেন—Tea Party at Brig. Sudarshan's আর তার পরের পাতায়—'Trial for new suit at Shakur's—4 P.M.....কী মশাই, এসব খুব তাৎপর্যপূর্ণ বুঝি ?'

'তোপসে, তোর কী মনে হয় ?'

আমি লালমোহনবাবুর পিছন দিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখছিলাম, এবার ডায়রিটা হাতে নিয়ে নিলাম। 'আলোর কাছে আন', বলল ফেলুদা।

টেবিল ল্যাম্পের নিচে ডায়রিটা ধরে চোখটা কাছে নিতেই একটা শিহরন খেলে গেল আমার শিরদাঁড়ায়।

বেশ বড় সাইজের ডায়রি, তার পাতার মাঝখানে ফাউনটেন পেনে ইংরিজিতে লেখা ছাড়াও অন্য লেখা রয়েছে যেটা প্রায় চোখে দেখা যায় না। পাতার একেবারে উপর দিকে ছাপা তারিখেরও উপরে, খুব সফ করে কাটা হার্ড পেনসিল দিয়ে খুদে খুদে অক্ষরে হালকা লেখা।

'কী দেখলি ?'

'বাংলা লেখা।'

'কী লেখা ?'

'এই পাতাটায় লেখা—“পাঁচের বশে বাহন ধবংস”।'

'সর্বনাশ', বললেন লালমোহনবাবু, 'এ যে আবার হেঁয়ালি দেখছি মশাই।'

'তাতো বটেই', বলল ফেলুদা, 'এবার এটা দেখুন। এটা ১৯৩৮ অর্থাৎ প্রথম বছরের ডায়রি, আর এটাই পেনসিলে প্রথম সাংকেতিক লেখা।'

১৯৩৮-এর ডায়রির প্রথম পাতাতেই লিখেছেন ভদ্রলোক "শস্ত্র দুই-পাঁচের বশ।"

'শস্ত্রটি কে ?' লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

ফেলুদা বলল, 'ভদ্রলোক নিজের বিষয় বলতে গেলে সব সময়ই শিবের কোনো না কোনো একটা নাম ব্যবহার করেছেন।'

'শিবের নামতো হল, কিন্তু দুই-পাঁচের বশ তো বোঝা গেল না।'

'রিপু বোঝেন ?' জিগ্যেস করল ফেলুদা।

'মানে হেঁড়া কাপড় সেলাই-টেলাই করা বলছেন ?'

'আপনি ফারসী-সংস্কৃত গুলিয়ে ফেলছেন, লালমোহনবাবু ! আপনি যেটা বলছেন সেটা হল রিফু। আমি বলছি রিপু।'

'ওহো—যড়রিপু ? মানে শত্রু ?'

'শত্রু। এবার মানুষের এই ছটি শত্রুর নাম করুন তো ?'

'ভেরি ইজি। কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহ মাৎসর্য।'

'হল না। অর্ডারে ভুল। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য। অর্থাৎ দুই আর পাঁচ হল ক্রোধ আর মদ।'

'ওয়ান্ডারফুল !' বললেন লালমোহনবাবু, 'এ তো মিলে যাচ্ছে মশাই !'

'এবার তাহলে প্রথমটা আরেকবার দেখুন, এটাও মিলে যাবে।'

এবারে আমার কাছেও ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেছে। বললাম, 'বুঝেছি, দুইয়ের বশে বাহন ধবংস হচ্ছে, রাগের মাথায় গাড়ি ভাঙা।'

'ভেরি গুড', বলল ফেলুদা, 'তবে দুই-পাঁচ নিয়ে একটা সংকেতের এখনো সমাধান হয়নি।'

যে ডায়রিগুলো দেখা হয়ে গেছে, সেগুলোর বিশেষ বিশেষ জায়গায় কাগজ গুঁজে রেখেছে ফেলুদা। তারই একটা জায়গা খুলে আমাদের দেখালো। লেখাটা হচ্ছে— $2+5=X$ ।

লালমোহনবাবু বললেন, 'এক্স তো মশাই আননোন কোয়ান্টিটি। ওটা বাদ দিন। আর, সব সংকেতেরই যে একটা গুরুত্বপূর্ণ মানে থাকবে সেটাই বা ভাবছেন কেন ?'

ফেলুদা বলল, 'যেখানে একটা লোক বছরে তিনশ পঁয়ষটি দিনে মাত্র পনেরো-বিশ দিন সংকেতের আশ্রয় নিয়েছে, সেখানে কারণটা যে জরুরী তাতো বোঝাই যাচ্ছে। কাজেই X-এর রহস্য আমাকে উদঘাটন করতেই হবে।'

'ওই তারিখের কাছাকাছি কোনো লেখা থেকে কোনো হেল্প পাচ্ছেন না ?'

'ওর দশ দিন পরে আরেকটা সংকেত আছে। দেখুন—'

এটাও আমার কাছে অসম্ভব কঠিন বলে মনে হল। লেখাটা হচ্ছে—'অনর্গল—ঘৃতকুমারী'।

ফেলুদা বলল, 'লোকটা যে কথা নিয়ে কী না করেছে তাই ভাবছি।'

'আপনি ধরে ফেলেছেন ?'

'আপনিও পারবেন—একটু হেল্প করলে।'

'ঘৃতকুমারী তো কবরেজীর ব্যাপার মশাই,' বললেন লালমোহনবাবু।

'হ্যাঁ,' বলল ফেলুদা, 'ঘৃতকুমারীর তেল মাথায় মাখলে মাথা ঠাণ্ডা রাখে।'

অর্থাৎ রাগ কমায় ।’

‘কিন্তু তেল অনর্গল মাখতে হয় এতো জানতুম না মশাই ।’

ফেলুদা হেসে বলল, ‘আপনি ড্যাশটা অগ্রাহ্য করছেন কেন ? ওটারও একটা মানে আছে । আর অর্গল মানে জানেন তো ?’

‘কপাট । খিল ।’

‘এবার ওই দ্বিতীয় মানেটার সঙ্গে একটা নেগেটিভ জুড়ে দিন ।’

‘অখিল !’ আমি চেষ্টা করে উঠলাম । ‘তার মানে অখিলবাবু ঠুঁকে ঘটকুমারী ব্যবহার করতে বলেছিলেন ।’

‘শাবাশ । এবার পরেরটা দ্যাখ ।’

তিন পাতা পরে পড়ে দেখলাম—‘আজ থেকে পাঁচ বাদ ।’ তার মানে মহেশবাবু মদ ছেড়ে দিলেন । কিন্তু তার এক মাস বাদেই মহেশবাবু লিখছেন—‘ভোলানাথ ভোলে না । আবার পাঁচ । পাঁচেই বিশ্বাসিত ।’

ফেলুদা বলল, ‘কিছু একটা ভুলে থাকার জন্য মহেশবাবু আবার মদের আশ্রয় নিয়েছেন । প্রশ্ন হচ্ছে—কী ভুলতে চাইছেন ?’

লালমোহনবাবু আর আমি মাথা চুলকোলাম । মহেশবাবু বলেছিলেন তাঁর জীবনে অনেক রহস্য । এখন মনে হচ্ছে কথাটা ঠাট্টা করে বলেননি ।

ফেলুদা আরেকটা জায়গায় ডায়েরিটা খুলে বলল, ‘এটা খুব মন দিয়ে পড়ে দেখুন । কথা নিয়ে খেলার একটা আশ্চর্য উদাহরণ । অনেক তথ্য, অনেক জটিল মনের ভাব এই কয়েকটি কথার মধ্যে পুরে দেওয়া হয়েছে ।’

আমরা পড়লাম—‘আমি আজ থেকে পালক । পালক = feather = হাল্কা । পালক = পালনকর্তা । আজ থেকে শমির ভার আমার । শমি আমার মুক্তি ।’

শমি যে শঙ্করলাল মিশ্র সেটা আমি বুঝতে পারলাম । ফেলুদা বলল, ‘শঙ্করলালকে মানুষ করার ভার বহন করতে পেরে মহেশবাবুর মন থেকে একটা ভার নেমে গেছে । এই ভারটা কিসের ভার সেইটে জানা দরকার ।’

ফেলুদা খাট থেকে উঠে কিছুক্ষণ চিন্তিত ভাবে পায়চারি করল । আমি ডায়েরিগুলোর দিকে দেখছিলাম । কী অদ্ভুত লোক ছিলেন এই মহেশ চৌধুরী । বেঁচে থাকলে ফেলুদার সঙ্গে নিশ্চয়ই ভাব জমে যেত, কারণ ফেলুদারও হেঁয়ালির দিকে ঝোঁক আর হেঁয়ালির সমাধানও করতে পারে আশ্চর্য চটপট ।

লালমোহনবাবু খাটের এক কোণায় ভুরু কঁচকে বসেছিলেন । বললেন, ‘অখিলবাবু ভদ্রলোকের এত বন্ধু ছিলেন, ঠুঁকে কবরেজী ওষুধ দিয়েছেন, ঠুঁর কুস্তী ঘেঁটেছেন, তাঁরতো মহেশবাবুর নাড়ীনক্ষত্র জানা উচিত । আপনি ডায়েরি না ঘেঁটে তাঁকেই জেরা করুন না ।’

ফেলুদা পায়চারি থামিয়ে একটা চারমিনার ধরিয়ে বলল, ‘এই ডায়েরিগুলোর মধ্যে দিয়ে আমি আসল মানুষটার সঙ্গে যোগ স্থাপন করার চেষ্টা করছি । ওই পেনসিলের লেখাগুলোতে আমার কাছে মহেশ চৌধুরী এখনো বেঁচে আছেন ।’

‘ঠুঁর ছেলেদের সম্বন্ধে কিছু পেলেন না ডায়েরিতে ?’

‘প্রথম পনেরো বছরে বিশেষ কিছু নেই, তবে পরে—’

একটা গাড়ি থামল আমাদের গেটের বাইরে । ফিফাটের হর্ন । চেনা শব্দ । আমরা তিনজনে বারান্দায় এসে দেখলাম অরুণবাবু হাতে একটা প্যাকেট নিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন ।

‘মিঃ সিং-এর ওখানে যাচ্ছিলাম—এখানকার ফরেস্ট অফিসার,’ বললেন অরুণবাবু, ‘তাই ভাবলাম বীরেনের চিঠিগুলো দিয়ে যাই । চিঠি অবিশ্যি নামেই । তাও আপনি যখন চেয়েছেন...’

‘আপনাকে এই অবস্থায় এত ঝামেলার মধ্যে ফেললাম বলে আমি অত্যন্ত লজ্জিত ।’

‘দ্যাটস্ অল রাইট,’ বললেন অরুণবাবু ‘বাবা যে কী বলতে চাইছিলেন সেটা আমার কাছে রহস্য । দেখুন যদি আপনি বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু বার করতে পারেন । সত্যি বলতে কী, আমি বাবার সঙ্গ খুব বেশি পাইনি । হাজারিবাগে আসি মাঝে মাঝে আমার কাজের ব্যাপারে । এককালে প্রায়ই আসতাম শিকারের জন্য । তা, বড় শিকার তো এরা বন্ধই করে দিয়েছে । কাল একটা সুযোগ পাওয়া গেছে—দেখি !...’

‘কী সুযোগ ?’

‘যে কারণে সিং-এর কাছে যাচ্ছি । খবর এসেছে রামগড়ের রাস্তায় আজ বিকেলেই নাকি বাঘটা দেখা গেছে । এদিকে একটি ট্রেনার তো হাসপাতালে, অন্যটি মালিকের সঙ্গে ঝগড়াটগড়া করে নিখোঁজ । আমি সিংকে বলেছি যে বাঘটাকে যদি মারতেই হয়, তো আমাকে মারতে দাও । অলরেডি তো তার দিকে গুলি চলেছে ; যদি জখম হয়ে থাকে তাহলে তোহি ইজ এ ডেঞ্জারাস বীস্ট ।’

আমার বলার ইচ্ছে ছিল বাঘটাকে দেখে তো জখম বলে মনে হয়নি, কিন্তু ফেলুদার ইশারাতে সেটা আর বললাম না ।

‘আমি তো সঙ্গে থ্রি ওয়ান ফাইভটা নিচ্ছি,’ বললেন অরুণবাবু, ‘কারণ এমনিতেই চারিদিকে প্যানিক । গরু ছাগলও গেছে এক-আধটা । সার্কাসের খাঁচায় বন্দী অবস্থায় বুড়ো হয়ে মরার চেয়ে জঙ্গলে গুলি খেয়ে মরাটা খারাপ কিসে ?...যাই হোক, আপনার ইন্টারেস্ট থাকলে আপনিও আসতে পারেন । কাল সকালে বেরোব আমরা ।’

‘দেখি...’ বললো ফেলুদা । ‘আমার এই কাজটা কতদূর এগোয় তার উপর

নির্ভর করছে। ভালো কথা—

অরুণবাবু যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিলেন, ফেলুদার কথায় থামলেন। ফেলুদা বলল, 'সেদিন পিকনিকে আপনিই তো বন্দুক ছুঁড়েছিলেন, তাই না?'

ভদ্রলোক হেসে উঠলেন। 'আপনি বোধহয় ভাবছিলেন—বন্দুক চলল, অথচ শিকার নেই কেন? গোয়েন্দার মন তো! ওয়েল, আই মিস্‌ড ইট। একটা বটের। সেরা শিকারীরও লক্ষ্য কি সব সময় অব্যর্থ হয়, মিঃ মিস্তির?'

॥ ৯ ॥

বিলেত থেকে লেখা মহেশবাবুর দ্বিতীয় ছেলের চিঠিগুলো থেকে সত্যিই বিশেষ কিছু জানা গেল না। চিঠি বলতে সবই পোস্টকার্ড, তার একদিকে ছবি, অন্যদিকে ঠিকানা। যেখানে ঠিকানা ছাড়াও কিছু লেখা আছে, সেখানে বীরেন তার বাবার দেওয়া নাম ব্যবহার করেছে—দুরি।

ন'টায় বুলাকিপ্রসাদ ডিনার রেডি করে আমাদের ডাক দিল। ফেলুদা ডায়রি আর খাতা নিয়ে খেতে বসল। যে-সংকেতগুলো তৎক্ষণাৎ সমাধান হচ্ছে না, সেগুলো সে নিজের খাতায় লিখে রাখছে। বাঁ হাতে লিখছে, এবং দিব্যি লিখছে। লালমোহনবাবু একবার বললেন, 'লেখা বন্ধ না করলে আজকের মাংসের কারিটার ঠিক জাসটিস করতে পারবেন না। দুর্ধর্ষ হয়েছে।'

ফেলুদা বলল, 'বাঁদর সমস্যা নিয়ে পড়েছি, এখন মাংস-টাংস বলে ডিসটার্ব করবেন না।'

আমি লক্ষ করছিলাম ফেলুদার ভুরুটা সাংঘাতিক কঁচকে রয়েছে, যদিও ঠোঁটের কোণে একটা হাসির আভাসও রয়েছে। জিগ্যেস করতেই হল ব্যাপারটা কী। ফেলুদা ডায়রি থেকে পড়ে শোনাল—'অগ্নির উপাসকের অসীম বদান্যতা। নবরত্ন বাঁদরের হিসাবে দু হাজার পা।'

লালমোহনবাবু বললেন, 'রাঁচিতে পাগলাগারদ আছে বলে ওখানকার বাসিন্দারাও নাকি একটু ইয়ে হয় বলে শুনিচি। সেটাও একটু মনে রাখবেন।'

ফেলুদা এ কথায় কোনো মন্তব্য না করে বলল, 'অগ্নির উপাসক পাসীদের বলে জানি, কিন্তু বাকিটা সম্পূর্ণ ধোঁয়া।'

তাতে লালমোহনবাবু বললেন যে, প্রথমত নবরত্ন বাঁদর বলে কোনোরকম বাঁদর হয় কিনা সে বিষয়ে ওঁর সন্দেহ আছে; আর দ্বিতীয়ত, নটা রত্নের কী করে দু হাজার পা হয়, আর বাঁদর কী করে সে হিসেবটা করে সেটা কোনোমতেই বোধগম্য হচ্ছে না—এইবার আপনি খাতা বন্ধ করে একটু বিশ্রাম করুন।'

লালমোহনবাবু বলার জন্য নিশ্চয়ই নয়, হয়ত চোখ আর মাথাটাকে একটু

রেস্ট দেবার জন্য ফেলুদা খাবার পরে হাঁটতে বেরোল। অবিশ্যি একা নয়, আমাদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে।

পূর্ণিমার চাঁদ এই কিছুক্ষণ হল উঠেছে, তার গায়ের রং থেকে এখনো হলুদের ছোপটা যায়নি। আকাশে মেঘ জমেছে, তাই দেখে জটায়ু বললেন, 'চন্দ্রালোক ক্ষণস্থায়ী বলে মনে হচ্ছে।' পশ্চিম দিক থেকে মাঝে মাঝে একটা দমকা বাতাস দিচ্ছে, আর তার সঙ্গে একটা শব্দ ভেসে আসছে যেটা ভালো করে শুনলে বোঝা যায় সার্কাসের ব্যান্ড।

ডাইনে মোড় নিয়ে দুটো বাড়ি পরেই কৈলাস। এক সারি ইউক্যালিপটাসের ফাঁক দিয়ে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। দোতলায় একটা ঘরের জানলা খোলা, ঘরে আলো জ্বলছে। সেই আলোর সামনে দিয়ে কে যেন দ্রুত পায়চারি করছে। ফেলুদারও চোখ সেইদিকে। আমরা হাঁটা থামিয়েছি। ওটা কার ঘর? শ্রীতীনবাবুর। পায়চারি করছেন নীলিমা দেবী। একবার জানালায় এসে থামলেন, আবার সরে গিয়ে পায়চারি। অস্থির ভাব।

আমরা আবার চলা শুরু করলাম। জানালাটা ক্রমে দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল। পরপর আরো বাড়ি। প্রত্যেকটাতেই বেশ বড় কম্পাউন্ড। রেডিওতে খবর বলছে; কোন্ বাড়িতে চলছে রেডিও জানি না। লালমোহনবাবু আরেকটা বেমানান রবীন্দ্রসঙ্গীত ধরতে যাচ্ছিলেন—গুনগুনানি শুনে মনে হল ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়—এমন সময় দেখলাম দূরে একজন লোক রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে আমাদেরই দিকে। গায়ে নীল রঙের পুলোভার।

আরেকটু কাছে এলেই চিনতে পারলাম।

'আপনাদের ওখানেই যাচ্ছিলাম,' নমস্কার করে বললেন শঙ্করলাল মিশ্র। চেহারা দেখে মনে হল অনেকটা সামলে নিয়েছেন, যদিও সেই হাসিখুশি ছেলেমানুষী ভাবটা এখনো ফিরে আসেনি।

'কী ব্যাপার?' বলল ফেলুদা।

'আপনাকে একটা অনুরোধ করব।'

'কী অনুরোধ?'

'আপনি তদন্ত ছেড়ে দিন।'

হঠাৎ এমন একটা অনুরোধে রীতিমত হকচকিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু ফেলুদা বেশ স্বাভাবিক ভাবেই বলল, 'কেন বলুন তো?'

'এতে কারুর উপকার হবে না, মিঃ মিস্তির।'

ফেলুদা একটুক্ষণ চুপ থেকে একটা হালকা হেসে বলল, 'যদি বলি আমার নিজের উপকার হবে? মনে খটকা থাকলে আমি বড় উদ্বেগ বোধ করি মিঃ মিশ্র; সেটাকে দূর না করা অবধি শান্তি পাই না। তা ছাড়া মৃত্যুশয্যা একজন

একটা কাজের ভার আমাদের দিয়ে গেছেন, সেটা না করেও আমার শান্তি নেই। এইসব কারণে আমাকে তদন্ত চালাতেই হবে। উপকার-অপকারের প্রশ্নটা এখানে খুব বড় নয়। ভেরি সরি, আপনার অনুরোধ আমি রাখতে পারলাম না। শুধু তাই নয়—এই তদন্তের ব্যাপারে আমি আপনাকে অনুরোধ করব যে আমাকে একটু সাহায্য করুন। মহেশবাবু সম্বন্ধে আর কেউ যাই ভাবুন না কেন, আপনি তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন এটা তো ঠিক ?

‘নিশ্চয়ই ঠিক।’ ফেলুদার কথাটা মনে ধরতে কিছুটা সময় নিল বলেই বোধহয় জবাবটা এল একটু পরে। কিন্তু যখন এল তখন বেশ জোরের সঙ্গেই এল। ‘নিশ্চয়ই ঠিক’, আবার বললেন শঙ্করলাল। তারপর তার গলার সুরটা কেমন যেন বদলে গেল। বললেন, ‘যে শ্রদ্ধাটা বহুদিন ধরে ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠে, সেটাকে কি এক ধাক্কায় ভাঙতে দেওয়া উচিত ?’

‘আপনি কি সেটাই করছিলেন ?’

‘হ্যাঁ, সেটাই করছিলাম। কিন্তু সেটা ভুল। এখন বুঝেছি সেটা মস্ত ভুল, আর বুঝতে পেরে মনে শান্তি পাচ্ছি।’

‘তাহলে আপনার কাছে সাহায্য আশা করতে পারি ?’

‘কী সাহায্য চাইছেন বলুন,’ ফেলুদার দিকে সোজাসুজি চেয়ে বেশ সহজভাবে কথাটা বললেন শঙ্করলাল।

‘তাঁর দুই ছেলের প্রতি মহেশবাবুর মনোভাব কেমন ছিল সেটা জানতে চাই। চৌধুরী পরিবার সম্বন্ধে আপনি যতটা নিরপেক্ষভাবে বলতে পারবেন, তেমন অনেকেই পারবেন না।’

শঙ্করলাল বললেন, ‘আমি যেটুকু বুঝেছি তা বলছি। আমার বিশ্বাস শেষ বয়সে বীরেন ছাড়া আর কারুর উপর টান ছিল না মহেশবাবুর। অরুণদা আর প্রীতীন দুজনেই ঠুকে হতাশ করেছিল।’

‘সেটার কারণ বলতে পারেন ?’

‘সেটা পারব না, জানেন, কারণ, ওই দু ভাইয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ যোগাযোগ ছিল না অনেকদিন থেকেই। তবে অরুণদাকে যে জুয়ার নেশায় পেয়েছে সে কথা আমাকে একদিন মহেশবাবু বলেছিলেন। সোজা করে বলেননি, ঠুকে নিজস্ব ভাষায় বলেছিলেন। আমি বুঝতে পারিনি; শেষে ঠুকেই বুঝিয়ে দিতে হল। বললে, “অরুণ গুড হলে আমি খুশি হতুম, বেটার হয়েই আমায় চিন্তায় ফেলেছে। শুনছি নাকি আজকাল মহাজাতি ময়দানে যাতায়াত করছে নিয়মিত।”—বেটার তো বুঝতেই পারছেন, আর জাতি হল রেস; মহাজাতি ময়দান হল মহেশবাবুর ভাষায় রেসের মাঠ।’

ফেলুদা বলল, ‘কিন্তু প্রীতীনবাবু তাঁকে হতাশ করবেন কেন? উনি তো

ইলেকট্রনিকসে বেশ—’

‘ইলেকট্রনিকস!—’ শঙ্করলাল যেন আকাশ থেকে পড়লেন। ‘ও কি আপনাকে তাই বলেছে নাকি ?’

‘ইন্ডোভিশনের সঙ্গে ঠুকে কোনো সম্পর্ক নেই ?’

শঙ্করলাল সশব্দে হেসে উঠলেন। ‘হরি, হরি! ইন্ডোভিশন! প্রীতীন একটা সদাগরী আপিসে সাধারণ চাকরি করে। সেটাও ওর স্বশুরের সুপারিশে পাওয়া। প্রীতীন ছেলে খারাপ নয়, কিন্তু অত্যন্ত ইমপ্র্যাকটিক্যাল আর খামখেয়ালী। এককালে সাহিত্য-টাহিত্য করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু সেও খুব মামুলি। ওর স্ত্রী বড়লোক বাপের একমাত্র মেয়ে। ও যে গাড়িটাতে এসেছে সেটাও ওর স্বশুরের। আপিস থেকে ছুটি পাচ্ছিল না, তাই আসতে দেবী হয়েছে।’

এবার আমাদের আকাশ থেকে পড়ার পালা।

‘তবে ওর পাখির নেশাটা খাঁটি,’ বললেন শঙ্করলাল, ‘ওতে কোনো ফাঁকি নেই।’

ফেলুদা বলল, ‘আরেকটা প্রশ্ন আছে।’

‘বলুন।’

‘সেদিন রাজরাণ্নায় যে গেরুয়াধারীটির সঙ্গে আপনি কথা বলছিলেন, তিনিই কি বীরেন্দ্র ?’

হঠাৎ এ রকম একটা প্রশ্ন শুনে শঙ্করলাল থতমত খেলেও, মনে হল চট করে সামলে নিলেন। কিন্তু উত্তর যেটা দিলেন সেটা সোজা নয়।

‘আপনার যা বুদ্ধি, আমার মনে হয় ক্রমে আপনি সব কিছুই জানতে পারবেন।’

‘এটা জিগ্যেস করার একটা কারণ আছে,’ বলল ফেলুদা। ‘যদি তিনি বীরেন হন, তাহলে মহেশবাবুর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে আমার একটা জিনিস দিতে হবে। আপনি প্রয়োজনে বীরেনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারবেন কি ?’

শঙ্করলাল বললেন, ‘মহেশবাবুর শেষ ইচ্ছা যাতে পূরণ হয়, তার চেষ্টা আমি করব। এটা আমি কথা দিচ্ছি। এর বেশি আর কিছু বলতে পারব না। আমায় মাপ করবেন।’

কথাটা বলে শঙ্করলাল যে পথে এসেছিলেন, আবার সেই পথেই ফিরে গেলেন।

আমরা যে ছাঁটতে ছাঁটতে বেশ অনেকখানি পথ চলে এসেছিলাম সেটা বুঝতেই পারিনি। ফেলুদা টর্চের আলোয় ঘড়ি দেখে বলল সাড়ে দশটা। আমরা ফিরতি পথ ধরলাম। কৈলাসে সব বাতি নিভে গেছে, চাঁদ ঢেকে গেছে মেঘে, সার্কাসের বাজনাও আর শোনা যাচ্ছে না। এই থমথমে পরিবেশে ফেলুদার

‘বাঁদর’ বলে চৈঁচিয়ে ওঠাটা এত অপ্রত্যাশিত যে লালমোহনবাবুর সঙ্গে সঙ্গে ‘কোথায়’ বলাতে কিছুই আশ্চর্য হলাম না। আমি অবিশ্যি বুঝেছিলাম যে ফেলুদা মহেশবাবুর ডায়রির বাঁদরের কথা বলছে। ‘কী অদ্ভুত মাথা ভদ্রলোকের!’ বলল ফেলুদা। ‘বাঁদরেও যে বই লিখেছে সেটা তো খেয়ালই ছিল না।’

‘আপনি সিমপল ফ্র্যাকচারটাকে কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচারে পরিণত করছেন কেন বলুনতো মশাই? শুধু বাঁদরে শানাচ্ছে না, তার উপর আবার বই-লিখিয়ে বাঁদর?’

‘গিবন! গিবন! গিবন!’ বলে উঠল ফেলুদা।

আরেব্বাস! সত্যিই তো। গিবন তো একরকম বাঁদর বটেই।

কিন্তু ফেলুদা হঠাৎ কেন জানি মুষড়ে পড়ল। বাড়ির ফটকের কাছাকাছি যখন পৌঁছেছি তখন চাপা গলায় বলতে শুনলাম, ‘সাংঘাতিক দাঁও মেরেছে লোকটা, সাংঘাতিক।’

‘কে মশাই?’ জিগ্যেস করলেন লালমোহনবাবু।

‘স্ট্যাম্প-অ্যালবাম চোর,’ বলল ফেলুদা।

রাত বারোটা পর্যন্ত আমাদের ঘরে থেকে লালমোহনবাবু ফেলুদার হেঁয়ালি সমাধান দেখলেন। একটা হেঁয়ালির উত্তরের জন্য এগারোটার সময় কৈলাসে ফোন করতে হল। ১৯৫১-র ১৮ই অক্টোবর মহেশবাবু লিখেছেন He passes away। কার মৃত্যু সংবাদ ডায়রিতে লেখা রয়েছে জানবার জন্য অরুণবাবুকে জিগ্যেস করে জানা গেল ওই দিনে অরুণবাবুর মা মারা গিয়েছিলেন। মা-র নাম জিগ্যেস করাতে বললেন হিরণ্ময়ী। তার ফলে বেরিয়ে গেল He হল ‘হি’।

১৯৫৮-তে কিছু লেখা পাওয়া গেল যেগুলো পড়লে মনে হয় ইংরিজি ‘মটো’। যেমন ‘Be foolish’, ‘Be stubborn’, ‘Be determined’। তারপর যখন এল ‘Be leaves for England’ তখন বোঝা গেল Be হচ্ছে বী অর্থাৎ বীরেন।

১৯৭৫-এর পাতায় পাওয়া গেল ‘এ তিনের বশ’। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎস্য। তিন হল লোভ। ‘এ’ হচ্ছে A—অরুণবাবু।

শেষ লেখা মহেশবাবুর জন্মদিনের আগের দিন। —‘ফিরে আসা। ফিরে আশা’—ব্যস—তারপর আর কিছু নেই।

ডায়রি দেখা যখন শেষ হল তখন রাত একটা। ফেলুদার তখনও ঘুম আসেনি, কারণ আমি যখন লেপটা গায়ের উপর টানছি, তখন দেখলাম ও লালমোহনবাবুর দেওয়া সার্কাসের বইটা খুলল। উনি কথাই দিয়েছিলেন ওঁর পড়া হলে ফেলুদাকে পড়তে দেবেন, আর ফেলুদার পড়া হলে আমি পড়ব।

যখন তন্দ্রার ভাব আসছে, তখন শুনলাম ফেলুদা কথা বলছে, আর সেটা আমাকেই বলছে।—

‘কোথাও খুন হলে পুলিশে গিয়ে খুনের জায়গার একটা নকশা করে লাশ যেখানে পাওয়া গেছে সেখানে একটা চিহ্ন দেয়। সে চিহ্নটা কী জিনিস?’

‘এক্স মার্কস দ্য স্পট?’ আমি জিগ্যেস করলাম।

‘ঠিক বলেছিস। এক্স মার্কস দ্য স্পট।’

এই এক্সটাই স্বপ্নে হয়ে গেল দু হাত তোলা পা ফাঁক করা কালী মূর্তি, যেটা অরুণবাবুর দিকে চোখ রাঙিয়ে বলছে ‘তুই দুইয়ের বশ, তুই দুইয়ের বশ, তুই দুইয়ের বশ,’ আর অরুণবাবু চিৎকার করে বলছেন ‘আমি দেখছিলাম! আমি দেখছিলাম!’ তারপরই কালীর মুখটা হয়ে গেল লালমোহনবাবুর মুখ, আর মেই সেই মুখটা বলেছে ‘এক মাসে তিন হাজার বিক্রি—হুঁ হুঁ—কালমোহন বেঙ্গলী!’—অমনি স্বপ্নটা ভেঙে গেল একটা শব্দে।

দরজায় ধাক্কা লাগার শব্দ। আর তার সঙ্গে একটা ধবস্তাধবস্তির শব্দ। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে এটাও বুঝতে পারলাম।

আমার হাতটা আপনা থেকেই টেবিল ল্যাম্পের সুইচটার দিকে চলে গেল। আলো জ্বলল না। বিহায়েও যে লোডশেডিং হয় এটা খেয়াল ছিল না।

মেঝেতে ধুপ্ করে কী একটা পড়ার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ফেলুদার গলা—

‘টর্চ জ্বাল, তোপসে—আমারটা পড়ে গেছে!’

টেবিলের উপর হাতড়ে জলের গেলাসটাকে মাটিতে ফেলে ভেঙে তবে টর্চটা পেলাম। ফেলুদা ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। টর্চের আলোতে তার নিষ্ফল ক্রোধটা চোখে মুখে ফুটে বেরোচ্ছে।

‘কে ছিল ফেলুদা?’

‘দেখিনি, তবে অনুমান করতে পারি। লোকটা ষণ্ডা।’

‘কী মতলবে এসেছিল, বলতো?’

‘চুরি।’

‘কিছু নেয়নিতো?’

‘নেয়নি, তবে নির্যাত নিত—যদি আমার ঘুমটা এত পাতলা না হত।’

‘কী নিত?’

ফেলুদা এ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে কেবল বিড়বিড় করে বলল, ‘এখন দেখছি ফেলু মিন্তিরই একমাত্র লোক নয় যে মহেশ চৌধুরীর সংকেতের মানে বুঝতে পারে। যদিও এটা একটু লেটে বুঝেছে।’....

পরদিন সকালে লালমোহনবাবু সব শুনে-টুনে বললেন, 'আমি প্রথম দিনই বলেছিলাম দরজা বন্ধ করে শোবেন। এ সব জায়গায় চোর ডাকাতির উপদ্রব তো হবেই।'

'আপনি তো বাঘের ভয়ে দরজা বন্ধ করেছিলেন।'

'আর আপনি চোরের জন্য খোলা রেখেছিলেন! বন্ধ রাখলে দুটোর হাত থেকেই সেফ। ওহে বুলাকিপ্রসাদ, চটপট ব্রেকফাস্টটা দাও ভাই।'

'এত তাড়া কিসের,' বলল ফেলুদা।

'বাঘ ধরা দেখতে যাবেন না?'

'ধরবে কে? কারাণ্ডিকার তো নিখোঁজ।'

'নিখোঁজ হলে কী হবে? বাঘ মারার তাল হচ্ছে সে খবর কি তার কাছে পৌঁছয়নি?—ওঃ, কী প্রিলিং ব্যাপার মশাই। এ চাপ ছাড়া যায় না। আপনি ব্যাপারটা কী করে এত কামলি নিচ্ছেন জানি না।'

আটটা নাগাদ ব্রেকফাস্ট সেরে ডায়রি আর চিঠির প্যাকেট নিয়ে কৈলাসে যাবার জন্য তৈরি হয়েছি, এমন সময় অখিলবাবু এলেন। বললেন তাঁর এক হোমিওপ্যাথ বন্ধু কাছেই থাকেন, তাঁর কাছেই যাচ্ছিলেন, আমাদের বাড়ি পথে পড়ে বলে টু মেরে যাচ্ছেন।

'ঘৃতকুমারীতে মহেশবাবুর মাথা ঠাণ্ডা হয়েছিল?' ফেলুদা প্রশ্ন করল হালকাভাবে।

'ও বাবা! এত কথাও লিখেছে নাকি মহেশ ডায়রিতে?'

'আরও অনেক কথাই লিখেছেন।'

অখিলবাবু বললেন, 'আমার ওষুধের চেয়েও অনেক বেশি কাজ দিয়েছিল ওর মনের জোর। যাকে বলে উইল পাওয়ার। সে যে কীভাবে মদ ছাড়ল সেতো আমি নিজের চোখে দেখেছি। সেতো আর ঘৃতকুমারীতে হয়নি।'

'উইলের কথাই যখন তুললেন,' বলল ফেলুদা, 'তখন বলুন তো মহেশবাবুর উইল সম্বন্ধে কিছু জানেন কিনা। আমি অবিশ্যি দলিলের কথা বলছি, মনের জোরের কথা বলছি না।'

'ডিটেল জানি না, তবে এটুকু জানি যে মহেশ একবার উইল করে পরে সেটা বাতিল করে আরেকটা উইল করে।'

'আমার ধারণা এই দ্বিতীয় উইলে বীরেনের কোনো অংশ ছিল না।'

অখিলবাবু অবাধ হয়ে বললেন, 'এটা কি ডায়রিতে পেলেন নাকি?'

'না। এটা উনি মৃত্যুশয্যায় বলে গেছেন। সংকেতটা আপনার মনে আছে কিনা জানি না। প্রথমে দুটো আঙুল দেখালেন, তারপর উই উই বললেন, আর তারপর বুড়ো আঙুলটা নাড়ালেন। দুই আঙুল যদি দুরি হয়, তাহলে ও ছাড়া আর কোনো মানে হয় না।'

'আশ্চর্য সমাধান করেছেন আপনি,' বললেন অখিলবাবু। 'প্রথম উইলে বীরেনের অংশ ছিল। তার কাছ থেকে চিঠি আসা বন্ধ হবার পর পাঁচ বছর অপেক্ষা করে ছেলে আর আসবে না ধরে নিয়ে গভীর অভিমানে বীরেনকে বাদ দিয়ে মহেশ নতুন উইল করে।'

'বীরেন ফিরে এসেছে জানলে কি আবার নতুন উইল করতেন?'

'আমার তো তাই বিশ্বাস।'

এবার ফেলুদা একটু ভেবে প্রশ্ন করল—

'বীরেন সম্মাসী হয়ে যেতে পারে এমন কোনো সম্ভাবনা তার মধ্যে কখনো লক্ষ করছিলেন কি?'

'দেখুন, বীরেনের কুষ্ঠী আমিই করি। সে যে গৃহত্যাগী হবে সেটা আমি জানতাম। তাই যদি হয় তাহলে সম্মাসী হবার সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় কি?'

'আরেকটা শেষ প্রশ্ন।—সেদিন আপনি বললেন মহেশবাবুকে খুঁজতে যাচ্ছেন অথচ আপনি এলেন আমাদের পরে। আপনি কি পথ হারিয়েছিলেন? জায়গাটা তোতেমন গোলকধাঁধা নয় কিছু।'

'এ প্রশ্ন আপনি করবেন সে আমি জানতাম,' মৃদু হেসে বললেন অখিলবাবু। 'জায়গাটা গোলকধাঁধা নয় ঠিকই, তবে পথটা দুভাগ হয়ে গেছে সেটা আপনি লক্ষ করেছেন নিশ্চয়ই। মহেশকে খুঁজে পাওয়া আমার পক্ষে সহজই ছিল। কিন্তু ব্যাপার কী জানেন, বুড়ো বয়সে ছেলেবেলার স্মৃতি মাঝে মাঝে জেগে ওঠে মনে; সেই রকম একটা স্মৃতি আমাকে অন্য পথে নিয়ে যায়। সেটা আর কিছুই না; পঞ্চান্ন বছর আগে ওই দিকেই একটা পাথরে আমি আমার নামের আদ্যক্ষর আর তারিখ খোদাই করে রেখেছিলাম। গিয়ে দেখি সে পাথর এখনো আছে, আর সে খোদাইও আছে—A. B. C.; 15.5.23—বিশ্বাস না হয় আপনি গিয়ে দেখতে পারেন।'

কৈলাসে গিয়ে নূর মহম্মদের কাছে শুনলাম অরুণবাবু আধঘণ্টা আগে বেরিয়ে গেছেন বাঘের সন্ধানে—'ছোটাবাবা' আছেন।

শ্রীতীনবাবু দোতলায় ছিলেন, খবর দিতে নিচে নেমে এলেন। তাঁর হাতে চিঠি আর ডায়রির প্যাকেট তুলে দিয়ে চলে আসছি, এমন সময় বাধা পড়ল।

নীলিমা দেবী । তিনি ঘরে ঢুকতেই প্রীতীনবাবুর মুখ শুকিয়ে গেছে সেটা লক্ষ করলাম ।

‘আপনাকে একটা কথা বলার ছিল, মিঃ মিত্তির । সেটা আমার স্বামীরই বলা উচিত ছিল, কিন্তু উনি বলতে চাইছেন না ।’

প্রীতীনবাবু তাঁর স্ত্রীর দিকে কাতরভাবে চেয়ে আছেন, কিন্তু নীলিমা দেবী সেটা গ্রাহ্য করলেন না । তিনি বলে চললেন, ‘সেদিন বাবাকে ওই অবস্থায় দেখে আমার স্বামীর হাত থেকে টেপ রেকর্ডারটা পড়ে যায় । আমি সেটা তুলে আমার ব্যাগে রেখে দিই । আমার মনে হয় এটা আপনার কাছে লাগবে । এই নিন ।’

প্রীতীনবাবু আবার বাধা দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না । ফেলুদা ধন্যবাদ দিয়ে চ্যাপটা ক্যাসেট-রেকর্ডারটা কোটের পকেটে পুরে নিল ।

প্রীতীনবাবুকে দেখে মনে হল তিনি একেবারে ভেঙে পড়েছেন ।

আমার মন বলছিল যে বাঘ ধরার ব্যাপারে ফেলুদারও যথেষ্ট কৌতূহল আছে । গাড়িতে উঠে ও হরিপদবাবুকে যা নির্দেশ দিল, তাতে বুঝলাম আমার অনুমান ঠিক ।

লালমোহনবাবু যতটা সাহস নিয়ে বেরিয়েছিলেন, তার কিছুটা বোধহয় কমেছে, কারণ যাবার পথে একবার ফেলুদাকে বললেন, ‘ভদ্রলোকেরতো অনেক বন্দুক ছিল মশাই—একটা চেয়ে নিলেন না কেন ? আপনার কোণ্ট ব্রিটিশ এ ব্যাপারে কোনো কাজে লাগবে কি ?’

তাতে ফেলুদা বলল, ‘বাঘের গায়ে মাছি বসলে সেটা মারা চলবে ।’

সারা পথ ফেলুদা টেপ রেকর্ডারটা চালিয়ে ভল্যুম কমিয়ে কানের কাছে ধরে রইল । কী শুনল ওই জানে ।

কাল রাতে বৃষ্টি হওয়াতে রাস্তায় অনেক জায়গাই ভিজে ছিল । বড় রাস্তা থেকে একটা মোড়ের কাছে এসে কাঁচা মাটিতে টায়ারের দাগ দেখে বুঝলাম কিছু গাড়ি মেন রোড থেকে বেঁকে ওই দিকেই গেছে । আমরাও বাঁয়ের রাস্তা নিলাম, আর মাইল খানেক গিয়েই দেখলাম রাস্তার বাঁ ধারে একটা বটগাছের পাশে তিনটে তিনরকম গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে—একটা বন বিভাগের জীপ, একটা অরুণবাবুর ফিয়ার্ট আর একটা বাঘের খাঁচাসমত সার্কাসের ট্রাক । পাঁচজন লোক গাছটার তলায় বসে ছিল, তারা বলল আধঘণ্টা হল বাঘ খোঁজার দল বনের ভিতর চলে গেছে । কোন্‌দিকে গেছে সেটাও দেখিয়ে দিল । লোকগুলোর মধ্যে একটাকে সেদিন সার্কাসের তাঁবুতে দেখেছি ; ফেলুদা তাকেই জিগ্যেস করল ট্রেনারও এসেছে কিনা । লোকটা বলল যে দ্বিতীয় ট্রেনার চন্দ্রন এসেছে ।

আমরা রওনা দিলাম । সামনে কী অভিজ্ঞতা আছে জানি না, তবে এইটুকু

জানি যে অরুণবাবুর হাতে বন্দুক আছে, হয়ত বন বিভাগের শিকারীর হাতেও আছে, কাজেই ভয়ের কোনো কারণ নেই । লালমোহনবাবু মনে হল একটু মুষড়ে পড়েছেন তার কারণ নিশ্চয়ই কারাগ্রিকারের বদলে চন্দ্রনের আসা ।

ভিজে মাটিতে মাঝে মাঝে অস্পষ্ট পায়ের ছাপ গাইড হিসেবে কাজ করছে । বন ঘন নয়, শীতকালে আগাছাও কম, তাই এগোতে কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না । এর মধ্যে দু একবার ময়ূর ডেকে উঠেছে ; সেটা যে বাঘের সংকেত হতে পারে সেটা আমরা সবাই জানি ।

মিনিট দশেক চলার পর শব্দটা পেলাম ।

বাঘের ডাক, তবে গর্জন বলব না । ইংরিজিতে এটাকে গ্রাউল বলে, বাঙলায় হয়ত গোঙানি, কিংবা গরগরানি বা গজগজানি । ঘন ঘন ডাক, আর বিরক্তির ডাক, বিক্রমের নয় ।

আরো কয়েক পা এগিয়ে যেতেই দুটো গাছের ফাঁক দিয়ে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলাম । অদ্ভুত কেননা এ জিনিস সার্কাসের বাইরে কখনো যে দেখতে পাব এটা স্বপ্নেও ভাবিনি ।

আমাদের সামনে বাঁয়ে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, তাদের দুজনের হাতে বন্দুক । একটা বন্দুক অরুণবাবুর হাতে, সেটা উঁচিয়ে তাগ করা আছে সামনের দিকে ।

এই তিনজনের পিছনে একটা খোলা জায়গা, যেটাকে বলা যেতে পারে সার্কাসের রিং । এই রিং-এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ডান হাতে চাবুক আর বাঁ হাতে একটা গাছের ডাল নিয়ে একটা লোক । বাঁ কাঁধে ব্যান্ডেজ দেখে বুঝলাম ইনিই হলেন ট্রেনার চন্দ্রন । আমার দিকে পিছন ফিরে হাতের চাবুকটা মাঝে মাঝে সপাৎ করে মাটিতে মেরে চন্দ্রন ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে যার দিকে সে হল আমাদের কালকের দেখা গ্রেট ম্যাজেস্টিক সার্কাস থেকে পালানো বাঘ সুলতান ।

এ ছাড়া আরো চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছে বাঁয়ে একটু দূরে, তাদের দুজনের হাতে যে শিকলটা রয়েছে সেটাই নিশ্চয়ই বাঘকে পরানো হবে, যদি সে ধরা দেয় ।

সবচেয়ে অদ্ভুত লাগল সুলতানের হাবভাব । সে পালানোর কোনো চেষ্টা করছে না, অথচ ধরা দেবারও যেন বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই । শুধু তাই নয়, তার চোখে মুখে যে রাগ আর অবজ্ঞার ভাবটা ফুটে উঠেছে সেটা সে বার বার বুঝিয়ে দিচ্ছে চাপা গর্জনে ।

চন্দ্রন যদিও এক পা এক পা করে এগোচ্ছে বাঘটার দিকে, তাকে দেখে মনে হয় না যে তার নিজের উপর সম্পূর্ণ আস্থা আছে । সে যে একবার জখম হয়েছে এই বাঘেরই হাতে সেটা সে নিশ্চয়ই ভুলতে পারছে না ।



আমি আড়চোখে মাঝে মাঝে দেখছি অরুণবাবুর দিকে। তিনি যেভাবে বন্দুক উঁচিয়ে স্থির লক্ষ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, বেশ বুঝতে পারছি সুলতান বেসামাল কিছু করলেই বন্দুক গর্জিয়ে উঠে তাকে ধরাশায়ী করে দেবে। আমার বাঁ পাশে দু'পা সামনে ফেলুদা পাথরের মতো দাঁড়ানো ডাইনে লালমোহনবাবু, তাঁর মুখ এমনভাবে হাঁ হয়ে রয়েছে যে মনে হয় না চোয়াল আর কোনোদিনও উঠবে। (ভদ্রলোক পরে বলেছিলেন যে তাঁর ছেলেবয়সে তিনি যত সার্কাসে যত বাঘের খেলা দেখেছিলেন, তার সমস্ত স্মৃতি নাকি মুছে গেছে আজকের হাজারিবাগের বনের মধ্যে দেখা এই সার্কাসে)।

চন্দ্রন যখন পাঁচ হাতের মধ্যে, তখন সুলতান হঠাৎ তার সমস্ত মাংসপেশী টান করে শরীরটা একটু নিচু করল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে ফেলুদা একটা নিঃশব্দ লাফে অরুণবাবুর ধারে পৌঁছে গিয়ে তাঁর বন্দুকের নলের উপর হাত রেখে মৃদু চাপে সেটাকে নামিয়ে দিল।

‘সুলতান!’

গুরুগম্ভীর ডাকটা এসেছে আমাদের ডান দিক থেকে। যিনি ডাকটা দিয়েছেন, তাঁকে আগে থেকে দেখতে পেয়েই যে ফেলুদা এই কাজটা করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

‘সুলতান! সুলতান!’

গম্ভীর স্বরটা নরম হয়ে এল। অবাক হয়ে দেখলাম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন রিং-মাস্টার কারাগুকার; ঊরু হাতে চাবুক, পরনে সাধারণ প্যান্ট আর শার্ট। গলা অনেকখানি নামিয়ে নিয়ে পোষা কুকুর বা বেড়ালকে যেমন ভাবে ডাকে, সেই ভাবে ডাকতে ডাকতে কারাগুকার এগিয়ে গেলেন সুলতানের দিকে।

চন্দ্রন হতভম্ব হয়ে পিছিয়ে গেল। অরুণবাবুর বন্দুক ধীরে ধীরে নেমে গেল। বন বিভাগের কর্তার মুখ লালমোহনবাবুর মুখের মতোই হাঁ হয়ে গেল। বনের মধ্যে এগারো জন হতবাক দর্শক দেখল গ্রেট ম্যাজেস্টিক সার্কাসের রিংমাস্টার কী আশ্চর্য কৌশলে পালালো বাঘকে বশ করে তার গলায় চেন পরিয়ে দিল, আর তারপর সেই চেন ধরে সুলতানকে জঙ্গলের মধ্যে থেকে বার করে নিয়ে এল একেবারে সার্কাসের খাঁচার কাছে। তারপর খাঁচার দরজা খুলে তার বাইরে টুল রেখে দিল সার্কাসের লোক, আর কারাগুকার চাবুকের এক আছাড়ের সঙ্গে সঙ্গে ‘আপ্!’ বলতেই সেই বাঘ তীরবেগে ছুটে গিয়ে টুলে পা দিয়ে আবার সার্কাসের খাঁচায় বন্দী হয়ে গেল।

আমরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিলাম; বাঘ খাঁচায় বন্দী হওয়া মাত্র কারাগুকার আমাদের দিকে ফিরে একটা সেলাম ঠুকল। তারপর সে একটা গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। এটা একটা প্রাইভেট ট্যাক্সি, আগে ছিল না।

গাড়িটা চলে যাবার পর অরুণবাবুকে বলতে শুনলাম, 'ব্রিলিয়ান্ট'। তারপর ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'থ্যাঙ্কস'।

॥ ১১ ॥

কৈলাসে ফিরে এসে ফেলুদা প্রথমে অরুণবাবুর অনুমতি নিয়ে একটা টেলিফোন করল, কাকে জানি না। তারপর বৈঠকখানায় এল, যেখানে আমরা সবাই বসেছি। নীলিমা দেবী চা পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওঁরা তিনজনে কালই কলকাতা ফিরে যাচ্ছেন। মহেশবাবুর শ্রাদ্ধ কলকাতাতেই হবে। অখিলবাবুকে বাঘের খবরটা দেওয়াতে তিনি ঘটনাটা দেখতে পেলেন না বলে খুব আপসোস করলেন।

'আমিও ভাবছি কালই বেরিয়ে পড়ব,' বললেন অরুণবাবু, 'অবিশ্যি যদি আপনার তদন্ত শেষ হয়ে থাকে।'

ফেলুদা জানাল সব শেষ।—'আপনার পিতৃদেবের শেষ ইচ্ছা পালনেও কোনো বাধা নেই। সে ব্যবস্থাও হয়ে গেছে।'

অরুণবাবু চায়ের কাপ থেকে দৃষ্টি তুললেন।

'সে কি, বীরেনের খোঁজ পেয়ে গেছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার বাবা ঠিকই অনুমান করেছিলেন।'

'মানে?'

'তিনি এখানেই আছেন।'

'হাজারিবাগে?'

'হাজারিবাগে।'

'খুবই আশ্চর্য লাগছে আপনার কথাটা শুনে।'

আশ্চর্য লাগার সঙ্গে যে একটা অবিশ্বাসের ভাবও মিশে আছে সেটা অরুণবাবুর কথার সুরেই বোঝা গেল। ফেলুদা বলল 'আশ্চর্য তো হবারই কথা, কিন্তু আপনারও এ রকম একটা সন্দেহ হয়েছিল, তাই নয় কি?'

অরুণবাবু হাতের কাপটা নামিয়ে সোজা ফেলুদার দিকে চাইলেন।

'শুধু তাই নয়,' ফেলুদা বলে চলল, 'আপনার মনে এমনও ভয় ঢুকেছিল যে মহেশবাবু হয়ত আবার নতুন উইল করে আপনাকে বাদ দিয়ে বীরেনকে তাঁর সম্পত্তির ভাগ দেবেন।'

ঘরের মধ্যে একটা অদ্ভুত থমথমে ভাব। লালমোহনবাবু আমার পাশে বসে সোফার একটা কুশন খামচে ধরেছেন। প্রীতীনবাবুর মাথায় হাত। অরুণবাবু উঠে দাঁড়িয়েছেন—তাঁর চোখ লাল, তাঁর কপালের রগ ফুলে উঠেছে।

'শুনুন মিঃ মিস্ত্রি,' গর্জিয়ে উঠলেন অরুণবাবু, 'আপনি নিজেই যত বড়ই গোয়েন্দা ভাবুন না কেন, আপনার কাছ থেকে এমন মিথ্যে, অমূলক, ভিত্তিহীন অভিযোগ আমি বরদাস্ত করব না।—জগৎ সিং!'

পিছনের দরজা দিয়ে বেয়ারা এসে দাঁড়াল।

'আর একটি পা এগোবে না তুমি!—ফেলুদার হাতে রিভলভার, সেটার লক্ষ্য অরুণবাবুর পিছনে জগৎ সিং-এর দিকে।—ওর মাথার একগাছা চুল কাল রাতে আমার হাতে উঠে এসেছিল। আমি জানি ও আপনারই আঙ্গা পালন করতে এসেছিল আমার ঘরে। ওর মাথার খুলি উড়ে যাবে যদি ও এক পা এগোয় আমার দিকে!'

জগৎ সিং পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

অরুণবাবু কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন সোফাতে।

'আ-আপনি কী বলতে চাইছেন?'

'শুনুন সেটা মন দিয়ে,' বলল ফেলুদা, 'আপনি উইল চেঞ্জ করার রাস্তা বন্ধ করার জন্য আপনার বাবার চাবি লুকিয়ে রেখেছিলেন। বিবি দেখেছিল মহেশবাবুকে চাবি খুঁজতে। মহেশবাবু হেঁয়ালি করে তাঁর নাতনীকে বলেছিলেন তিনি কী হারিয়েছেন, কী খুঁজছেন। এই কী হল Key—অর্থাৎ চাবি। কিন্তু চাবি সরিয়েও আপনি নিশ্চিন্ত হননি। তাই আপনি সেদিন রাজরাশ্ময় সুযোগ পেয়ে আপনার মোক্ষম অস্ত্রটি প্রয়োগ করেন আপনার বাবার উপর। আপনি জানতেন সেই অস্ত্রে মৃত্যু হতে পারে—এবং সেটা হলেই আগনার কার্যসিদ্ধি হবে—'

'পাগলের প্রলাপ! পাগলের প্রলাপ বকছেন আপনি!'

'সাক্ষী আছে, অরুণবাবু—একজন নয়, তিনজন—যদিও তাঁরা কেউই সাহস করে সেটা প্রকাশ করেননি। আপনার ভাই সাক্ষী—অখিলবাবু সাক্ষী—শঙ্করলাল সাক্ষী।'

'সাক্ষী যেখানে নির্বাক, সেখানে আপনার অভিযোগ প্রমাণ করছেন কী করে, মিঃ মিস্ত্রি?'

'উপায় আছে, অরুণবাবু। তিনজন ছাড়াও আরেকজন আছে যে নির্বিশেষ সমস্ত সত্য ঘটনা উদঘাটন করবে।'

কৈলাসের বৈঠকখানায় পাখির ডাক কেন? জলপ্রপাতের শব্দ কেন?

অবাক হয়ে দেখলাম ফেলুদা তার কোটের পকেট থেকে প্রীতীনবাবুর ক্যাসেট রেকর্ডার বার করেছে।

'সেদিন একটি ঘটনা দেখে এবং কয়েকটি কথা শুনে বিহ্বল হয়ে প্রীতীনবাবু হাত থেকে এই যন্ত্রটা ফেলে দেন। নীলিমা দেবী এটা কুড়িয়ে নেন। এই যন্ত্রে পাখির ডাক ছাড়াও আরো অনেক কিছু রেকর্ড হয়ে গেছে, অরুণবাবু।'

এইবারে দেখলাম অরুণবাবুর মুখ ক্রমে লাল থেকে ফ্যাকাসের দিকে চলেছে। ফেলুদার ডান হাতে রিভলভার, বাঁ হাতে টেপ রেকর্ডার।

পাখির শব্দ ছাপিয়ে মানুষের গলা শোনা যাচ্ছে। ক্রমে এগিয়ে আসছে গলার স্বর, স্পষ্ট হয়ে আসছে। অরুণবাবুর গলা—

‘বাবা, বীরু ফিরে এসেছে এ ধারণা তোমার হল কী করে?’

তারপর মহেশবাবুর উত্তর—

‘বুড়ো বাপের যদি তেমন ধারণা হয়েই থাকে, তাতে তোমার কী?’

‘তোমার এ বিশ্বাস মন থেকে দূর করতে হবে। আমি জানি সে আসেনি, আসতে পারে না। অসম্ভব।’

‘আমার বিশ্বাসেও তুমি হস্তক্ষেপ করবে?’

‘হ্যাঁ, করব। কারণ বিশ্বাসের বশে একটা অন্যায্য কিছু ঘটে যায় সেটা আমি চাই না।’

‘কী অন্যায্য?’

‘আমার যা পাওনা তা থেকে বঞ্চিত করতে দেব না তোমাকে আমি।’

‘কী বলছ তুমি!’

‘ঠিকই বলছি। একবার উইল বদল করেছ তুমি বীরু আসবে না ভেবে।

তারপর আবার—

‘উইল আমি এমনিও চেঞ্জ করতাম!’—মহেশবাবুর গলার স্বর চড়ে গেছে; তার পুরানো রাগ যেন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তিনি বলে চলেছেন—

‘তুমি আমার সম্পত্তির ভাগ পাবার আশা কর কী করে? তুমি অসৎ, তুমি জুয়াড়ী, তুমি চোর!—লজ্জা করে না? আমার আলমারি থেকে দোরাবজীর দেওয়া স্ট্যাম্প অ্যালবাম—’

মহেশবাবুর বাকি কথা অরুণবাবুর কথায় ঢাকা পড়ে গেল। তিনি উন্মাদের মতো চোঁচিয়ে উঠেছেন—

‘আর তুমি? আমি যদি চোর হই তবে তুমি কী? তুমি কি ভেবেছ আমি জানি না? দীনদয়ালের কী হয়েছিল আমি জানি না? তোমার চিংকারে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সব দেখেছিলাম আমি পদার ফাঁক দিয়ে। পঁয়ত্রিশ বছর আমি মুখ বন্ধ রেখেছি। তুমি দীনদয়ালের মাথায় বাড়ি মেরেছিলে পিতলের বুদ্ধমূর্তি দিয়ে। দীনদয়াল মরে যায়। তারপর নূর মহম্মদ আর ড্রাইভারকে দিয়ে গাড়িতে করে তার লাশ—’

এর পরেই একটা ঝুপ শব্দ, আর কথা বন্ধ। তারপর শুধু পাখির ডাক আর জলের শব্দ।

টেপ রেকর্ডার বন্ধ করে সেটা প্রীতীনবাবুকে ফেরত দিয়ে দিল ফেলুদা।

মিনিটখানেক সকলেই চুপ, আর সকলেই কাঠ, এক ফেলুদা ছাড়া।

ফেলুদা রিভলভার চালান দিল পকেটে। তারপর বলল, ‘আপনার বাবা গর্হিত কাজ করেছিলেন, সাংঘাতিক অন্যায্য করেছিলেন, সেটা ঠিক, কিন্তু তার জন্য তিনি পঁয়ত্রিশ বছর যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, যত রকমে পেরেছেন প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। তবুও তিনি শাস্তি পাননি। যেদিন সেই ঘটনা ঘটে, সেইদিন থেকেই তাঁর ধারণা হয়েছে যে, তাঁর জীবনটা অভিশপ্ত, তাঁর অন্যায়ের শাস্তি তাঁকে একদিন না একদিন পেতেই হবে। অবিশ্যি সেই শাস্তি এভাবে তাঁর নিজের ছেলের হাত থেকে আসবে, সেটা তিনি ভেবেছিলেন কিনা জানি না।’

অরুণবাবু পাথরের মতো বসে আছেন মেঝের বাঘছালটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে। যখন কথা বললেন, তখন মনে হল তাঁর গলার স্বরটা আসছে অনেক দূর থেকে।

‘একটা কুকুর ছিল। আইরিশ টেরিয়ার। বাবার খুব প্রিয়। দীনদয়ালকে দেখতে পারত না কুকুরটা। একদিন কামড়াতে যায়। দীনদয়াল লাঠির বাড়ি মারে। কুকুরটা জখম হয়। বাবা ফেরেন রাত্তিরে—পাটি থেকে। কুকুরটা গুর ঘরেই অপেক্ষা করত। সেদিন ছিল না। নূর মহম্মদ ঘটনাটা বলে। বাবা দীনদয়ালকে ডেকে পাঠান। রাগলে বাবা আর মানুষ থাকতেন না....’

ফেলুদার সঙ্গে আমরাও উঠে পড়লাম। অখিলবাবুও উঠেছেন দেখে ফেলুদা বলল, ‘আপনি একটু আমাদের সঙ্গে আসতে পারেন কি? কাজ ছিল।’

‘চলুন’, বললেন ভদ্রলোক, ‘মহেশ চলে গিয়ে আমার তো এখন অর্থও অবসর।’

গাড়িতে অখিলবাবু বললেন— ‘আমার নাম লেখা পাথরটার পাশে দাঁড়িয়েই আমি ওদের কথা শুনে পাই। তাকে অনেক সময় জিগোস করেছি সে হঠাৎ হঠাৎ এত অন্যান্যনস্ক হয়ে পড়ে কেন। সে ঠাট্টা করে বলত—“তুমি শুনে বার কর, আমি বলব না।” আশ্চর্য—তার জীবনের এত বড় একটা ঘটনা—সেটা কুণ্ঠিতে ধরা পড়ল না কেন বুঝতে পারছি না! হয়ত আমারই অক্ষমতা।’

বাড়ির কাছাকাছি যখন পৌঁছেছি তখন বুঝতে পারলাম ফেলুদা কাকে ফোন করেছিল।

ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন শঙ্করলাল মিশ্র।

‘আপনার মিশন সাকসেসফুল?’ গাড়ি থেকে নেমে জিগোস করল ফেলুদা।

‘হ্যাঁ’, বললেন শঙ্করলাল, ‘বীরেন এসেছে।’

আমরা বৈঠকখানায় ঢুকতে সেই গেরুয়াধারী সন্ধ্যাসী সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে নমস্কার করলেন। লম্বা চুল, রুক্ষ লম্বা দাড়ি, লম্বা বলিষ্ঠ চেহারা।

‘বাপের শেষ ইচ্ছার কথা শুনে বীরেন আসতে রাজি হল,’ বললেন শঙ্করলাল, ‘মহেশবাবুর উপর কোনো আক্রোশ নেই ওর।’

‘যেমন আক্রোশ নেই, তেমনি আকর্ষণও নেই,’ বললেন বীরেন-সন্ধ্যাসী। ‘শঙ্কর এবার অনেক চেষ্টা করেছিল আমাকে ফিরিয়ে আনতে। বলেছিল—ওদের দেখলে তোমার টানটা হয়ত ফিরে আসবে। ওর কথাতেই আমি রাজরাণ্নায় গিয়েছিলাম সেদিন। কিন্তু দূর থেকে দেখেই আমি বুঝেছিলাম আমার আত্মীয়দের উপর আমার কোনো টান নেই। বাবা তবু আমাকে কিছুটা বুঝেছিলেন, তাই প্রথম প্রথম ওঁকে চিঠিও লিখেছি। কিন্তু তারপর...’

‘কিন্তু সে চিঠি তো আপনি বিদেশ থেকে লেখেননি,’ বলল ফেলুদা, ‘আমার বিশ্বাস আপনি দেশের বাইরে কোথাও যাননি কোনোদিন।’

বীরেনবাবু কিছুক্ষণ চূপ করে থেকে হঠাৎ হেসে ফেললেন। আমি হতভম্ব, কী যে হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না।

‘শঙ্কর আমাকে বলেছিল আপনার বুদ্ধির কথা,’ বললেন বীরেনবাবু, ‘তাই আপনাকে একটু পরীক্ষা করছিলাম।’

‘তাহলে আর .কী। খুলে ফেলুন আপনার অতিরিক্ত সাজ পোশাক। হাজারিবাগের রাস্তার লোকের পক্ষে ওটা যথেষ্ট হলেও আমার পক্ষে নয়।’

বীরেনবাবু হাসতে হাসতে তাঁর দাড়ি আর পরচুলা খুলে ফেললেন। লালমোহনবাবু আমার পাশ থেকে চাপা গলায় ‘কান্...কান্...কান্’ বলে থেমে গেলেন। আমি জানি তিনি আবার ভুল নামটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এবার বললেও আর শুধরোতে পারতাম না, কারণ আমার মুখ দিয়েও কথা বেরোচ্ছে না। কথা বললেন অখিলবাবু, ‘বীরেন বাইরে যায়নি মানে? ওর চিঠিগুলো তাহলে...?’

‘বাইরে না গিয়েও বিদেশ থেকে চিঠি লেখা যায় অখিলবাবু, যদি আপনার ছেলের মতো একজন কেউ বন্ধু থাকে বিদেশে, সাহায্য করার জন্য।’

‘আমার ছেলে!’

‘ঠিকই বলেছেন মিস্টার মিস্তির,’ বললেন বীরেন কারাণ্ডিকার, ‘অধীর যখন ডুসেলডর্ফে, তখন ওকে চিঠি লিখে আমি বেশ কিছু ইউরোপীয় পোস্টকার্ড আনিয়ে নিই। সেগুলোতে ঠিকানা আর যা কিছু লিখবার লিখে খামের মধ্যে ভরে ওর কাছেই পাঠাতাম, আর ও টিকিট লাগিয়ে ডাকে ফেলে দিত। অবিশ্যি অধীর দেশে ফিরে আসার পর সে সুযোগটা বন্ধ হয়ে যায়।’

‘কিন্তু এই লুকোচুরির প্রয়োজনটা হল কেন?’ জিগ্যেস করলেন অখিলবাবু।

‘কারণ আছে’ বলল ফেলুদা। ‘আমি বীরেনবাবুকে জিগ্যেস করতে চাই আমার অনুমান ঠিক কিনা।’

‘বলুন।’

‘বীরেনবাবু কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের জীবনী পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন, এবং তাঁর মতো হতে চেয়েছিলেন। সুরেশ বিশ্বাস যে ঘর ছেড়ে খালাসী হয়ে বিদেশে গিয়ে শেষে ব্রেজিলে যুদ্ধ করে নাম করেছিলেন সেটা আমার মনে ছিল। যেটা মনে ছিল না সেটা আমি কাল রাতে বাঙালীর সাকাস বলে একটা বই থেকে জেনেছি। সেটা হল এই যে সুরেশ বিশ্বাস ছিলেন প্রথম বাঙালী যিনি বাঘ সিংহ ট্রেন করে সাকাসের খেলা দেখিয়েছিলেন। তাঁর সবচেয়ে আশ্চর্য খেলা ছিল সিংহের মুখ ফাঁক করে তার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দেওয়া।’

এখানে লালমোহনবাবু কেন জানি ভীষণ ছটফট করে উঠলেন।

‘ও মশাই! হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ এই সেদিন পড়লুম, তাও খেয়াল হল না, হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ...’

‘আপনি ছ্যাছ্যাটা পরে করবেন, আগে আমাকে বলতে দিন।’

ফেলুদার ধমকে লালমোহনবাবু ঠাণ্ডা হলেন। ফেলুদা বলে চলল, ‘বীরেনবাবুর অ্যাশিশন ছিল আসলে বাঘ সিংহ নিয়ে খেলা দেখানো। কিন্তু বাঙালী ভদ্রঘরের ছেলে আজকের দিনে ওদিকে যেতে চাইছে শুনলে কেউ কি সেটা ভালো চোখে দেখত? মহেশবাবুই কি খুশি মনে মত দিতেন? তাই বীরেনবাবুকে কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তাই নয় কি?’

‘সম্পূর্ণ ঠিক,’ বললেন বীরেনবাবু।

‘কিন্তু আশ্চর্য এই যে, অ্যাডিন পরে ছেলেকে রিং-মাস্টার হিসেবে দেখেও মহেশবাবু তাকে চিনতে পেরেছিলেন, যদিও অরুণবাবু সামনে থেকে দেখেও চিনতে পারেননি। সেটার কারণ এই যে বীরেনবাবুর নাকে প্ল্যাস্টিক সাজারি করানো হয়েছিল, যে কারণে ছেলেবেলার ছবির সঙ্গেও নাকের মিল সামান্যই।’

‘তাই বলুন।’ বলে উঠলেন অখিলবাবু, ‘তাই ভাবছি সবাই বীরেন বীরেন করছে, অথচ আমি সঠিক চিনতে পারছি না কেন।’

‘যাক্ গো,’ বলল ফেলুদা, ‘এখন আসল কাজে আসি।’

ফেলুদা পকেট থেকে মুক্তানন্দের ছবিটা বার করল। তারপর বীরেনবাবুর দিকে ফিরে বলল, ‘আপনি বোধহয় জানেন না যে, আপনি আর ফিরবেন না ভেবে মহেশবাবু আপনাকে তাঁর উইল থেকে বাদ দিয়েছিলেন। সেই উইল আর বদল করার উপায় ছিল না। অথচ আপনি একেবারে বঞ্চিত হন সেটাও উনি চাননি। তাই এই ছবিটা আপনাকে দিয়েছেন।’

ফেলুদা ছবিটা উলটে পিছনটা খুলে ফেলল। ভিতর থেকে বেরোল একটা

ভাঁজ করা সেলোফেনের খাম, তার মধ্যে ছোট ছোট কতগুলো রঙিন কাগজের টুকরো।

‘তিনটি মহাদেশের নাট দুষ্প্রাপ্য ডাকটিকিট আছে এখানে। অ্যালবাম চুরি যেতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান স্ট্যাম্প ক’টি এইভাবে লুকিয়ে রেখেছিলেন। গিবনস ক্যাটালগের হিসেবে পঁচিশ বছর আগে এই ডাকটিকিটের দাম ছিল দু’ হাজার পাউন্ড। আমার ধারণা আজকের দিনে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা।’

বীরেন্দ্র কারাণ্ডিকার খামটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ দেখলেন সেটার দিকে। তারপর বললেন, ‘সার্কাসের রিং-মাস্টারের হাতে এ জিনিস যে বড় বেমানান, মিঃ মিস্ত্রি! আমি খুব অসহায় বোধ করছি। আমরা যাযাবর, ঘুরে ঘুরে খেলা দেখিয়ে বেড়াই, আমাদের কাছে এ জিনিস...?’

‘বুঝতে পারছি,’ বলল ফেলুদা, ‘এক কাজ করুন। ওটা আমাকেই দিন। কলকাতার কিছু স্ট্যাম্প ব্যবসায়ীর সঙ্গে চেনা আছে আমার। এর জন্য যা মূল্য পাওয়া যায় সেটা আমি আপনাকে পাঠিয়ে দেব। আমার উপর বিশ্বাস আছে তো আপনার?’

‘সম্পূর্ণ।’

‘কিন্তু আপনার ঠিকানাটা যে আমাকে দিতে হবে!’

‘গ্রেট ম্যাজেস্টিক সার্কাস,’ বললেন বীরেনবাবু, ‘কুড়ি বুঝেছে যে আমাকে ছাড়া তার চলবে না। আমি এখনো কিছুদিন আছি এই সার্কাসের সঙ্গে। আজ রাতে সুলতানকে নিয়ে খেলা দেখাব। আসবেন।’

★

রাতে গ্রেট ম্যাজেস্টিক সার্কাসে সুলতানের সঙ্গে কারাণ্ডিকারের আশ্চর্য খেলা দেখে বেরোবার আগে আমরা বীরেনবাবুকে থ্যাঙ্ক ইউ আর গুড বাই জানাতে তাঁর তাঁবুতে গেলাম। আইডিয়াটা লালমোহনবাবুর, আর কারণটা বুঝতে পারলাম তাঁর কথায়।

‘আপনার নামটার মধ্যে একটা আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা রয়েছে,’ বললেন জটায়ু, ‘ডু ইউ মাইন্ড যদি আমি নামটা আমার সামনের উপন্যাসে ব্যবহার করি? সার্কাস নিয়েই গল্প, রিং-মাস্টার একটা প্রধান চরিত্র।’

বীরেন্দ্রবাবু হেসে বললেন, ‘নামটা তো আমার নিজের নয়! আপনি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারেন।’

ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার পর ফেলুদা বলল, ‘তাহলে ইনজেকশন বাদ?’

‘বাদ কেন মশাই? ইনজেকশন দিচ্ছে বাঘকে। ভিলেন হচ্ছে সেকেন্ড ট্রেনার। বাঘকে নিস্তেজ করে কারাণ্ডিকারকে ডাউন করবে দর্শকদের সামনে।’

‘আর ট্র্যাপীজ?’

‘ট্র্যাপীজ ইজ নাথিং,’ অবজ্ঞা আর বিরক্তি মেশানো সুরে বললেন লালমোহন গাঙ্গুলী।

ডাঃ মুনসীর ডায়রি

আজ চায়ের সঙ্গে চানাচুরের বদলে সিঙ্গাড়া। লালমোহনবাবু কিছুদিন থেকেই বলছেন, 'খাই-খাই' বলে একটা দোকান হয়েছে মশাই, আমার বাড়ি থেকে হাফ-এ-মাইল, সেখানে দুর্দান্ত সিঙ্গাড়া করে। একদিন নিয়ে আসব।' আজ সেই সিঙ্গাড়া এসেছে, আর লালমোহনবাবুর কথা যে সত্যি, সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে।

'সামনের বৈশাখে আপনার যে বইটা বেরোবে তার ছক কাটা হয়ে গেছে?' জিগ্যেস করল ফেলুদা।

'ইয়েস স্যার! কম্পুটিয়ায় কম্পমান। এবার দেখবেন প্রখর রুদ্রের হাবভাব কায়দাকানুন অনেকটা ফেলু মিত্তিরের মতো হয়ে আসছে।'

'অর্থাৎ সে আরো প্রখর হয়ে উঠেছে এই তো?'

'তা তো বটেই।'

'গোয়েন্দার ইমপ্রুভমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে তার সৃষ্টিকর্তাও ইমপ্রুভ করছেন নিশ্চয়ই।'

'এই ক'বছর সমানে যে আপনার আশেপাশে ঘুর ঘুর করছি, তাতে অনেকটা বেনিফিট যে পাওয়া যাবে সেটাতো আপনি অস্বীকার করবেন না?'

'সেটা মানব যদি আপনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন।'

'কী পরীক্ষা?'

'পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরীক্ষা। বলুন তো আমার মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখছেন কিনা। আপনিতো গতকালও সকালে এসেছিলেন; আজকের আমি আর গতকালের আমার মধ্যে কোনো তফাত দেখছেন কি?'

লালমোহনবাবু উঠে দাঁড়িয়ে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে মিনিটখানেক ফেলুদাকে আপাদমস্তক স্টাডি করে বললেন, 'কই, না তো! উঁহ। নো ডিফারেন্স। কোনো

তফাত নেই।’

‘হল না। ফেল। অতএব প্রখর রুদ্রও ফেল। আপনি আসার দশ মিনিট আগে আমি প্রায় এক মাস পরে হাত আর পায়ের নখ কেটেছি। কিছু ঈদের চাঁদের মতো হাতের নখ এখনও মেঝেতে পড়ে আছে। ওই দেখুন।’

‘তাও তো!’

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণের জন্য খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে হঠাৎ ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, ‘ভেরি ওয়েল; এবার আপনি বলুনতোদেখি আমার মধ্যে কী চেষ্টা লক্ষ করছেন।’

‘বলব?’

‘বলুন।’

ফেলুদা চায়ের খালি কাপটা টেবিলে রেখে চারমিনারের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে বলল, ‘নাশ্বার ওয়ান, আপনি কাল অবধি লাক্স টয়লেট সোপ ব্যবহার করেছেন; আজ সিড্রলের গন্ধ পাচ্ছি। খুব সম্ভবত টি. ভি.-র বিজ্ঞাপনের চটকের ফলে।’

‘ঠিক বলেছেন মশাই। এনিথিং এল্‌স?’

‘আপনি পাঞ্জাবির বোতাম সব কটাই লাগিয়ে থাকেন; আজ অনেকদিন পর দেখছি ওপরেরটা খোলা। নতুন পাঞ্জাবিতে বোতাম লাগাতে অনেক সময় বেশ কসরত করতে হয়। ওপরেরটায় সেই কসরতে কোনো ফল হয়নি বলে মনে হচ্ছে।’

‘মোক্‌ম ধরেছেন।’

‘আরো আছে।’

‘কী?’

‘আপনি রোজ সকালে একটি করে রসুনের কোয়া চিবিয়ে খান; সেটা আপনি ঘরে এলেই বুঝতে পারি। আজ পারছি না।’

‘আর বলবেন না। ভরদ্বাজটা এমন কেয়ারলেস। দিয়েছি কড়া করে ধমক। এইট্রিসিঙ্ক থেকে রসুন ধরিচি মশাই, সকালে ডেইলি এক কোয়া। আমার সিসটেমটাই—’

জটায়ুর রসুনের গুণকীর্তন কমাতে হল, কারণ কলিং বেল বেজে উঠেছে। দরজা খুলে দেখি ফেলুদারই বয়সী এক ভদ্রলোক।

ফেলুদা উঠে দাঁড়াল।

‘আসুন—’

‘আপনিই তো?’

‘আমার নাম প্রদোষ মিত্র।’

ভদ্রলোক সোফায় বসে বললেন, ‘আমার নাম শঙ্কর মুনসী। আমার বাবার

নাম হয়ত আপনি শুনে থাকবেন, ডাক্তার রাজেন মুনসী।’

‘সাইকায়ারিষ্ট?’

আমি জানতাম যারা মনের ব্যারামের চিকিৎসা করে তাদের বলে সাইকায়ারিষ্ট।

‘সেদিনই খবরের কাগজে ঠুর বিষয় একটা খবর পড়লাম না? একটা ছবিও তো বেরিয়েছিল।’

‘হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন’, বললেন শঙ্কর মুনসী। ‘গত চল্লিশ বছর ধরে উনি একটা ডায়রি লিখেছেন, সেটা পেঙ্গুইন ছাপছে। আপনি হয়ত জানেন না। বাবার মনোবিজ্ঞানী হিসাবে সুনাম আছে ঠিকই, কিন্তু আরেকটা ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অসাধারণ। সেটা হল শিকার। পঁচিশ বছর আগে শিকার ছাড়লেও, এই ডায়রিতে তাঁর শিকারের অভিজ্ঞতার বর্ণনাও আছে। পেঙ্গুইন এখনো লেখাটা পড়েনি; সাইকায়ারিষ্ট শিকারীর ডায়রি শুনেই ছাপার প্রস্তাব দেয়। তবে লেখক হিসেবে যে বাবার সুনাম আছে সেটা তারা জানে। মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে চমৎকার ইংরিজিতে লেখা বাবার অনেক প্রবন্ধ নানান পত্র পত্রিকায় বেরিয়েছে।’

‘খবরটা কি আপনারাই কাগজে দেন?’

‘না, ওটা প্রকাশকের তরফ থেকে বেরোয়।’

‘আই সী।’

‘যাই হোক, এবার আসল ব্যাপারটায় আসি। বাবার গর্ব হচ্ছে যে এ ডায়রিতে তিনি একটিও মিথ্যা কথা লেখেননি। তিনজন লোককে নিয়ে তিনটি ঘটনার উল্লেখ আছে ডায়রিতে। যাদের পুরো নামটা ব্যবহার না করে বাবা নামের প্রথম অক্ষরটা ব্যবহার করেছেন। এই অক্ষর তিনটি হল “এ”, “জি”, আর “আর”। এরা তিনজনেই আজ সমাজে সম্মানিত, সাক্সেসফুল ব্যক্তি। কিন্তু তিনজনেই, বেশ অনেককাল আগে, তিনটি অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেন, এবং তিনজনেই নানান ফিকিরে আইনের হাত থেকে রেহাই পান। যদিও পুরো নাম ব্যবহার না করার দরুন বাবা আইনের হাত থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ। তবুও প্রকাশকের কাছ থেকে অফারটা পাবার পর বাবা তিনজনকেই ব্যাপারটা বলেন। “এ” আর “জি” প্রথমে আপত্তি তোলে, তারপর বাবা বুঝিয়ে বলার পর খানিকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হয়। “আর” নাকি কোনোরকম আপত্তি তোলেনি।

‘গতকাল দুপুরে খেতে বসেছি, এমন সময় চাকর এসে বাবাকে একটা চিঠি দেয়। সেটা পড়ে বাবার মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। কারণ জিগ্যেস করাতে বাবার মুখে প্রথম “এ”, “জি” আর “আর”-এর বিষয় শুনি, আগে কিছুই জানতাম না।’

‘কেন?’

‘বাবা লোকটা একটু পিকিউলিয়ার। উনি পেশা আর পেশেন্ট ছাড়া আর কিছু

জানেন না। আমি, মা, সংসার—এসব সম্পর্কেই বাবা সম্পূর্ণ উদাসীন। মা মানে আমার বিমাতা, স্টেপমাদার। আমার যখন তিন বছর বয়স তখন আমার মা মারা যান। তার দু বছর পরে বাবা আবার বিয়ে করেন। এই নতুন মা যে আমাকে খুব কাছে টেনে নিয়েছিলেন তা বলতে পারি না। আমাদের বাড়ির এক অনেক দিনের পুরানো চাকর আমার দেখাশুনা করত। সেই ব্যবধান এখনো রয়ে গেছে। যদিও এটা বলব যে বাবার স্নেহ যেমন পাইনি, তেমনি তাঁর শাসনও ভোগ করিনি।

‘এবং তাঁর ডায়রিও পড়েননি?’

‘না। শুধু আমি না, কেউই পড়েনি।’

‘আসল প্রসঙ্গ থেকে আমরা একটু দূরে সরে এসেছি। ওই চিঠি কি এই তিনজনের একজন লিখেছেন?’

‘ইয়েস, ইয়েস। এই দেখুন।’

শঙ্করবাবু একটা খাম বার করে ফেলুদাকে দিলেন। তা থেকে যে চিঠিটা বেরোল সেটা ফেলুদার পিছনে দাঁড়িয়ে আমি আর লালমোহনবাবুও পড়লাম। প্রথমেই তলায় দেখলাম ‘এ’। তার উপর লেখা ‘আই টেক ব্যাক মাই ওয়ার্ড। ডায়রি ছাপতে হলে আমার অংশ বাদ দিয়ে ছাপতে হবে। এটা অনুরোধ নয়, আদেশ। অমান্য করলে তার ফল ভোগ করতে হবে।’

‘একটা প্রশ্ন আছে’, বলল ফেলুদা। ‘এই তিন ব্যক্তির অপরাধের কথা আপনার বাবা জানলেন কী করে?’

‘সেও খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। কৌশলে আইনের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে “এ”, “জি” আর “আর” মনে শান্তি পায়নি। গভীর অনুশোচনা, শেষটায় ঘটনাচক্রে ধরা পড়ে যাবার ভয় ক্রমে মানসিক ব্যারামে দাঁড়ায়। বাবার তখনই বেশ নাম ডাক, এরা তিনজনেই বাবার কাছে আসে চিকিৎসার জন্য। সাইকোয়াট্রিস্টের কাছে তো আর কিছু লুকোনো চলে না; সব প্রশ্নের সঠিক জবাব না দিলে চিকিৎসাই হবে না। এই ভাবে বাবা এদের ঘটনাগুলো জানতে পারেন।’

‘হুমকি কি শুধু “এ”-ই দিয়েছে?’

‘এখন পর্যন্ত তাই, তবে “জি” সম্বন্ধেও বাবার সংশয় আছে!’

‘এই তিনজনের অপরাধ কী তা আপনি জানেন?’

‘না। শুধু তাই না; এদের আসল নাম, এখন এরা কী করছে, এসব কিছুই বলেননি বাবা। তবে আপনাকে নিশ্চয়ই বলবেন।’

‘উনি কি আমার খোঁজ করছেন?’

‘সেই জনেই তো এলাম। বাবা ঊঁর এক পেশেন্টের কাছ থেকে আপনার নাম শুনেছেন। আমাকে জিগোস করতে আমি বললাম গোয়েন্দা হিসেবে আপনার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। তাতে বাবা বললেন “মানুষের মনের চাবিকাঠি হাতে না



থাকলে ভালো গোয়েন্দা হওয়া যায় না। ঊঁকে একটা কল দিতে পারলে ভালো হত। এইসব হুমকি-টুমকিতে শান্তিভঙ্গ হয়। ফলে কাজের ব্যাঘাত হয়। সেটা আমি একেবারেই চাই না।” আমি তখনই বাবাকে জিগোস করি মিত্তিরকে কখন আসতে বলব। বাবা বললেন, রবিবার সকাল দশটা। এখন আপনি যদি...’

‘বেশ তো; আমার দিক থেকে আপত্তি করার তো কোনো কারণই নেই।’

‘তাহলে এই কথা রইল। রবিবার সকাল দশটা, নাথার সেভন সুইনহো স্ট্রীট।’

সাত নম্বর সুইনহো স্ট্রীট ডাক্তারের বাড়ি বলে মনেই হয় না ; তার সদর দরজা দিয়ে ঢুকে প্রথমেই চোখে পড়ে একটা দাঁড়ানো রয়েল বেঙ্গল টাইগার, আর তার পিছনের দেয়ালে উপর দিকে একটা বাইসনের মাথা ।

শঙ্করবাবু নিচেই অপেক্ষা করছিলেন, আমরা তাঁর সঙ্গে দোতলায় গিয়ে বৈঠকখানায় বসলাম । এঘরেও চতুর্দিকে শিকারের চিহ্ন । ভদ্রলোক ডাক্তারি করে এত জানোয়ার মারার সময় কী করে পেলেন তাই ভাবছিলাম ।

মিনিট খানেকের মধ্যেই ডাঃ মুনসী এসে পড়লেন । মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে, তবে এখনো যে বেশ শক্ত সমর্থ সেটা দেখলেই বোঝা যায় । ভদ্রলোক ফেলুদার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন, ‘আপনারতো ব্যায়ামকরা শরীর বলে মনে হচ্ছে । ভেরি গুড । আপনার কাজ প্রধানত মাথার হলেও আপনি যে শরীরের প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন সেটা দেখে ভালো লাগল ।’

এবার ভদ্রলোক জটায়ু ও আমার দিকে চাইতে ফেলুদা আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল ।

‘ঐরা ট্রাস্টওয়ার্ডি কি ?’ ডাঃ মুনসী প্রশ্ন করলেন ।

‘সম্পূর্ণ, বলল ফেলুদা, ‘তপেশ আমার খুড়তুতো ভাই এবং আমার সহকারী, আর মিঃ গান্ধলী আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ।’

‘এই জন্যে জিগেস করছি কারণ আজ সেই তিন ব্যক্তির আসল পরিচয় আমাকে দিতে হবে, না হলে আপনি কাজ করতে পারবেন না । এই পরিচয় শুধু আপনারা তিনজনই জানবেন, আর কেউ জানে না, আর কাউকে বলিনি ।’

‘আপনি নির্ভয়ে বলতে পারেন, ডাঃ মুনসী’, বললেন জটায়ু । ‘আমি অন্তত আর কাউকে বলব না ।’

‘ভেরি ওয়েল ।’

‘তাহলে বলুন কী করতে পারি । হুমকি চিঠির কথা আপনার ছেলে বলেছেন ।’

‘শুধু হুমকি চিঠি নয়’, বললেন ডাঃ মুনসী, ‘হুমকি টেলিফোনও বটে । এটা কাল রাত্রের ঘটনা । তখন সাড়ে এগারোটা বোঝাই যায় মত্ত অবস্থায় ফোন করছে । হিগিন্স । জর্জ হিগিন্স ।’

‘আপনার ডায়রির “জি” ?’

‘ইয়েস । বলে কী—“সেদিন টেলিফোনে আমি অত্যন্ত বোকার মতো কথা বলেছি । যখন তোমার কাছে ট্রাটমেন্টের জন্য যাই, তখন আমার যে ব্যবসা ছিল, এখনও সেই ব্যবসাই রয়েছে । একচেটিয়া ব্যবসা আমার, সুতরাং ‘জি’ থেকে অনেকেই আমার আসল পরিচয় অনুমান করতে পারবে । সো কাট মি আউট ।’

মাতালকে তো আর যুক্তি দিয়ে কিছু বোঝানো যায় না । ফলে ফোন রেখে দিতে হল । বুঝতেই পারছেন, আমি রুগী নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি যে এদের বাড়ি গিয়ে সামান্যসামান্য কথা বলে যে কিছু বোঝাবো তার সময় বা সামর্থ্য আমার নেই । এ কাজের ভারটা আমি আপনাকে দিতে চাই । “এ” এবং “জি” । “আর”—কে নিয়ে চিন্তার কারণ নেই । কারণ তার সঙ্গে কথা বলে জেনেছি যে নামের আদ্যক্ষর থেকে তাকে কেউ চিনে ফেলবে এ আশঙ্কা তার নেই ।

‘কিন্তু এই তিনজনের আসল পরিচয়টা— !’

‘কাগজ পেনসিল আছে ?’

ফেলুদা পকেট থেকে নোটবুক আর ডট পেন বার করল ।

‘লিখুন, “এ” হল অরুণ সেনগুপ্ত । ম্যাকনীল কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার, রোটারি ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট । বাসস্থান এগারো নম্বর রোল্যান্ড রোড । ফোন নম্বর ডিরেক্টরিতে দেখে নেবেন ।’

ফেলুদা চটপট ব্যাপারটা লিখে নিল ।

‘এবার লিখুন’, বলে চললেন ডাঃ মুনসী, ‘জি’ হল জর্জ হিগিন্স । টেলিভিশনের জন্য বিদেশে জানোয়ার চালান দেবার ব্যবসা ঐর । বাড়ির নম্বর নব্বুই রিপন স্ট্রীট । রাস্তার নাম থেকে বুঝতে পারবেন উনি পুরো সাহেব নন, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান । তৃতীয় ব্যক্তির আসল পরিচয় প্রয়োজন হলে দেব, নচেৎ নয় ।’

‘এদের অপরাধগুলো ?’

‘শুনুন, আমার পাণ্ডুলিপি আজ আপনি নিয়ে যাবেন । মন দিয়ে পড়ে আপনার বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগ করে আমাকে বলবেন এতে আপত্তিকর কিছু আছে কিনা যার ফলে বইটা বাজারে বেরোলে আমার ক্ষতি হতে পারে ।’

‘ঠিক আছে । তাহলে—’

ফেলুদাকে থামতে হল, কারণ ঘরে তিনজন লোকের প্রবেশ ঘটেছে । ডাঃ মুনসী তাদের দিকে দেখিয়ে বললেন, ‘আপনি আসছেন শুনে ঐরা সকলেই আপনাকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন । আমার স্ত্রী ছাড়া এই কজন এবং আমার ছেলেই এখন আমার বাড়ির বাসিন্দা । আলাপ করিয়ে দিই, এ হচ্ছে সুখময় আমার সেক্রেটারি ।’

একজন চশমা-পরা বছর চল্লিশেকের ভদ্রলোকের দিকে দেখালেন ডাঃ মুনসী ।

‘আর ইনি হচ্ছেন আমার শ্যালক চন্দ্রনাথ ।’

ঐর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি । দেখে কেন জানি মনে হয় ইনি বিশেষ কিছু করেন-টরেন না, এ বাড়িতে আশ্রিত হয়ে রয়েছেন ।

‘আর ইনি আমার পেশেন্ট রাধাকান্ত মল্লিক । ঐর চিকিৎসা শেষ না হওয়া

পর্যন্ত এখানেই আছেন ।’

ঐকে দেখে মনে হয় ঐর অসুখ এখনো সারেনি । হাত কচলাচ্ছেন, চোখ পিট পিট করছেন, আর একটানা সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না । বয়স আন্দাজ চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ ।

পরিচয়ের পরে একমাত্র সুখময়বাবু ছাড়া আর সকলেই চলে গেলেন । ডাঃ মুনসী সেক্রেটারির দিকে ফিরে বললেন, ‘সুখময়, যাও, আমার লেখাটা এনে প্রদোষবাবুকে দাও ।’

ভদ্রলোক দু মিনিটের মধ্যে একটা বড়, মোটা খাম এনে ফেলুদাকে দিলেন ।

‘ওর কিন্তু আর কপি নেই’, বললেন ডাঃ মুনসী । ‘পাবলিশারকে দেবার আগে ওটা সুখময় টাইপ করে দেবে ।’

‘আপনি কোনো চিন্তা করবেন না’, বলল ফেলুদা, ‘আমি এটার মূল্য খুব ভালোভাবেই জানি ।’

আমরা উঠে পড়লাম । শঙ্করবাবু পাশের ঘরেই অপেক্ষা করছিলেন । এবার এসে আমাদের সদর দরজা অবধি পৌঁছে দিলেন । তারপর লালমোহনবাবুর সবুজ অ্যান্ডসাদরে চড়ে আমরা বাড়িমুখে রওনা দিলাম ।

‘একটা রিকুয়েস্ট আছে মশাই’, লালমোহনবাবু হঠাৎ বললেন ।

‘কী ?’

‘আপনার পড়া হলে পর আমি একবার দু দিনের জন্য পাণ্ডুলিপিটা নেবো । এটা রিফিউজ করবেন না, প্লীজ !’

‘আপনার না পড়লেই নয় ?’

‘না-পড়লেই নয় । বিশেষ করে শিকার কাহিনী পড়তে আমার দুর্দান্ত লাগে ।’

‘বেশ, দেবো । তবে দু দিন নয় ; আপনি যে সকালে নেবেন, তার পরের দিন সকালেই ফেরত দিতে হবে । তার মধ্যে শিকারের অংশ আপনার নিশ্চয়ই পড়া হয়ে যাবে । কারণ ১৯৬৫-এর পর তো আর ভদ্রলোক শিকার করেননি ।’

‘তাই সই ।’

॥ ৩ ॥

ডাঃ মুনসীর হাতের লেখা বেশ পরিষ্কার হলেও, তিনশো পঁচাত্তর পাতার পাণ্ডুলিপিটা পড়তে ফেলুদার লাগল তিন দিন । এত সময় লাগার একটা কারণ অবিশ্যি এই যে ফেলুদা পড়ার ফাঁকে ফাঁকে অনেক কিছু নিজের খাতায় নোট করে নিচ্ছিল ।

তিন দিনের পরের দিন রবিবার সকালে যথারীতি জটায়ু এসে হাজির । প্রথম প্রশ্নই হল, ‘কী স্যার, হল ?’

‘হয়েছে ।’

‘আপনি কী সিদ্ধান্তে এলেন শুনি । এ ডায়রি নির্ভয়ে ছাপার যোগ্য ?’

‘সম্পূর্ণ । তবে তাতে তো ছমকি বন্ধ করা যায় না । এই তিনজনের একজনও যদি ধরে বসে থাকে যে নামের আদ্যক্ষর থেকেই লোকে বুঝে ফেলবে কার কথা বলা হচ্ছে তাহলে সে এ বই ছাপা বন্ধ করার জন্য কী যে না করতে পারে তার ঠিক নেই ।’

‘ইভন মার্জার ?’

‘তা তো বটেই । একজনের কথাই ধরা যাক । “এ” অরুণ সেনগুপ্ত । পূর্ববঙ্গের এক জমিদার বংশের ছেলে । যুবা বয়সে ছিলেন এক ব্যাঙ্কের মধ্য পদস্থ কর্মচারী । কিন্তু রক্তের মধ্যে ছিল চূড়ান্ত সৌখিনতা । ফলে প্রতি মাসেই আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি । শেষে কাবুলিওয়ালার শরণাপন্ন হওয়া ।’

এই ফাঁকে বলে রাখি, ফেলুদা একবার বলেছিল যে আজকাল আর দেখা যায় না বটে কিন্তু বছর কুড়ি আগেও রাস্তার মোড়ে মোড়ে দেখা যেত লাঠি হাতে কাবুলিওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে । এদের ব্যবসা ছিল মোটা সুদে টাকা ধার দেওয়া ।

ফেলুদা বলে চলল, ‘একটা সময় আসে যখন দেনার অঙ্কটা এমন ফুলে ফেঁপে ওঠে যে মরিয়া হয়ে অরুণ সেনগুপ্তকে ব্যাঙ্কের তহবিল থেকে চল্লিশ হাজার টাকা চুরি করতে হয় । কিন্তু সেটা সে এমন কৌশলে করে যে দোষটা গিয়ে পড়ে একজন নির্দোষ কর্মচারীর উপর । ফলে সে বেচারিকে জেল খাটতে হয় ।’

‘বুঝেছি,’ বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বললেন জটায়ু । ‘তারপর অনুশোচনা, তারপর মাথার ব্যারাম, তারপর মনোবিজ্ঞানী । ...কিন্তু ভদ্রলোক যে এখন একেবারে সমাজের উপর তলায় বাস করছেন । তার মানে মুনসীর চিকিৎসায় কাজ দিয়েছিল ?’

‘তা তো বটেই । সে কথা মুনসী তাঁর ডায়রিতে লিখেওছেন—যদিও তারপরে আর কিছু লেখেননি । কিন্তু আমরা বেশ অনুমান করতে পারি যে এই ঘটনার পর সেনগুপ্ত নিশ্চয়ই তার জীবনের ধারা পালটে ফেলে ত্রিশ বছর ধরে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে উপরে উঠে আজকের অবস্থায় পৌঁছেছেন । বুঝতেই পারেন সেখান থেকে আবার পিছলে পড়ার আশঙ্কা যদি দেখা দেয়, যতই অমূলক হোক, তাহলে সেনগুপ্ত সাহেব মাথা ঠিক রাখেন কী করে ?’

‘বুঝলাম,’ বললেন জটায়ু, ‘আর অন্য দুজন ?’

‘আর’ ব্যক্তি সম্বন্ধে চিন্তার কোনো কারণ নেই সে তো সেদিন মুনসীর মুখেই শুনলেন । ঐর আসল নামটা উনি বলেননি, তাই আমিও বলতে পারছি না । ইনি এককালে একটি লোককে গাড়ি চাপা দিয়ে মারেন, তারপর এদিকে ওদিকে মোটা ঘুষ দিয়ে আইনের হাত থেকে নিজেকে বাঁচান । ইনিও ডাঃ মুনসীর হাতে

নিজেকে সমর্পণ করে বিবেকযন্ত্রণা থেকে রেহাই পান।...ইন্টারেস্টিং হল “জি”-র ঘটনা।’

‘কী রকম?’

‘ইনি যে ফিরিস্টি সে তো জানেন। আর ঐর ব্যবসার কথাও জানেন। নব্বই নম্বর রিপন স্ট্রীটে একটি বড় দোতলা বাড়িতে থাকতেন জর্জ হিগিন্স। ১৯৬০-এ এক সুইডিশ ফিল্ম পরিচালক কলকাতায় আসেন ভারতবর্ষের ব্যাকগ্রাউণ্ডে একটা ছবি করবেন বলে। তাঁর গল্পের জন্য একটি লেপার্ডের প্রয়োজন ছিল। ইনি হিগিন্সের খবর পেয়ে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন। হিগিন্সের একটা লেপার্ড ছিল বটে, কিন্তু সেটা রপ্তানীর জন্য নয়; সেটা তার পোষা! অনেক টাকা দিয়ে সেটা কিনে নেওয়া যায় কিনা তা জানতে চান। হিগিন্সের একটা লেপার্ডটাকে মিত্যা কথা বলেন, কারণ তাঁর গল্পে ছিল গ্রামবাসীরা সবাই মিলে লেপার্ডটাকে মেরে ফেলে। এক মাস পরে পরিচালক এসে হিগিন্সকে আসল ঘটনাটা বলে। হিগিন্স প্রচণ্ড রেগে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে তখনই পরিচালকের টুটি টিপে তাকে মেরে ফেলে। পরমুহুর্তে রাগ চলে গিয়ে তার জায়গায় আসে আতঙ্ক। কিন্তু সেই অবস্থাতেও পুলিশের চোখে ধুলো দেবার ফন্দি হিগিন্স বার করে। সে প্রথমে ছুরি দিয়ে মৃত পরিচালকের সর্বাঙ্গ ক্ষতচিহ্নে ভরিয়ে দেয়। তারপর তার কালেকশনের একটা হিংস্র বনবেড়ালকে খাঁচার দরজা খুলে বাইরে বার করে সেটাকে গুলি করে মারে। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়ায়, খাঁচা ছাড়া বনবেড়াল পরিচালককে হত্যা করে এবং বনবেড়ালকে হত্যা করে হিগিন্স। ফিকিরটা কাজে দেয়, হিগিন্স আইনের হাত থেকে বাঁচে। কিন্তু তারপর একমাস ধরে ক্রমাগত স্বপ্নে নিজেকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে দেখে অগত্যা মুনসীর চেম্বারে গিয়ে হাজির হয়।’

‘হু...’ বললেন জটায়ু। ‘তাহলে এখন কিং কর্তব্য?’

‘দুটো কর্তব্য,’ বলল ফেলুদা। ‘এক হল পাণ্ডুলিপিটা আপনাকে দেওয়া, আর দুই—“এ”কে একটা টেলিফোন করা।’

জটায়ু হাসিমুখে ফেলুদার হাত থেকে পাণ্ডুলিপি ভরা মোটা খামটা নিয়ে বললেন, ‘ফোন করবেন কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার জন্য?’

‘ন্যাচারেলি,’ বলল ফেলুদা। ‘আর দেরি করার কোনো মানে হয় না। তোপসে—এসেনগুপ্ত, ১১ রোল্যান্ড রোড, নম্বরটা বার করতো।’

আমি ডাইরেক্টরিটা হাতে নিতেই ফোনটা বেজে উঠল। আমিই ধরলাম। ডাঃ মুনসী। ফেলুদাকে বলতেই ও আমার হাত থেকে ফোনটা ছিনিয়ে নিল।

ব্যাপার আর কিছুই নয়—সেনগুপ্ত আরেকটা হুমকি চিঠি দিয়েছেন। তাতে কী বলা হয়েছে সেটা ফেলুদা তার খাতায় লিখে নিল। তারপর ফেলুদা তার শেষ কথাটা বলে ফোনটা রেখে দিল।

সেনগুপ্তের দ্বিতীয় হুমকিটা হচ্ছে এই—‘সাতদিন সময়। তার মধ্যে কলকাতার প্রত্যেক বাংলা ও ইংরিজি কাগজে বিজ্ঞপ্তি দেখতে চাই যে অনিবার্য কারণে ডায়রি ছাপা সম্ভব হচ্ছে না। সাতদিন। তারপরে আর হুমকি নয়—কাজ, এবং কাজটা আপনার পক্ষে প্রীতিকর হবে না বলাই বাহুল্য।’

আমি সেনগুপ্তের ফোন নম্বর বার করে ডায়াল করে একবারেই লাইন পেয়ে গেলাম। ফেলুদার হাতে ফোনটা চালান দিয়ে আমি আর জটায়ু কেবল ফেলুদার কথাটাই শুনলুম। সেটা শুনে যা দাঁড়াল তা এই—

‘হ্যালো—মিঃ সেনগুপ্তের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি কি—অরুণ সেনগুপ্ত?’

‘_____’

‘মিঃ সেনগুপ্ত? আমার নাম প্রদোষ মিত্র।’

‘_____’

‘হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। ইয়ে—আমায় একদিন পাঁচ মিনিট সময় দিতে পারেন?’

‘_____’

‘তাই বুঝি? আশ্চর্যতো! কী ব্যাপার?’

‘_____’

‘তা পারি বৈকি। কটায় গেলে আপনার সুবিধে?’

‘_____’

‘ঠিক আছে। তাই কথা রইল।’

‘ভাবতে পারিস?’ ফোনটা রেখে বলল ফেলুদা, ‘ভদ্রলোক নাকি আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমাকে ফোন করতেন।’

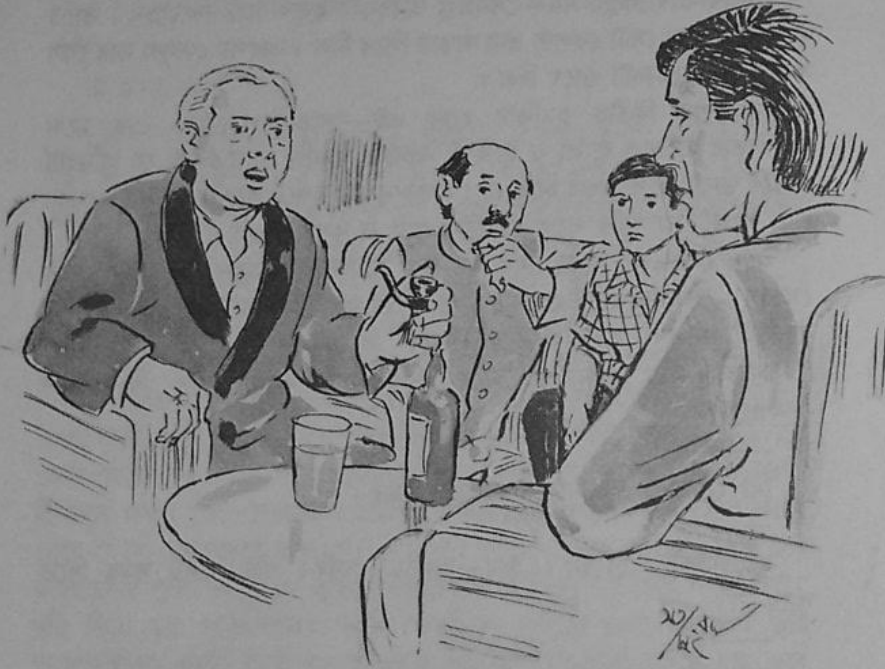
‘কেন, কেন?’ প্রশ্ন করলেন জটায়ু।

‘সেটা ফোনে বললেন না, সামনা সামনি বলবেন।’

‘কখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট?’

‘আধ ঘন্টা বাদে।’

এগারো নম্বর রোল্যান্ড রোড সাহেবী আমলের দোতলা বাড়ি। দরজার বেল টিপতে একজন উর্দীপরা বেয়ারার আবির্ভাব হল। সে কাপেট ঢাকা কাঠে সিঁড়ি দিয়ে আমাদের দোতলায় নিয়ে গিয়ে বৈঠকখানায় বসালো। মিনিট দুয়েকের



মধ্যেই মিঃ সেনগুপ্ত প্রবেশ করলেন। বাড়ির সঙ্গে মানানসই সাহেবী মেজাজ ; পরনে ড্রেসিং গাউন, পায়ে বেডরুম স্লিপার, হাতে চুরুট।

পরিচয় পর্ব শেষ হলে পর ভদ্রলোক জিগোস করলেন, 'আপনারা ড্রিংক করেন ?'

'আজ্ঞে না', বলল ফেলুদা।

'আমি যদি বিয়ার খাই আশা করি আপনারা মাইন্ড করবেন না ?'

'মোটাই না।'

ভদ্রলোক বেয়ারাকে ডেকে নিজের জন্য বিয়ার আর আমাদের তিনজনের জন্য চায়ের অর্ডার দিয়ে ফেলুদার দিকে দৃষ্টি দিলেন। ফেলুদা বলল, 'আপনি আমাকে কেন ফোন করতে যাচ্ছিলেন সেটা আগে বলতে আপনার কোনো আপত্তি আছে ? তারপর আমি আমার দিকটা বলব।'

'বেশতো। জে. পি. চাওলার নাম শুনেছেন ?'

'ব্যবসাদার ? গুরুপ্রসাদ চাওলা ? যার নামে চাওলা ম্যানসনস ?'

'হ্যাঁ।'

'তাঁর এক নাতি তো- ?'

'হ্যাঁ। মিসিং। সম্ভবত কিডন্যাপড।'

'কাগজে দেখছিলাম বটে।'

'গুরুপ্রসাদ আমার অনেকদিনের বন্ধু। পুলিশ তদন্ত করছে বটে, কিন্তু আমি ওকে আপনার নাম সাজেস্ট করি। ভুলু সেহানবিশের কাছে আপনার খুব সুখ্যাতি শুনেছি।'

'হ্যাঁ, একটা ব্যাপারে ঠুকে আমি হেল্প করি।'

'তাহলে চাওলাকে কী বলব ?'

'মিঃ সেনগুপ্ত, দুঃখের বিষয় আমি অলরেডি একটা কেস হাতে নিয়ে ফেলেছি।'

'আই সী।'

'আর সেই ব্যাপারেই আমি আপনার কাছে এসেছি।'

'কী ব্যাপারে শুনি ?'

'আমি ডাঃ মুনসীর কাছ থেকে আসছি।'

'হোয়াট !'

ভদ্রলোক সোফা থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন।—'মুনসী আপনাকে আমার পরিচয় দিয়ে দিয়েছে ? তার মানেতো আর কদিনে রাজ্যসুদ্ধ লোক জেনে যাবে মুনসীর ডায়রির "এ" ব্যক্তিটি আসলে কে।'

'মিঃ সেনগুপ্ত, আমি অত্যন্ত সাবধানী লোক। গোপন ব্যাপার কী করে গোপন রাখতে হয় তা আমি জানি। আমার উপর আপনি সম্পূর্ণ ভরসা রাখতে পারেন। তবে আপনি যদি ঘন ঘন ডাঃ মুনসীকে হুমকি চিঠি দেন, তার ফল কী হবে সেটা আমি জানি।'

'আমি হুমকি চিঠি দেব না কেন ? আপনি ডায়রিটা পড়েছেন ?'

'পড়েছি।'

'আপনার কী মনে হয়েছে ?'

'ত্রিশ বছরের পুরানো ঘটনা। এর মধ্যে অন্তত শ' পাঁচেক ব্যাঙ্কে তহবিল তহরুপ হয়েছে। যারা এ কাজ করেছে হয়ত তাদের অনেকেরই নামের প্রথম অক্ষর "এ"। সুতরাং আপনার ভয় সম্পূর্ণ অমূলক।'

'মুনসী কি ব্যাঙ্কের নাম করেছে ?'

'না।'

'আমার ব্যাঙ্কে দুজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিল যারা চুরির ব্যাপারে আমাকে সন্দেহ করে, কারণ ঠেকায় পড়ে আমি দুজনের কাছে টাকা ধার চেয়েছিলাম। দুজনেই অবিশ্যি রিফিউজ করে।'

‘মিঃ সেনগুপ্ত, আমি আবার বলছি—আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই। আর এই ধরনের চিঠি দিয়ে আপনার লাভটা কী হচ্ছে? ডাঃ মুনসী আইনের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ নিরাপদ। অর্থাৎ আপনি কোনো লিগ্যাল স্টেপ নিতে পারছেন না। তা হলে কি আপনি আইনের বাইরে কোনো রাস্তা ভাবছেন?’

‘আমার বিপদের আশঙ্কা দেখলে আমি আইন-টাইন মানব না মিঃ মিস্ত্রি। আমার অতীতের ইতিহাস থেকেই আপনি বুঝছেন যে প্রয়োজনে বেপরোয়া কাজ করতে আমি দ্বিধা করি না।’

‘আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, মিঃ সেনগুপ্ত। তখনকার আপনি আর এখনকার আপনি কি এক? আজ আপনি সমাজে সম্মানিত ব্যক্তি। এই অবস্থায় আপনি এমন একটা ঝুঁকি নেবেন?’

মিঃ সেনগুপ্ত মিনিট খানেক কিছু না বলে কেবল চুপ্ চুপ্ করে বিয়ার খেলেন। তারপর তাঁর চাউনির সামান্য পরিবর্তন দেখা গেল। তারপর তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এক চুমুকে বাকি বিয়ারটা শেষ করে গেলাসটা টেবিলে রেখে বললেন, ‘ঠিক আছে—ড্যাম ইট! লেট হিম গো অ্যাহেড।’

‘আপনি তাহলে হুমকির ব্যাপারে ইতি দিচ্ছেন?’

‘ইয়েস ইয়েস ইয়েস!—তবে বিপদের বিন্দুমাত্র আশঙ্কা দেখলেই কিন্তু—‘আর বলতে হবে না’, বলল ফেলুদা, ‘বুঝেছি।’

॥ ৫ ॥

লালমোহনবাবু কথামতো পরদিন সকালেই পাণ্ডুলিপিটা ফেরত নিয়ে এলেন। ফেলুদা বলল, ‘এখন আর চা খাওয়া হবে না। কারণ আধ ঘণ্টার মধ্যেই “জি”-র সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট।’

নব্বই নম্বর রিপন স্ট্রীটের দরজায় বেল টিপতে যাঁর আবির্ভাব হল তাঁর মাথায় টাক, কানের পাশের চুল সাদা, আর এক জোড়া বেশ তাগড়াই গৌফ, তাও সাদা।

‘মিঃ মিটার, আই অ্যাম জর্জ হিগিন্স।’

তিনজনের সঙ্গেই করমর্দনের পর হিগিন্স আমাদের নিয়ে দোতলায় চলল। গেট দিয়ে বাড়িতে ঢুকেই দুটো বেশ বড় খাঁচা দেখেছি, তার একটায় বাঘ, অন্যটায় দুটো হায়না। দোতলায় উঠে বাঁয়ে একটা ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম তাতে গোটা পাঁচেক কোয়ালা ভাল্লুক বসে আছে মেঝেতে।

বসবার ঘরে পৌঁছে সোফায় বসে হিগিন্স ফেলুদাকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করল, ‘ইউ আর এ ডিটেকটিভ?’



‘এ প্রাইভেট ওয়ান’, বলল ফেলুদা।

বাকি কথাও ইংরিজিতেই হল, যদিও হিগিন্স মাঝে মাঝে হিন্দিও বলে ফেলছিলেন, বিশেষ করে কারুর উদ্দেশ্যে গালি দেবার সময়। অনেকের উপরেই ভদ্রলোকের রাগ। যদিও কারণটা বোঝা গেল না। অবশেষে বললেন, ‘মানসি তাহলে এখনো প্র্যাকটিস করে? আই মাস্ট সে, সে আমার বিপদের সময় অনেক উপকার করেছিল।’

‘তাহলে আর আপনি তাকে শাসাচ্ছেন কেন?’ প্রশ্ন করল ফেলুদা।

হিগিন্স একটুক্ষণ চুপ থেকে বলল, ‘সেটার একটা কারণ হচ্ছে সেদিন রাতে

নেশার মাত্রাটা একটু বেশি হয়েছিল। তবে মানুষের কি ভয় করে না? আমার বাবা কী ছিলেন জান? স্টেশন মাস্টার। আর আমি নিজের চেষ্ঠায় আজ কোথায় এসে পৌঁছেছি দেখ। এ আমার একচেটিয়া ব্যবসা। মানসির ডায়রি ছাপা হলে যদি আমাকে কেউ চিনে ফেলে তাহলে আমার আর আমার ব্যবসার কী দশা হবে ভাবতে পার?

ফেলুদাকে আবার বোঝাতে হল যে হিগিন্স আইন বাঁচিয়ে কিছুই করতে পারবেন না। তাকে আবার ব্যাঁকা রাস্তায় যেতে হবে। 'সেটাই কি তুমি চাইছ?' বেশ জোরের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল ফেলুদা। 'তাতে কি তোমার প্রেসটিজ আরো বেশি বিপন্ন হবে না?'

হিগিন্স কিছুক্ষণ চুপ করে বিড়বিড় করে বললেন, 'একবার কেন, শতবার খুন করতে পারতাম ও পাজি সুইডিশটাকে। বাহাদুর, আমার সাধের লেপার্ড, মাত্র চার বছর বয়স, তাকে কিনা লোকটা মেরে ফেলল!...'

আবার দশ সেকেন্ডের জন্য কথা বন্ধ; তারপর হঠাৎ সোফার হাতল চাপড়ে গলা তুলে হিগিন্স বললেন, 'ঠিক আছে; মানসিকে বলো আমি কোনো পরোয়া করি না। ও যা করছে করুক, বই বেরোলে লোকে আমাকে চিনে ফেললেও আই ডোন্ট কেয়ার। আমার ব্যবসা কেউ টলাতে পারবে না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, মি. হিগিন্স, থ্যাঙ্ক ইউ।'

অরুণ সেনগুপ্তের খবরটা ফেলুদা আগেই ফোনে ডাঃ মুনসীকে জানিয়ে দিয়েছিল। হিগিন্সের খবরটা দিতে আমরা মুনসীর বাড়িতে গেলাম, কারণ পাণ্ডুলিপিটা ফেরত দেবার একটা ব্যাপার ছিল। ভদ্রলোক ফেলুদাকে একটা বড় রকম ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, 'তাহলে তো আপনার কর্তব্য সারা হয়ে গেল। এবারে আপনার ছুটি!'

'আপনি ঠিক বলছেন? "আর" সম্বন্ধে কিছু করার নেই তো?'

'নাথিং।... আপনি আপনার বিল পাঠিয়ে দেবেন, আমি ইমিডিয়েটলি পেমেন্ট করে দেব।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।'

'এটাকে কি মামলা বলা চলে?' বাড়ি ফিরে এসে বলল জটায়ু।

'মিনি মামলা বলতে পারেন। অথবা মামলাগু।'

'যা বলেছেন।'

'আশ্চর্য এই যে এমন গর্হিত কাজ করার পঁচিশ ত্রিশ বছর পরে লোকগুলো শুধু বেঁচে নেই, দিব্যি সুখ স্বাস্থ্যে চালায়ে যাচ্ছে।'

'হুক কথা', বললেন জটায়ু। 'কালই বাড়িতে বসে ভাবছিলুম ত্রিশ বছর আগে

যাদের চিনতুম তাদের কারুর সঙ্গে আজও যোগাযোগ আছে কিনা, বা তারা এখন কে কী করছে সেটা জানি কিনা। বিশ্বাস করুন আজই আধ ঘণ্টা ভেবে শুধু একটা নাম মনে পড়ল, অপারেশ চাটুজো, যার সঙ্গে একসঙ্গে বসে বায়স্কোপ দেখিচি, ফুটবল খেলা দেখিচি, সাঙ্গুভ্যালিতে বসে চা খেইচি।'

'সে এখন কী করে জানেন?'

'উঁহ। আউট অফ টাচ। কমপ্লীটলি। কবে কীভাবে যে ছাড়াছাড়িটা হল, সেটা অনেক ভেবেও মনে করতে পারলুম না।'

পরদিন সকালে লালমোহনবাবু এসে ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনাকে একটু ডাউন বলে মনে হচ্ছে? বেকারত্ব ভালো লাগছে না বুঝি।'

ফেলুদা মাথা নেড়ে বলল, 'নো স্যার, তা নয়, একটা ব্যাপারে কৌতূহল নিবৃত্তি হল না বলে অসোয়াস্তি লাগছে।'

'কী ব্যাপার?'

'"আর" ব্যক্তিটির আসল পরিচয়। ইনি একটা হুমকি-টুমকি দিলে মন্দ হত না।'

'রটন, রাবিশ, রিডিকুলাস', বললেন জটায়ু। '"আর" জাহান্নমে যাক। আপনি আপনার যা প্রাপ্য তা তো পাচ্ছেনই।'

'তা পাচ্ছি।'

ফোনটা বেজে উঠল। আমিই ধরলাম। 'হ্যালো' বলতে ওদিক থেকে কথা এল 'আমি শঙ্কর বলছি।' আমি ফোনটা ফেলুদার হাতে চালান দিলাম।

'বলুন স্যার।'

উত্তরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ফেলুদার কপালে গভীর খাঁজ পড়ল। তিন-চারটে 'হঁ' বলেই ফেলুদা ফোনটা রেখে দিয়ে বলল, 'সাংঘাতিক খবর। ডাঃ মুনসী খুন হয়েছেন, আর সেই সঙ্গে ডায়রিও উধাও।'

'বলেন কী!' চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে বললেন জটায়ু।

'ভেবেছিলাম শেষ। আসলে এই সবে শুরু।'

আমরা আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে লালমোহনবাবুর গাড়িতে বেরিয়ে পড়লাম।

সুইনহো স্ট্রীটে পৌঁছে দেখি পুলিশ আগেই হাজির। ইনস্পেক্টর সোম ফেলুদার চেনা, বললেন, 'মাঝ রাত্তিরে খুনটা হয়েছে, মাথার পিছন দিকে ভারী কিছু দিয়ে মেরেছে।'

'কে প্রথম জানল?'

'ওঁর বেয়ারা। ভদ্রলোক ভোর ছটায় চা খেতেন। সেই সময়ই বেয়ারা

ব্যাপারটা জানতে পারে। ডাঃ মুনসীর ছেলে বাড়ি ছিলেন না। পুলিশে খবর দেন ডাঃ মুনসীর সেক্রেটারি !

‘আপনাদের জেরা হয়ে গেছে?’

‘তা হয়েছে; তবে আপনি নিজের মতো করুন না। আপনি যে আমাদের কাজে ব্যাঘাত করবেন না সেটা আমি পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানি। আর চারটি তো প্রাণী, ভদ্রলোকের ছেলে, সেক্রেটারি, শ্যালক আর পেশেন্ট। অবিশ্বাস মিসেস মুনসী আছেন। তাঁকে কিছু জিগ্যেস করিনি এখনো।’

আমরা তিনজন শঙ্করবাবুর সঙ্গে দোতলায় রওনা দিলাম। সিড়ি ওঠার সময় ভদ্রলোক একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, ‘অনেক কিছুই আশঙ্কা করছিলাম, কিন্তু এটা করিনি।’

বাবার ঘরে পৌঁছে ফেলুদা বলল, ‘আপনি যখন রয়েছেন তখন আপনাকে দিয়েই শুরু করি।’

‘বেশতো। কী জানতে চান বলুন।’

আমরা সকলে বসলাম। চারিদিকে জন্তু জানোয়ারের ছাল, মাথা ইত্যাদি দেখে মনে হচ্ছিল, এতবড় শিকারী, আর এইভাবে তাঁর মৃত্যু হল।

ফেলুদা জেরা আরম্ভ করে দিল।

‘আপনার ঘর কি দোতলায়?’

‘হ্যাঁ। আমারটা উত্তর প্রান্তে, বাবারটা দক্ষিণ প্রান্তে।’

‘আপনি আজ সকালে বেরিয়েছিলেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘কোথায়?’

আমাদের ডাক্তারের ফোন খারাপ। উনি রোজ ভোরে লেকের ধারে হাঁটেন, তাই ওঁকে ধরতে গিয়েছিলাম। কদিন থেকেই মাথাটা ভার-ভার লাগছে। মনে হচ্ছিল প্রেশারটা বেড়েছে।

‘প্রেশার কি আপনার বাবা দেখে দিতে পারতেন না?’

‘এটা বাবার আরেকটা পিকিউলারিটির উদাহরণ। উনি বলেই দিয়েছিলেন আমাদের বাড়ির সাধারণ ব্যারামের চিকিৎসা উনি করবেন না। সেটা করেন ডাঃ প্রণব কর।’

‘আই সী... একটা কথা আপনাকে বলি শঙ্করবাবু, আপনি যে বলেছিলেন ডাঃ মুনসী আপনার সম্বন্ধে উদাসীন, ডায়রি পড়ে কিন্তু সেরকম মনে হয় না। ডায়রিতে অনেকবার আপনার উল্লেখ আছে।’

‘ভেরি সারপ্রাইজিং!’

‘আপনার ডায়রিটা পড়ার ইচ্ছে হয় না?’

‘অত বড় হাতে লেখা ম্যানুসক্রিপ্ট পড়ার ধৈর্য আমার নেই।’

‘এটা অবশ্য আশা করা যায় যে আপনার বিষয় যেটা সত্যি সেটাই উনি লিখেছেন।’

‘বাবার দৃষ্টিতে যেটা সত্যি বলে মনে হয়েছে সেটাই উনি লিখেছেন। সে দৃষ্টির সঙ্গে আর পাঁচজনের দৃষ্টি নাও মিলতে পারে। আমার বলার ইচ্ছে এই, যে বাবা আমাকে চিনলেন কী করে? তিনি তো সর্বক্ষণ রুগী নিয়েই পড়ে থাকতেন।’

‘আপনার বাবার মাসিক রোজগার কত ছিল সে সম্বন্ধে আপনার কোনো ধারণা আছে?’

‘সঠিক নেই, তবে উনি যে ভাবে খরচ করতেন তাতে মনে হয় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার হওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়।’

‘উনি যে উইল করে গিয়েছিলেন সেটা আপনি জানেন?’

‘না।’

‘গত বছর পয়লা ডিসেম্বর। ওঁর সম্বন্ধে একটা অংশ ব্যবহার হবে মনোবিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে।’

‘আই সী।’

‘আর, আপনার প্রতি উদাসীন হওয়া সম্বন্ধে আপনিও কিন্তু বাদ পড়েননি।’

শঙ্করবাবু আবার বললেন, ‘আই সী!’

‘এই খুনের ব্যাপারে আপনি কোনো আলোকপাত করতে পারেন?’

‘একেবারেই না। এটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।’

‘আর ডায়রিটা যে লোপাট হল?’

‘সেটা ওই তিনজনের একজন লোক লাগিয়ে করতে পারে। বাবার পেশেন্ট হিসাবে এরা এ বাড়িতে এসেছে। বাবা যে ঘরে রুগী দেখেন, তার পাশেই তো আপিস ঘর। সেখানেই থাকত বাবার লেখাটা।’

‘আপনাদের সদর দরজা রাতে বন্ধ থাকে নিশ্চয়ই।’

‘হ্যাঁ, তবে বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে জমাদার ওঠার জন্য একটা ঘোরানো সিঁড়ি আছে।’

‘ঠিক আছে। থ্যাঙ্ক ইউ। আপনি এবার যদি সুখময়বাবুকে একটু পাঠিয়ে দিতে পারেন?’

মিনিট খানেকের মধ্যেই সেক্রেটারি সুখময় চক্রবর্তী এসে হাজির হলেন। ভদ্রলোক আমাদের থেকে একটু দূরে একটা চেয়ারে বসতে ফেলুদা জেরা আরম্ভ করল।

‘আমি প্রথমেই জানতে চাই, পাণ্ডুলিপিটা যে চুরি হল, সেটা কি বাইরে পড়ে

থাকত ?

‘না। দেরাজে ; তবে দেরাজে চাবি থাকত না। তার কারণ আমি বা ডাঃ মুনসী কেউই ভাবতে পারিনি যে সেটা এই ভাবে চুরি হতে পারে।’

‘এটা যে আর দেরাজে নেই সেটা কখন কীভাবে জানলেন?’

‘আজ থেকে ওটা টাইপ করা শুরু করব ভেবেছিলাম। সকালে গিয়ে দেরাজ খুলে দেখি সেটা নেই।’

‘আই সী... আপনি কদিন হল ডাঃ মুনসীর সেক্রেটারির কাজ করছেন?’

‘দশ বছর।’

‘কাজটা পেলেন কী করে?’

‘ডাঃ মুনসী কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।’

‘কী ধরনের কাজ করতে হত আপনাকে?’

‘ওর অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো নোট করে রাখতাম, আর চিঠিগুলোর জবাব টাইপ করতাম।’

‘চিঠি কি অনেক আসত?’

‘তা মন্দ না। বিভিন্ন দেশের মনোবিজ্ঞান সংস্থা থেকে নিয়মিত চিঠি আসত। বাইরের কনফারেন্সে যোগ দিতে উনি দুবছর অন্তর একবার বিদেশ যেতেন।’

‘আপনি বিয়ে করেননি?’

‘না।’

‘আত্মীয়স্বজন আর কে আছে?’

‘ভাইবোন নেই। বাবা মারা গেছেন। আছেন শুধু আমার বিধবা মা আর আমার এক বিধবা খুড়িমা।’

‘এরা এক সঙ্গেই থাকেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘আপনি এঁদের সঙ্গে থাকেন না?’

‘আমি তো এ বাড়িতেই থাকি। ডাঃ মুনসী আমাকে একটা ঘর দেন একতলায়। প্রথম থেকেই এখানে আছি। মাঝে মাঝে গিয়ে বাড়ির খবর নিয়ে আসি।’

‘বাড়ি কোথায়?’

‘বেলতলা রোড ল্যান্ডাউনের মোড়ে।’

‘আপনি এই খুন সম্পর্কে কোনো আলোকপাত করতে পারেন?’

‘একেবারেই না। ডায়রি বেহাত হতে পারে হুমকি চিঠি থেকেই বোঝা যায় ; কিন্তু খুনটা আমার কাছে একেবারে অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে।’

‘ডাঃ মুনসী বস হিসাবে কেমন লোক ছিলেন?’

‘খুব ভালো। আমাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন, আমার কাজে সন্তুষ্ট

ছিলেন, এবং ভালো মাইনে দিতেন।’

‘আপনি কি জানেন ডাঃ মুনসীর বই বেরোলে তাঁর অবর্তমানে বইয়ের স্বত্বাধিকারী হতেন আপনি?’

‘জানি। ডাঃ মুনসী আমাকে বলেছিলেন।’

‘বই ছেপে বেরোলে তার কাঁটতি কেমন হবে বলে আপনার মনে হয়?’

‘প্রকাশকদের ধারণা খুব ভালো হবে।’

‘তার মানে মোটা রয়েলটি, তাই নয় কি?’

‘আপনি কি ইঙ্গিত করছেন এই রয়েলটির লোভে আমি ডাঃ মুনসীকে খুন করেছি?’

‘এখানে যে একটা জোরালো মোটিভের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে সেটা কি আপনি অস্বীকার করবেন?’

‘আমার যেখানে টাকার অভাব নেই সেখানে শুধু রয়েলটির লোভে আমি খুন করব, এটা কি খুব বিশ্বাসযোগ্য?’

‘এর সঠিক উত্তর দিতে যতটা চিন্তার প্রয়োজন, তার সময় এখনো পাইনি। যাই হোক এখন আপনার ছুটি।’

‘কাউকে পাঠিয়ে দেবো কি?’

‘আমি ডাঃ মুনসীর শালার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।’

সুখময়বাবু চলে যাবার পর জটায়ু বললেন, ‘আপনার কি মনে হচ্ছে বলুন তো, ডায়রি লোপাট আর খুনটা সেপারেট ইস্যু, না পরস্পরের সঙ্গে জড়িত?’

‘আগে গাছে কাঁঠাল দেখি, তারপর তো গায়ে তেল দেব।’

‘বোঝো!’

॥ ৬ ॥

শালা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসে হাজির হলেন। কপালের ঘাম মুছতে দেখে মনে হল ভদ্রলোক একটু নার্ভাস বোধ করছেন।

‘আপনার নাম তো চন্দ্রনাথ ; পদবী কী?’ ভদ্রলোক বসার পর ফেলুদা প্রশ্ন করল।

‘বোস।’

‘আপনি এখানে রয়েছেন পনেরো বছর, তাই তো?’

‘হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কী করে...?’

‘আমি ডাঃ মুনসীর ডায়রিটা পড়েছি। আপনার বিষয় অনেক কিছু জানি, তবু আপনার মুখ থেকে কনফার্মেশনের জন্য কতকগুলো প্রশ্ন করছি।’

চন্দ্রনাথ বোস আবার ঘাম মুছলেন।

‘ডাঃ মুনসী আপনাকে এ বাড়িতে থাকতে বলেন?’

‘না। আমার বোন ডাঃ মুনসীকে অনুরোধ করেন।’

‘উনি এক কথায় রাজি হয়ে যান?’

‘না।’

‘তাহলে?’

‘আমার বোন...পীড়াপীড়ি করলে পর...রাজি হন।’

‘আপনিতোকোনোচাকরি-টাকরি করেন না।’

‘না।’

‘হাত খরচা পান মাসে মাসে?’

‘হ্যাঁ।’

‘কত?’

‘পাঁচশো।’

‘তাতে চলে যায়?’

চন্দ্রনাথবাবু উত্তর না দিয়ে মাথা হেঁট করলেন। বুঝলাম হাতখরচটা যথেষ্ট নয়।

‘আপনিতো ইন্টারমিডিয়েট অবধি পড়েছেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘ছাত্র হিসেবে কীরকম ছিলেন?’

‘সাধারণ।’

‘নাকি তার চেয়েও নিচে?’

চন্দ্রনাথবাবু চুপ।

‘প্রথমবার আই. এ-তে ফেল করেননি? সেই কারণেই তো আপনার কোনো চাকরি জোটেনি, তাই নয় কি?’

দৃষ্টি নত করে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন চন্দ্রনাথবাবু।

‘এ বাড়িরকোনো কাজ আপনি করেন কি?’

‘হ্যাঁ।’

‘কী?’

‘বাজার করি। ওষুধপত্র আনি...’

‘বুঝেছি।...আপনার শোবার ঘর দোতলায়?’

‘হ্যাঁ।’

‘কোনখানে? ডাঃ মুনসীর ঘর থেকে কতদূরে?’

‘পাশে।’

‘একেবারে পাশে? লাগালাগি?’

‘ই-ইয়েস।’

‘রাত্রে ঘুমোন কখন?’

‘দশটা সাড়ে দশটা।’

‘আর ওঠেন?’

‘ছ-টা।’

‘এই খুন সম্বন্ধে আপনার কিছু বলার আছে।’

‘নো-নো স্যার। নাথিং।’

‘ঠিক আছে। আপনি এবার অনুগ্রহ করে রাধাকান্ত মল্লিককে একটু পাঠিয়ে দিন।’

রাধাকান্ত মল্লিক এসে সোফায় বসেই এক সঙ্গে হাত আর মাথা নেড়ে বললেন, ‘আমি খুন সম্বন্ধে কিছু জানি না, কিছু না...’

‘আমি কি বলেছি আপনি জানেন?’

‘বলেননি, কিন্তু বলবেন। আই নো ইউ ডিটেকটিভস। এসব জেরা-টেরা আমার ভালো লাগে না। যা বলার আমি বলে যাচ্ছি। আপনি শুনুন। আমি যে ব্যারাম নিয়ে এখানে আসি তার নাম আমি জানতাম না। মুনসী বলেন। পার্সিকিউশন ম্যানিয়া। তার লক্ষণ হল, চারপাশের সব লোককে হঠাৎ শত্রু বলে মনে হওয়া। বাবা, দাদা, পড়শী, আপিসের কোলীগ কেউ বাদ নেই। সবাই যেন ওৎ পেতে বসে আছে। সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। আগে এটা ছিল না; ঠিক কখন যে শুরু হল তাও বলতে পারি না। শুধু এটা বলতে পারি যে শেষ দিকে এমন হয়েছিল যে রাত্তিরে ঘুমোতে পারতাম না, পাছে ঘুমোলে কেউ এসে বুকে ছুরি মারে!’

‘ডাঃ মুনসীর ওষুধে কাজ দেয়?’

‘দিচ্ছিল, তবে সময় লাগছিল। কথা ছিল আর দু’হণ্ডা পরে ছুটি পাব। কিন্তু তার আগেই...ছুটি হয়ে গেল...’

‘আপনি কি এখন বাড়ি ফিরে যাবেন?’

‘পুলিশ যেতে দিলেই যাব!’

‘আপনার চাকরি তো একটা আছে নিশ্চয়ই।’

‘পপুলার ইনশিওরেন্স।’

‘ঠিক আছে। আপনি এবার আসতে পারেন।’

রাধাকান্ত মল্লিক চলে যাবার পর ফেলুদা একবার খুনের জায়গা আর লাশটা দেখে এল। যে জিনিসটা দিয়ে বাড়ি মেরে খুন করা হয়েছে সেটা এখনো ঝুঁজে পাওয়া যায়নি। ইতিমধ্যে পুলিশের ডাক্তার এসে দেখে বলে গেছে খুনটা হয়েছে



‘আপনি কিছু জিগ্যোস করবেন কি?’

দেখে অবাক হলাম যে ভদ্রমহিলার কথায় বিন্দুমাত্র কান্নার রেশ নেই।

ফেলুদা বলল, ‘সামান্য দু-একটা প্রশ্ন।’

ভদ্রমহিলা আবার জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, ‘করুন।’

‘এই হত্যা সম্বন্ধে আপনার কিছু বলার আছে কি?’

‘ওঁর ডায়রীই হল ওঁর কাল। আমি ওঁকে কতবার বলেছি, তুমি লিখছ লেখ, কিন্তু এ জিনিস ছাপিও না। আমাদের দেশের লোকেরা এত সত্যি কথা গ্রহণ করতে পারবে না। অনেকে ব্যথা পাবে, অনেকে অসন্তুষ্ট হবে, আর আজ...’

‘আমি কিন্তু ডায়রীটা পড়েছি। আমার মনে হয় না এটা পড়লে মনে কেউ ব্যথা পেতো।’

‘শুনে খুশি হলাম।’

‘আপনি আর চন্দ্রনাথবাবু যমজ ভাইবোন?’

‘হ্যাঁ।’

‘আপনি যখন ডাঃ মুনসীকে প্রস্তাব করেন আপনার ভাইকে এ বাড়িতে এনে রাখা হোক, তখন উনি কী বলেন?’

‘অনিচ্ছা সত্ত্বেও মত দেন।’

‘অনিচ্ছা কেন?’

‘আমার ভাই কোনো চাকরি করে না সেটা উনি মেনে নিতে পারছিলেন না। উনি নিজে ছিলেন কাজ-পাগলা মানুষ। কাজ ছাড়া আর কিছুই জানতেন না।’

‘অনেক ধন্যবাদ, মিসেস মুনসী। আমার আর কিছু জানার নেই।’

॥ ৭ ॥

ভোর চারটা থেকে পাঁচটার মধ্যে। পাণ্ডুলিপিটা এখনো পাওয়া যায়নি। ইন্স্পেক্টর সোম বলেছেন সেটা বেরোলেই ফেলুদাকে জানিয়ে দেবেন।

‘মিসেস মুনসীর সঙ্গে কি এখন কথা বলা যাবে?’ ফেলুদা জিগ্যোস করল সোমকে।

‘তা যাবে। উনি দেখলাম মোটামুটি শক্তই আছেন।’

আমরা তিনজন মিসেস মুনসীর ঘরে গেলাম। ভদ্রমহিলা জানালার দিকে মুখ করে খাটে বসে আছেন। ফেলুদা দরজায় টোকা মারতে আমাদের দিকে ফিরলেন।

আমি চমকে উঠলাম। ইনি হুবহু ওঁর ভাইয়ের মতো দেখতে! যমজ নাকি?

নমস্কারের পর ফেলুদা বলল, ‘আমার নাম প্রদোষ মিত্র। আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আপনার স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারে তদন্ত করতে এসেছি।’

বাড়ি ফিরতে ফিরতে বারোটা হয়ে গেল। লালমোহনবাবু সকালে স্নান সেরে বেরোন, কাজেই সে সমস্যাটা নেই। তাঁকে বললাম দুপুরের খাওয়াটা আজ এখানেই সারতে। ভদ্রলোক রাজি হয়ে গেলেন।

‘মহীয়সী মহিলা!’ পাখাটা খুলে ফুল স্পীড করে তাঁর প্রিয় কাউচটায় বসে বললেন লালমোহনবাবু, ‘এত বড় একটা ট্র্যাজিডিতে এতটুকু টস্কাননি! অথচ ভাইটা একেবারে গোবর গণেশ।’

‘সেই জন্যেই মহিলার ভাইয়ের উপর এত টান’, বলল ফেলুদা, ‘এ বড় জটিল মনোভাব, লালমোহনবাবু। স্নেহ, অনুকম্পা, এসবতো আছেই; তার মধ্যে কোথায় যেন একটা মাতৃহের রেশ রয়েছে। ভদ্রমহিলার নিজের কোনো ছেলেপিলে নেই, এবং ডাঃ মুনসীর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ছেলের প্রতিও টান নেই, এসব কথা ভুলবেন

না ।

‘তার উপরে যমজ ।’

‘তা তো বটেই ।’

‘আপনার কি মনে হয় ভদ্রমহিলার ডাঃ মুনসীর সঙ্গে বনিবনা ছিল না ?’

‘সেটা মুনসী পরিবারের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা না থাকলে বলা মুশকিল ।

গোয়েন্দাকে যা বোঝার বুঝতে হয় দুটি ইন্ড্রিয়ের সাহায্যে, কান আর চোখ ।’

‘এক্ষেত্রে কান কী বলছে ?’

‘মনে একটা খটকা জাগাচ্ছে ।’

‘কী সেটা ?’

‘সেটা আপনারা কেন বোঝেননি তা জানি না ।’

এবারে আমি একটা কথা না বলে পারলাম না ।

‘তুমি বলতে চাও ওঁর কথা শুনে মনে হল উনি ডায়রিটা পড়েছেন ?’

‘সাবাস, তোপসে, সাবাস ।’

‘কেন মশাই, ডায়রিতে কী ধরনের জিনিস আছে সেটা তো মুনসী মুখেও বলতে পারেন ।’

‘একই হল, লালমোহনবাবু একই হল ।’

মুনসীর কথায় মনে হয়েছিল ওই তিন ব্যক্তির ঘটনা ছাড়া ডায়রিতে কী আছে তা কেউ জানে না । এখন মনে হচ্ছে কথাটা হয়ত ঠিক না ।’

‘তবে এটা তো বোঝাই যাচ্ছে ডাঃ মুনসীর স্ত্রীর প্রতি মোটেই বিরূপভাব পোষণ করতেন না । ডায়রির প্রথম পাতা খুললেই সেটা প্রমাণ হয় । যে স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা নেই, তাকে কেউ বই উৎসর্গ করে না ।’

‘আপনি দেখছি ফর্মে আছেন । ভেরি গুড ।’

‘আরেকটা ব্যাপারে আমি কানকে কাজে লাগিয়েছি মশাই ; আপনি নিশ্চয়ই অ্যাপ্রিশিয়েট করবেন । ডাঃ মুনসীর নিজের ছেলের প্রতি যে মনোভাব দেখিয়েছেন তাতে তাকে শুষ্ক কাষ্ঠং বলে মনে হওয়া আশ্চর্য নয় । কিন্তু সেইখানে দেখুন, তাঁর সেক্রেটারির প্রতি তাঁর কত দরদ !’

‘গুড । গুড ।’ ফেলুদা যে অন্যমনস্ক ভাবে তারিফটা করে সোফা ছেড়ে উঠে পায়চারি আরম্ভ করে দিল ।

‘কী ভাবছেন মশাই ?’ প্রায় এক মিনিট চুপ থেকে প্রশ্ন করলেন জটায়ু ।

ভাবছি যে তিন উহ্য নামের মধ্যে একজনই রয়ে গেল যার আসল পরিচয়টা পাওয়া গেল না । ফলে মামলাটার মধ্যে একটা ফাঁক রয়ে গেল যেটা আর পূরণ হবে না ।’

‘আপনার কি মনে হয় ডাঃ মুনসী কোনো তথ্য—’

ক্রিঃ-৭-৭ !

আমাদের এই নতুন নীল টেলিফোনটার আওয়াজ আগেরটার চেয়ে অনেক বেশি জোর । ফেলুদা রিসিভারটা তুলে ‘হ্যালো’ বলল ।

অবিশ্বাস্য টেলিফোন । যাকে ফেলুদা টেলিপ্যাথি বলে এ হল ষোল আনা তাই । কার সঙ্গে কী কথাবার্তা হল সেটা ফেলুদা ফোন নামিয়ে রেখেই বলেছিল ; আমি যখন ঘটনাটা লিখতে যাব, তখন ও বলল, ‘যদিও তুই ফোনটার সময় শুধু আমার কথাগুলোই শুনেছিলি, লেখার সময় এমন ভাবে লেখ যেন দুই তরফের কথাই শুনতে পাচ্ছিস । তাহলে পাঠক মজা পাবে ।’

আমি ওর কথামতোই লিখছি ।

‘হ্যালো ।’

‘মিঃ মিস্তির ?’

‘হ্যাঁ ।’

‘আমি “আর” কথা বলছি ।’

‘“আর” ?’

‘মুনসীর ডায়রির “আর” ।’

‘ও । তা হঠাৎ আমাকে ফোন কেন ? মুনসীর সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা আপনি জানলেন কী করে ?’

‘আপনি আজ সকালে মুনসীর বাড়ি যাননি ?’

‘তা তো যাবই । মুনসী আজ ভোর রাতে খুন হয়েছেন । সেই কারণেই যেতে হয়েছিল ।’

‘আপনার চেহারা অনেকের কাছেই পরিচিত । সেটা আপনি জানেন বোধহয় । মুনসীর বাড়ির সামনে ভিড় এবং পুলিশ দেখে প্রতিবেশীদের অনেকেই বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল । তাদেরই একজন আপনাকে চিনে ফেলে আমার এক পেশেন্ট । আমিও ডাক্তার সেটা জানেন কি ? এই পেশেন্টের বাড়ি গেসলাম ঘণ্টাখানেক আগে । তারই কাছে শুনি মুনসীর মৃত্যু ও আপনার উপস্থিতির খবর । দুইয়ে দুইয়ে চার করে বুঝি মুনসী আপনাকে এমপ্লয় করেছিল ।’

‘আপনার আসল নামটা জানতে পারি কি ?’

‘না, পারেন না । ওটা উহ্যই থাকবে । আমি জানতে চাই মুন্সী আপনাকে আমার সম্বন্ধে কী বলে ।’

‘উনি বলেন, আপনাকে উনি যথেষ্ট চেনেন এবং আপনাকে নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই । ডায়রিটা বেরুচ্ছে এবং তাতে আপনার অতীতের ঘটনা থাকছে জেনেও নাকি আপনি কোনো আপত্তি করেননি ।’

‘ননসেন্স ! সম্পূর্ণ মিথ্যা । ও আমাকে জানাবে কী করে ? আমি তো পনেরো দিন

বাইরে থেকে কলকাতায় ফিরেছি সবে পরশু রাত্রে। বাড়িতে এসে পুরানো স্টেটসম্যান ঘাঁটতে ঘাঁটতে মুনসীর ডায়রি পেঙ্গুইন ছাপছে এ খবরটা দেখি। খবরটা পড়ে আমার অস্বস্তি লাগে। মুনসী সাইকিয়াট্রিস্ট হওয়াতে অনেক মনোবিকারগ্রস্ত ব্যক্তির হাঁড়ির খবর সে জানে; আমারতো বটেই। সে সব কথা কি সে ডায়রিতে লিখেছে?

‘আমি মুনসীকে ফোন করি। সে স্বীকার করে যে আমার ঘটনা তার ডায়রিতে স্থান পেয়েছে, তবে আমার নাকি চিন্তার কোনো কারণ নেই এই জন্যে যে আমার নামের শুধু প্রথম অক্ষরটা ব্যবহার করা হয়েছে। ...কিন্তু তাতে আমি আশ্বস্ত হব কেন? আমি চব্বিশ বছর আগেও ডাক্তার ছিলাম, এখনও আছি। তখনকার অনেক পেশেন্ট এখনও আমার পেশেন্ট। ডায়রি থেকে তারা আমায় চিনে ফেলবে না তার কী গ্যারান্টি?’

‘আমি কিন্তু ডায়রিটা পড়েছি। আমার মনে হয় আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই।’

‘আপনি যখন পড়েছেন তখন আমিও পড়ব। সে কথাটা আমি মুনসীকে বলি। আমি বলি যে তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না। আমি নিজে তোমার লেখা পড়ে বিচার করব সেটা ছাপলে আমার কোনো ক্ষতি হবে কিনা। তুমি আমাকে লেখাটা দাও। যদি না দাও তাহলে তোমার অতীতের ঘটনা আমি ফাঁস করে দেব।’

‘এ আবার কী বলছেন আপনি?’

‘মিস্টার মিস্তির, আমি আর মুনসী একই বছর লণ্ডনে যাই ডাক্তারি পড়তে। আমার বিষয় যদিও মনোবিজ্ঞান ছিল না, কিন্তু আমাদের দুজনের যথেষ্ট পরিচয় ছিল। আমি মুনসীর যে চেহারা দেখেছি সে চেহারা কলকাতার কেউ দেখেনি। সে সেখানে উচ্ছলে যেতে চলেছিল, আমি তাকে সামলাই, তাকে সোজা পথে নিয়ে আসি। কলকাতায় ফিরে এসে প্র্যাকটিস শুরু করার পর সে ক্রমে ক্রমে নিজেকে সংস্কার করে।’

‘আপনি মুনসীর বাড়ি গিয়ে তাঁর কাছ থেকে লেখাটা চেয়ে আনেন?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ। গতকাল রাত এগারোটায়। বলেছিলাম দুদিন পরে লেখাটা ফেরত দেব। এখন অবিশ্যি তার কোনো প্রয়োজন নেই।’

‘নেই মানে? আপনি পাণ্ডুলিপি ফেরত দিলেই সেটা ছাপা হবে। লেখকের মৃত্যুর পর তার বই ছাপা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। একে ইংরিজিতে পসথ্যুমাস পাবলিকেশন বলে সেটা আপনি জানেন না?’

‘জানি। কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা হবে না। লেখাটা আমি পড়েছি। সেটা আমার কাছেই থাকবে। বই হয়ে বেরোবে না। আসি।’

ফেলুদা রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দিল, তার মুখ গম্ভীর।

‘লোকটা এমন করে আমার উপর টেকা দিল!’ খপ করে সোফায় বসে বলল ফেলুদা। ‘এ সহ্য করা যায় না, সহ্য করা যায় না! ...আর এমন একটা চমৎকার লেখা—এইভাবে বেহাত হয়ে গেল!’

‘লেখাটা নিয়ে ভাববেন না, ফেলুবাবু।’ একটু যেন রাগত ভাবেই বললেন জটায়ু। ‘দ্য খুন ইজ মাচ মোর ইমপট্যান্টি দ্যান দ্য লেখা।’

‘আপনি লেখাটা পড়েও একথা বলছেন?’

‘বলছি। যেখানে মার্ডার হাজ বিন কমিটেড, সেখানে আর ওসব কিছু তার কাছে তুচ্ছ।’

শ্রীনাথ এসে খবর দিল ভাত বাড়া হয়েছে। আমরা তিনজনে খাবার ঘরে খেতে বসলাম। লালমোহনবাবু যদিও বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খেলেন। এমন কি চিংড়ি মাছের মালাই কারিটা খেতে খেতে বললেন, ‘আপনাদের জগন্নাথের রান্নার তারের তুলনা নেই;’ ফেলুদা শুকতো থেকে দই পর্যন্ত একবারও মুখ খুলল না।

খাবার পর তিনজনে তিনটে পান মুখে পুরে বসবার ঘরে বসতেই ফোনটা বেজে উঠল। আমিই ধরলাম। ইন্স্পেক্টর সোম। আমি ফেলুদার হাতে ফোনটা চালান দিলাম। ‘বলুন স্যার’-এর পর ফেলুদা কেবল দুটো কথা বলল। প্রথমে মিনিট খানেক কথা শুনে বলল, ‘তাহলে তো খুনটা বাড়ির লোকে করেছে বলেই মনে হচ্ছে’ আর ফোনটা রাখবার আগে বলল—‘ভেরি ইন্টারেস্টিং আমি আসছি।’

‘কোথায় যাচ্ছ?’ আমি জিগ্যেস করলাম।

‘মুনসী প্যালেস’, টেবিল থেকে চার মিনারের প্যাকেট আর লাইটারটা তুলে পকেটে পুরে বলল ফেলুদা।

‘খুনটা বাড়ির লোকে করেছে কেন বললেন?’ জটায়ুর প্রশ্ন।

‘কারণ নিস্তারিণী ঝি আবিষ্কার করেছে যে একটা হামানদিস্তা মিনিং। এ পারফেক্ট মার্ডার ওয়েপন।’

‘আর ইন্টারেস্টিংটা কী?’

‘মুনসীর একটা ডায়রি পাওয়া গেছে যাতে এ বছরের প্রথম দিন থেকে মারা যাবার আগের দিন পর্যন্ত এনট্রি আছে। ...চলুন বেরিয়ে পড়ি।’

পেঙ্গুইন যে ডায়রিটা ছাপছিল সেটা ১৯৮৯ ডিসেম্বরে শেষ হয়েছে। পুলিশ যেটা পাণ্ডুলিপি ঝুঁজতে ঝুঁজতে মুনসীর শোবার ঘরে পেয়েছে, সেটাতে দৈনিক

এনট্রি আছে ১৯৯০ পয়লা জানুয়ারি থেকে মুনসী মারা যাবার আগের রাত, অর্থাৎ ১৩ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ডায়রিটা সম্ভবত খাটের পাশের টেবিলে রাখা ছিল। সেখান থেকে মাটিতে পড়ে যায়। পুলিশ সেটাকে মাটিতেই পায়।

ডায়রিটা সোমের কাছ থেকে নিয়ে প্রথম পাতা খুলেই ফেলুদার চোখ কিসে আটকে গেল। কিছুক্ষণ ভ্রুকুটি করে পাতাটির দিকে চেয়ে থেকে আবার যেন সস্থিত ফিরে পেয়ে পাশে দাঁড়ানো শঙ্করবাবুকে জিগ্যেস করল। ‘আপনি জানতেন যে আপনার বাবা ডায়রি রাখার অভ্যেসটা শেষদিন পর্যন্ত চালিয়ে গেছেন?’

‘একবারেই না। তবে শুনে যে অবাক হচ্ছি তা নয়, কারণ চল্লিশ বছর একটানা লিখে হঠাৎ বন্ধ করার তো কোনো কারণ নেই।’

‘সুখময়বাবু জানতেন এই ডায়রির কথা?’

‘সেটা ওকেই জিজ্ঞেস করুন।’

আমরা সকলে বসবার ঘরে জমায়েত হয়ে ছিলাম। মিনিট খানেকের মধ্যেই সুখময় চক্রবর্তী এলেন। ফেলুদা প্রশ্ন করতে সুখময়বাবু বললেন, ‘ডাঃ মুনসী ডায়রি লিখবেন এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কিন্তু উনি কাজটা করতেন দিনের শেষে শুতে যাবার আগে। ডায়রিও শোবার ঘরেই থাকত নিশ্চয়ই, এই লাল বই আমি কোনোদিনই দেখিনি।’

‘বসুন।’

সুখময়বাবু দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, ফেলুদা বলতে যেন একটু অবাক হয়েই বসলেন। আমি বুঝলাম ফেলুদা আরো কিছু জিগ্যেস করতে চায়।

‘সুখময়বাবু, বলল ফেলুদা, ‘আপনি নিশ্চয়ই চান যে ডাঃ মুনসীর আততায়ীর উপযুক্ত শাস্তি হোক। তাই নয় কি?’

‘আমার দায়িত্ব, বলে চলল ফেলুদা, ‘হল সেই আততায়ীকে খুঁজে বার করা। একটা কারণে এখন আমরা বুঝতে পারছি যে আততায়ী এই বাড়িতেই রয়েছেন। সেদিন আমি এই বাড়িতে যাঁরা থাকেন তাদের প্রত্যেককে জেরা করেছি। তার ফলে আমি এখনো কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি। হয়ত আমার তরফ থেকেই যথেষ্ট প্রশ্ন করা হয়নি, এবং যাদের প্রশ্ন করেছি তারা আমার সব প্রশ্নের জবাব দেননি। একটা প্রশ্ন আমি সেদিন করিনি, আজ করতে চাই।’

‘বলুন।’

‘একটা ব্যাপারে আমাদের মনে খটকা জেগেছে।’

‘কী?’

‘শঙ্করবাবুর মতে ডাঃ মুনসী তাঁর লেখা এবং পেশেন্ট ছাড়া আর সবকিছু সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। কিন্তু আপনিতো তাঁর পেশেন্টও নন, তাহলে আপনার

প্রতি তিনি এতটা স্নেহবর্ষণ করবেন কেন? ডায়রিতে পড়েছি পাঁচ বছর আগে আপনার অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশন হয়; তাঁর সমস্ত খরচ মুনসী বহন করেন। অপারেশনের পর আপনি দশ দিনের জন্য পুরী যান; সে খরচও তিনি বহন করেন। কেন? এর কোনো কারণ আপনি দেখাতে পারেন? এই পক্ষপাতিত্ব কিসের জন্য?’

‘জানি না।’

উত্তরটা আসতে যে যৎসামান্য দেরি হল সেটা নিশ্চয়ই ফেলুদা লক্ষ করেছে। সেটা তার পরের কথা থেকেই বুঝতে পারলাম।

‘আমি আবার বলছি সুখময়বাবু, আপনি সত্যি কথা বললে, বা গোপন না করলে, আমাদের কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যায়।’

এবারে উত্তরে দেরি হল না।

‘আমি সত্যি বলছি।’

লালমোহনবাবু আমাদের নামিয়ে দিয়ে ‘টুমরো মর্নিং’ বলে গড়পার ফিরে গেলেন। ফেলুদা সোজা তার শোবার ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। বুঝলাম সে ডায়রিতে মনোনিবেশ করবে। ঘড়িতে এখন তিনটে পঁচিশ।

পাখাটা ফুল স্পীড করে দিয়ে সোফায় গা ছড়িয়ে শুয়ে আমি একটা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন খুলে অ্যানটার্কটিকার বিষয় চমৎকার সব ছবি সমেত একট লেখা পড়তে লাগলাম।

সাড়ে চারটায় শ্রীনাথ চা আনল। আমারটা টেবিলের উপর রেখে ফেলুদার ঘরের দরজায় টোকা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ফেলুদা বেরিয়ে এসে বলল, ‘এ ঘরেই চা দাও।’

বুঝতেই পারছি ডায়রিটা পড়া হয়ে গেছে, তাই জিগ্যেস করলাম, ‘কিছু পেলে?’

ফেলুদা কাউচে বসে পকেট থেকে ডায়রি আর চারমিনারের প্যাকেটটা বার করে টেবিলের উপর রেখে গরম চায়ে একটা ছোট্ট চুমুক দিয়ে বলল, ‘তোকে কয়েকটা আইটেম পড়ে শোনাচ্ছি। আমার মনে হয় চিন্তার খোরাক পাবি।’

আমি আগেই লক্ষ করেছিলাম। ডায়রির মাথার দিকটা দিয়ে কয়েকটা ছেঁড়া কাগজ উঁকি মারছে। ফেলুদা কোনোরকম তাড়াহুড়া না করে একটা চারমিনার ধরিয়ে প্রথম টুকরো মার্কে ডায়রিটা খুলল।

‘শোন, এটা তিন সপ্তাহ আগের এনট্রি। আমি ইংরিজি থেকে বাংলা করছি। ‘আজ একটা নতুন পেশেন্ট। রাধানাথ মল্লিক। আমার ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে প্রথমেই পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে হাতের তেলোয় রেখে সেটার দিকে আর আমার দিকে বারকয়েক দেখে কাগজটা দলা পাকিয়ে ওয়েস্ট পেপার

বাস্কেটে ফেলে দিল। ওটা কী ফেললেন জিগোস করাতে ভদ্রলোক বললেন, টেলিগ্রাফের খবর আপনার ছবি সমেত। আমি বললাম, আপনি কি যাচাই করে নিলেন ঠিক লোকের কাছে এসেছেন কিনা? এবারে একটা ছোটখাট বিস্ফোরণ হল। “আমি কাউকে বিশ্বাস করি না, কাউকে না! যাচাই করে নিতে হবে বৈকি!” ...পার্সিকিউশন মেনিয়া।

চার পাতা পরে দ্বিতীয় এনট্রি।

‘শোন—আর. এম-কে. নিয়ে সমস্যা। সে নিজের বাড়িতে একদণ্ড টিকতে পারে না। তার দাদা, তার পড়শী সকলেই তার মনে আতঙ্কের সঞ্চার করছে। ডিফিকাল্ট কেস। আমি বলেছি কাল থেকে যেন সে আমার এখানে চলে আসে। দুটো ঘর তো খালি পড়ে আছে দোতলায়; তার একটোতেই থাকবে।’

তৃতীয় এনট্রি, এটাও দিন চারেক পরে।

‘আর, এম-কে নিয়ে সমস্যা মিটছে না। আজ ওকে কাউচে শোয়ানোর আগে ও আমার আপিসে এসে বসেছিল। আমি তখন বিলেত থেকে সদ্য আসা একটা জরুরী চিঠি পড়ছি। পড়া শেষ করে ওর দিকে চেয়ে একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখলাম। আমার ভারী কাঁচের পেপার ওয়েটটা হাতে নিয়ে ও কেমন যেন অদ্ভুত ভাবে আমার দিকে চেয়ে আছে। ও যদি আমাকেও ওর শত্রুপক্ষ মনে করে তাহলে তো মুশকিল।’

চার নম্বর এনট্রি।

‘আমার ওষুধের শিশিটা ভুল করে আপিস ঘরে ফেলে এসেছিলাম; রাগে শোবার আগে সেটা আনতে গিয়ে প্যাসেজ থেকেই বুঝলাম ঘরে বাতি জ্বলছে। ভেবেছিলাম হয়ত সুখময় কোনো কাজ করছে, কিন্তু গিয়ে দেখি শঙ্কর। সে আমার দিকে পিঠ করে ঝুঁকে পড়ে টেবিলের নীচের দেরাজটা বন্ধ করছে। আমায় দেখে ভারী অপ্রস্তুত হয়ে বলল ওর এয়ার মেল খাম ফুরিয়ে গেছে তাই এখানে আছে কিনা দেখতে এসেছিল। আমি ওকে দুটো খাম দিয়েছিলাম।...ওই দেরাজেই থাকে আমার পাণ্ডুলিপি।’

এরপরে একেবারে শেষ পাতায় শেষ এনট্রি। এর সঙ্গে রাধাকান্ত মল্লিকের কোনো যোগ নেই, আর এটা সত্যিই রহস্যজনক।

‘কী ভুলই করেছিলাম!...যাক, তবু যে ভুলটা ভেঙেছে! কিন্তু “আর” এর জের কি তাহলে অনির্দিষ্টকাল ধরে চলবে? নাকি ওটা নিয়ে অযথা চিন্তা করছি?’

ফেলুদা ডায়রিটা বন্ধ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ‘অদ্ভুত কেস!’

‘তার মানে রহস্যের জট এখনো ছাড়াতে পারনি?’

‘না, তবে কীভাবে প্রোসীড করতে হবে তার একটা ইঙ্গিত পেয়েছি। এবার

কিছু দৈহিক পরিশ্রম আছে। রুটিন এনকোয়ারি। তুই জটায়ুকে ফোন করে বলে দে কাল যেন সকালে না এসে বিকেলে আসেন। সকালে আমি থাকছি না।’

॥ ৯ ॥

ফেলুদা পরদিন সকাল আটটায় বেরিয়ে আড়াইটেয় ফিরল। ও নাকি বাইরেই লাঞ্চ সেরে নিয়েছে। কাজ হল কিনা জিজ্ঞেস করতে ঠিক ভরসা পাচ্ছিলাম না। কারণ ওর মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা লক্ষ্য করছিলাম: তার মানে সাক্সেস না ফেইলিওর সেটা বুঝতে পারছিলাম না।

ফেলুদা সোফায় বসার আগে দুটো ফোন করল, একটা শঙ্কর মুনসীকে, অন্যটা ইনস্পেক্টর সোমকে। দুজনকেই একই ইনস্ট্রাকশন, আগামীকাল সকাল দশটায় সুইনহো স্ট্রীটে বৈঠকে সবাই যেন উপস্থিত থাকে।

এবার একটা চারমিনার ধরিয়ে ফেলুদা সোফায় বসে সামনের টেবিলের উপর পাটা ছড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘আমারও মুনসীর মতো বলতে ইচ্ছা করছে, কী ভুলই করেছিলাম!...রহস্য উদ্ঘাটনের চাবি সবকটা চোখের সামনে পড়ে আছে, অথচ দেখতে পাচ্ছিলাম না।’

আমি একটা কথা না জিগোস করে পারলাম না।

‘অপরাধীকে আমরা চিনি তো?’

‘নিশ্চয়ই’, বলল ফেলুদা। ‘তোমার যখন এত কৌতূহল, তখন আমি তোকে কয়েকটা প্রশ্ন করছি যেগুলোর উত্তর ঠিকমতো দিতে পারলে হয়ত তুই নিজেই সমস্যার সমাধান করতে পারবি।’

আমি চুপ, বুক টিপ টিপ।

‘এক, নতুন ডায়রিটায় লক্ষ্য করার মতো বিশেষ কিছু দেখলি?’

‘একটা ব্যাপারে খটকা লাগল।’

‘কী?’

‘খুনের আগের রাত পর্যন্ত ডায়রি লিখে গেছেন ভদ্রলোক, কিন্তু “আর” আসার কোনো উল্লেখ নেই।’

‘এক্সলেন্ট! দুই, বিসর্জন কথাটা বলতে প্রথমেই কী মনে হয়?’

‘নাটক। রবীন্দ্রনাথ।’

‘হল না।’

‘দাঁড়াও দাঁড়াও! জল...জলে কিছু ফেলে দেওয়া।’

‘শুভ। তিন, নেমেসিস কাকে বলে জানিস?’

‘নেমেসিস?’

‘হ্যাঁ ।’
 ‘ইংরিজি কথা ?’
 ‘উঁহু । গ্রীক ।’
 ‘ওরে বাবা, সে কী করে জানব ?’
 ‘তাহলে শিখে নে । অপরাধ করে যে শাস্তি সাময়িকভাবে এড়িয়ে গেলেও একদিন-না-একদিন ভোগ করতেই হয়, তাকে বলে নেমেসিস । এই নেমেসিস-এরই ভয় পাচ্ছিল “এ”, “জি” আর “আর” ।’
 আমার ব্যাপারটা খুবই ইন্টারেস্টিং লাগছিল, তাই ফেলুদা চুপ করে আছে দেখে বললাম, ‘আরো আছে ?’
 ‘আর একটা বলব । বেশি বললে কালকের নাটকটা জমবে না ।’
 ‘ঠিক আছে ।’
 ‘ফিজিশিয়ান হীল দাইসেল্ফ, মানে জানিস ?’
 ‘এতো ইংরিজি প্রবাদ, ডাক্তার, আগে নিজের ব্যারাম সারাও ।’
 ‘আরেকটা শেষ কথা বলে দিচ্ছি তোকে, “সাজা” কথাটার অনেকগুলো মানে পাবি অভিধানে, তার মধ্যে দুটো মানে নিয়ে আমাদের কারবার ।’
 ‘বুঝেছি ।’
 চা দেবার মিনিট দশেক আগে জটায়ু এসে হাজির । কাউচে বসেই প্রথম প্রশ্ন হল, ‘আমরা কোন স্টেজে আছি ?’
 উত্তরে ফেলুদা ‘মিনার্ভা’ বলে লালমোহনবাবুকে অসম্ভব ভূকুটি করতে দেখে বলল, ‘পেনালটিমেট ।’
 ‘পেনালটি, কী বললেন ?’
 ‘আপনার ইংরিজিটা আর রপ্ত হল না কিছুতেই । পেনালটিমেট মানে লাস্ট বাট ওয়ান ।’
 ‘লাস্ট স্টেজে পৌঁছাচ্ছি কবে ?’
 ‘কাল সকাল দশটায় মুনসী প্যালেসে সর্বসমক্ষে যবনিকা উত্তোলন ।’
 ‘আর পতন ?’
 ‘ধরুন, তার আধ ঘণ্টা বাদে ।’
 ‘চারজনের উপর তো সন্দেহ—’
 ‘হ্যাঁ, ইনি, মিনি, মাইনি, মো ।’
 ‘উঃ, কথায় কথায় আপনার এই প্রগল্ভতা অসহ্য । এইটে অন্তত বলুন যে শঙ্কর, সুখময়, রাধাকান্ত—’
 ফেলুদা হাত তুলে বাধা দিয়ে বলল, ‘আর স্পিক-টি-নট । এইখানেই দাঁড়ি ।’
 ‘আপনি দিন দাঁড়ি । আমার বলা শেষ হয়নি । নাটকের ক্লাইম্যাক্স আমার

হাতে, আপনার হাতে নয় । এটা ওয়ার্নিং দিয়ে দিলুম ।’

‘আপনি যে ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন ।’

‘ভয়ের কিস্যু নেই । আপনার সিংহাসন কেউ টলাতে পারবে না । আর তারিফের সিংহভাগ আপনিই পাবেন তাতে সন্দেহ নেই । কিন্তু সিংহাসনের পাশে একটি ছোট্ট স্পেশাল আসন, আর তারিফের পাশে একটি মিনি-তারিফ, এ দুটো আমার বরাদ্দ থাকবেই ।’

পরদিন ভোরে এক পশলা বৃষ্টি হওয়াতে আমাদের পাড়াতে কিছুটা জল জমেছিল, তাও ঠিক সাড়ে নটার সময় বগলে ছাতা, কাঁধে ঝোলা আর মুখে হাসি নিয়ে লালমোহনবাবু এসে হাজির । ‘তপেশ ভাই’, কাউচে বসে বললেন ভদ্রলোক, ‘জগন্নাথকে বোলো যেন আজ খিচুড়ি করে । নাটকের পর মধ্যাহ্নে ভোজনটা এখানেই সারব ।’

চা খেয়ে দশটার পাঁচ মিনিট আগেই আমরা সুইনহো স্ট্রীটে পৌঁছে গেলাম । আমাদের আগেই পুলিশ হাজির ; ইনস্পেক্টর সোম ফেলুদাকে গুড মর্নিং করে বললেন, ‘আমি আপনার মেথডতোজানি । তাই সকলকেই বৈঠকখানায় জমায়েত হতে বলে দিয়েছি, বেয়ারা বসার ব্যবস্থা করে দিয়েছে, কেবল মিসেস মুনসীরও থাকার দরকার কিনা সেটা জানার ছিল ।’

ফেলুদা মাথা নেড়ে বলল, ‘উনি না থাকাটাই বাঞ্ছনীয় ।’

সবাই যে যার জায়গা নিয়ে বসতে না বসতে এক তলায় বড় ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজল । ফেলুদা উঠে দাঁড়িয়ে একবার চারদিকে দেখে নিয়ে ঘড়ির শেষ ঢং-এর রেশটা মিলিয়ে যেতেই কথা আরম্ভ করে দিল ।

‘আমি প্রথমেই শঙ্করবাবুকে একটা প্রশ্ন করতে চাই ।’

শঙ্করবাবু ঘরের উষ্টোদিকে বসেছিলেন । তাঁর দৃষ্টি ফেলুদার দিকে ঘুরল । ফেলুদা বলল, ‘আমি সেদিন যখন বললাম যে ডাঃ মুনসী তাঁর ডায়রিতে অনেকবার আপনার উল্লেখ করেছেন, তা শুনে আপনি বিস্মিত হন । এবং আমি যখন বললাম যে তিনি আপনার সম্বন্ধে নিশ্চয় সত্যি কথাই বলেছেন । তখন আপনি বেশ বিরক্ত হয়েই বললেন, ‘বাবা আমাকে চিনলেন কবে, কীভাবে তিনিতো তাঁর রূপী নিয়েই পড়ে থাকতেন ।’ শঙ্করবাবু আপনি কেন ধরে নিলেন যে বাবা আপনার সম্বন্ধে অপ্রিয় কথাই বলেছেন ? আমি তো কিছুই বলিনি ।’

‘কারণ বাবা সামনা-সামনি আমার কখনো প্রশংসা করেননি ।’

‘নিন্দে করেছেন কি ?’

‘না, তাও করেননি ।’

‘তাহলে আপনিই বা আপনার সম্বন্ধে ডাঃ মুনসীর প্রকৃত মনোভাব কী করে

জানলেন ?

‘ছেলে তার বাবার মন জানবে না কেন ? সে তো অনুমান করতে পারে ।’

‘বেশ, এবার আরেকটা কথায় আসি । আমি গতকাল দুপুরে একবার আপনাদের এখানে এসেছিলাম । এ বাড়িতে ভৃত্যস্থানীয় যারা আছে তাদের ডেকে ডেকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করি । একটা প্রশ্ন আপনাকে নিয়ে ; সেটার উত্তর দেয় আপনাদের মালি গিরিধারী । প্রশ্নটা ছিল, আপনার বাবার খুনের দিন সে আপনাকে ভোরে বেরোতে দেখেছিল কিনা । মালি বলে, হ্যাঁ দেখেছিল । তখন আমি জিগ্যেস করি আপনি খালি হাতে বেরোন কিনা । উত্তরে মালি বলে, না । আপনার হাতে একটা কালো চামড়ার ব্যাগ ছিল । বর্ণনায় বুঝি সেটা ব্রীফকেস বা পোর্টফোলিও জাতীয় ব্যাগ । এই ব্যাগে কী ছিল সেটা বলবেন কি ?’

শঙ্করবাবু চুপ । তাঁর নিশ্বাস জোরে জোরে পড়তে শুরু করেছে ।

‘আমি বলব কী ছিল ?’ বলল ফেলুদা । শঙ্করবাবু নিরুত্তর । ফেলুদা বলল, ‘ব্যাগে ছিল আপনার বাবার ডায়রির পাণ্ডুলিপি । ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে, বা করার আগে, আপনি সেটা লেকের জলে বিসর্জন দেন তবে তার কারণ’, ফেলুদার গলা চড়ে ওঠে, ‘আপনি ডায়রিটা পড়ে দেখেছেন যে আপনার বাবা আপনার সম্বন্ধে একটিও প্রশংসাসূচক কথা বলেননি । তিনি—’

ফেলুদার গলা ছাপিয়ে শঙ্করবাবু বলে উঠলেন, ‘ইয়েস, ইয়েস ! এই বই ছাপা হলে আমার রোজগারের রাস্তা চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যেত । অলস, উদ্যমহীন, ইরেসপনসিবল, অস্থিরমতি, কী না বলেননি উনি আমাকে !’

‘রাইট’, বলল ফেলুদা । ‘তাহলে এটাও স্বীকার করুন যে সেদিন গলার স্বর পালটিয়ে “আর”—এর ভূমিকা নিয়ে আপনিই আমাকে ফোনটা করে আপনার বাবা সম্বন্ধে বুড়ি বুড়ি মিথ্যে কথা বলেছিলেন, সন্দেহ যাতে আপনার উপর না পড়ে ?’

শঙ্করবাবু দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন, এবার ধপ্ করে বসে পড়লেন ।

“আর”—এর কথাই যখন উঠল’, বলল ফেলুদা, ‘তখন ব্যাপারটা আরেকটু তলিয়ে দেখা যাক ।’

ফেলুদার দৃষ্টি এবার বাঁয়ে বসা সুখময়বাবুর দিকে ঘুরল ।

‘আমি এবার আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই ।’

‘করুন ।’

‘ইংরিজিতে যাকে হাঞ্চ বলা হয়, সেই হাঞ্চের উপর নির্ভর করে আমি গতকাল সকালে একবার সাঁইত্রিশ নম্বর বেলতলা রোডে যাই । সকলের অবগতির জন্য বলছি । এটা হল সুখময়বাবুর বাড়ির নম্বর । আমার মনে হচ্ছিল উনি কিছু তথ্য গোপন করে যাচ্ছেন, এবং হয়ত ওঁর বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা

বললে কিছুটা আলোর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে ।’

ফেলুদার দৃষ্টি ঘুরে গিয়েছিল, এখন আবার ফিরে এল সুখময়বাবুর দিকে ।

‘আপনার মা-র সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি আপনার বাবার মৃত্যু হয় চব্বিশ বছর আগে, গাড়ি চাপা পড়ে ।...এই তথ্যটি কি ডাঃ মুনসী জানতেন ?’

দৃষ্টি মেঝে থেকে না তুলেই উত্তর দিলেন সুখময়বাবু ।

‘জানতেন । ইন্টারভিউ-এর সময়, আমার বাবা সাঁইত্রিশ বছর বয়সে মারা যান জেনে ডাঃ মুনসী জিগ্যেস করেন কিসে তাঁর মৃত্যু হয় ।’

‘খুব সতর্ক লোকেরও কেমন ভুল হয় তার একটা উদাহরণ দিই । শঙ্কর মুনসী যখন আমার বাড়িতে আসেন তখন তিনি নিজের পরিচয় দিতে বলেন যে তিনি ডাঃ রাজেন মুনসীর ছেলে । এই রাজেন নামটা আমার মাথা থেকে বেমালুম লোপ পেয়ে যায় ; যেটা থেকে যায় সেটা হল “ডাঃ মুনসী” । কাল ওঁর লাল ডায়রি খুলে প্রথম পাতাতেই “আর মুনসী” দেখে আমি চমকে উঠি । তাহলে কি ডাঃ মুনসী নিজেই তাঁর ডায়রির “আর”, এবং তিনিই গাড়ি চাপা দিয়ে লোক মেরে চতুর্দিকে ঘুষ দিয়ে আইনের কবল থেকে নিজেকে বাঁচান, আর সেই মৃত ব্যক্তিরই ছেলে তাঁরই কাছে আসে চব্বিশ বছর পরে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে ?’

‘ভুল, ভুল, ভুল !’ চোঁচিয়ে উঠলেন সুখময়বাবু । ‘আমার বাবাকে যিনি চাপা দেন তাঁর উপযুক্ত শাস্তি হয় ।’

‘সে কথা কি ডাঃ মুনসী জানতেন ?’

‘না । তাঁর ধারণা ছিল তিনিই আমার বাবার মৃত্যুর জন্য দায়ী । আসল ঘটনা তিনি জানতে পারেন মৃত্যুর আগের দিন ।’

‘কীভাবে ?’

‘উনি আমাকে ডেকে বলেন যে ওঁর একটা স্বীকারোক্তি করার আছে যেটা না করলে উনি শাস্তি পাবেন না । স্বীকারোক্তিটা কী জানতে পেরে আমি বলি, ডাঃ মুনসী, আপনি ভুল করছেন ; আমার বাবাকে যিনি চাপা দেন তাঁর শাস্তি হয়েছিল । কথাটা শুনে উনি স্তম্ভিত হয়ে যান । আর আমিও বুঝতে পারি কেন তিনি আমার উপর এত সদয় ছিলেন ।’

ঘরের উল্টোদিক থেকে একটা ছোট্ট, শুকনো হাসি শোনা গেল । শঙ্করবাবু ।

‘কিছু বলবেন ?’ ফেলুদা জিগ্যেস করল ।

‘না বললে আপনি আরো বেশি ভুল পথে গিয়ে পড়বেন ।’

‘মানে ?’

‘আমার বাবা জীবনে কখনো গাড়ি চালাননি ।’

‘সে তথ্য আমার অজানা নয়, শঙ্করবাবু । মালির সঙ্গে কথা বলার পর আপনার ড্রাইভারের সঙ্গে আমার কথা হল ।’

‘সে কী বলে?’

‘ত্রিশ বছর সে আপনাদের ড্রাইভারি করছে, তার মধ্যে সে মাত্র একটা অ্যান্ড্রিডেন্ট করেছে। তাতে আপনার বাবার তাড়া ছিল বলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জনবহুল রাস্তায় তাকে জোরে গাড়ি চালাতে হচ্ছিল। তাই যখন দুর্ঘটনাটা ঘটে তখন ডাঃ মুনসী খানিকটা নিজেকেই দায়ী করেন। ড্রাইভারের যাতে দণ্ড না হয় তার জন্য তিনি যা করবার সবই করেছিলেন। তা সত্ত্বেও ড্রাইভারের অনুতাপ আর আতঙ্ক কিছুতেই যাচ্ছিল না। তখন ডাঃ মুনসী তার চিকিৎসা করে তাকে ভালো করে তোলেন। অর্থাৎ আপনার বাবা ডায়রিতে একটুও মিথ্যে লেখেননি। এবং “আর” হচ্ছে নট রাজেন মুনসী, বাট ড্রাইভার রঘুনন্দন তেওয়ারি।’

‘বাট হু কিল্ড মাই ফাদার?’ অসহিষ্ণুভাবে চৈঁচিয়ে উঠলেন শঙ্কর মুনসী।

‘এসব ব্যাপারে একটু ধৈর্য ধরতে হয়, মিঃ মুনসী,’ গভীর স্বরে বলল ফেলুদা। তারপর মুনসীর দিক থেকে তার দৃষ্টি ঘুরে একটি অন্য ব্যক্তির উপর গিয়ে পড়ল। ‘এ ঘরে একজন ব্যক্তি আছেন যাকে আমরা অসুস্থ বলে জানি,’ বলল ফেলুদা। ‘এর আগে তিনি দুবার আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন, এবং দুবারই নানান অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে নিজেকে অসুস্থ বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। আজ তাঁকে দেখছি তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষের চেহারা নিয়ে আমার ভাষণ শুনছেন। মিঃ মল্লিক—আপনি কি আপনা থেকেই সেরে গেলেন?’

রাধাকান্ত মল্লিক হঠাৎ যেন শক্ খাওয়া মানুষের মতো চমকে উঠলেন।—‘কী—কী বলছেন বলুন।’

‘বলছি যে আমার জেরায় সকলেই অল্পবিস্তর মিথ্যা বলেছেন বা সত্য গোপন করে গেছেন, কিন্তু আপনি সবাইকে টেক্সা দিয়েছেন।’

মল্লিক এখনো এক দৃষ্টি ফেলুদার দিকে চেয়ে, তার মনের ভাব বোঝার কোনো উপায় নেই। ফেলুদা বলল, ‘আপনি বলেছিলেন পপুলার ইনশিওরেন্সে কাজ করেন। আমি সেটা ভেরিফাই করতে সেখানে গিয়েছিলাম। গিয়ে শুনলাম আপনি আর সেখানে নেই, চার মাস হল ছেড়ে দিয়েছেন। আপনি কি তাহলে বেকার। না অন্য কোথাও কাজ করছেন? ইনশিওরেন্সি অফিসে এ প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারল না বলে আপিস থেকেই আপনার বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। সতীশ মুখার্জী রোড, তাই না?’

মল্লিক এখনো চূপ, তার দৃষ্টি সামনের দিকে।

‘সত্য, এ মামলায় বিশ্বাসের শেষ নেই,’ বলে চলল ফেলুদা। ‘আপনি ডাঃ মুনসীকে বলেছিলেন আপনার বাবা, আপনার দাদা, সকলেই আপনার মনে আতঙ্কের সঞ্চার করেছে। অথচ আপনার বাড়ি গিয়ে দেখি আপনার বাবা দাদা, কেউই নেই। বাবা মারা গেছেন প্রায় পঁচিশ বছর হল, আর দাদা বলে কেউ

কোনোদিন ছিলই না। আপনার বিধবা মার কাছ থেকে জানি যে আপনি একটা যাত্রা কোম্পানিতে যোগ দিয়েছেন এবং বর্তমানে টুরে আছেন।’

এবারে রাধাকান্ত মল্লিক মুখ খুললেন।

‘আমি যে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির এটা আমি কোনোদিনই ক্রেম করিনি। কিন্তু আপনি কী বলতে চান? আমি খুন করেছি?’

‘আমি ধাপে ধাপে এগোই, মল্লিক মশাই, লাফে লাফে নয়। আপনি খুনী কিনা সে ব্যাপারে পরে আসছি; প্রথমে দেখছি আপনি প্রবঞ্চক। মনোবিকারের অভিনয় করে আপনি মুনসীর কাছে এসেছিলেন চিকিৎসার জন্য। আপনি—’

‘কেন এসেছিলাম সেটা জানেন আপনি?’ ফেলুদাকে বাধা দিয়ে জোরালো গলায় বললেন মল্লিক।

‘এটা আপনার মা-র কাছ থেকে জানি যে আপনার বাবা গাড়ি চাপা পড়ে মারা যান, যিনি চাপা দেন তাঁর কোনো শাস্তি হয়নি, এবং গাড়ির মালিক এসে আপনার মা-র হাতে পাঁচ হাজার টাকা তুলে দেন ক্ষতিপূরণ হিসেবে।’

‘ইয়েস!’ চৈঁচিয়ে উঠলেন রাধাকান্ত মল্লিক। ‘তখনই দেখি আমি ভদ্রলোককে, আর তারপরে ছবি দেখি কাগজে এই সেদিন। সেই একই চেহারা, আর দেখেই স্থির করি যে একে বাঁচতে দেওয়া চলে না। কল্পনা করতে পারেন? একটি বারো বছরের ছেলে, বাবার পিছনে পিছনে ট্রাম থেকে নামছে। চোখের সামনে বাবা মোটরের তলায় তলিয়ে গেল! ওঃ, কী ভয়ংকর দৃশ্য! আজও মনে পড়লে শরীর শিউরে ওঠে। মাসের পর মাস ধরে মা-কে জিগ্যেস করেছি, যে লোকটা বাবাকে চাপা দিল তার শাস্তি হবে না? ‘বড় লোকদের শাস্তি হয় না! বাবু, বড় লোকেরা পার পেয়ে যায়।’...আর তারপর হঠাৎ খবরের কাগজে ছবি! এক মুহূর্তে মনস্থির করে ফেলি। এর শাস্তি হবে। আর সে শাস্তি দেব আমি!’

‘তারপরেই মনোবিকারের অভিনয় করার সিদ্ধান্ত?’

‘হ্যাঁ, কিন্তু খুন করা যে এত কঠিন কে জানত? বুঝতে পারছিলাম এ জিনিস চট করে হবার নয়; সময় লাগবে আমার মনকে শক্ত করতে। শেষকালে মন শক্ত হল, অস্ত্র জোগাড় হল... মুনসীরই আপিস ঘরের একটা পেপার নাইফ। বাবার দেহ থেকে যে রক্ত বেরোতে দেখেছি। তাঁর হত্যাকারীর দেহ থেকেও রক্তপাত না হলে উপযুক্ত শাস্তি হবে না। তারপর—’

‘তারপর কী, মল্লিকমশাই?’

‘অদ্ভুত ব্যাপার, অদ্ভুত ব্যাপার! ছোরা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকেছি। পশ্চিমের জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে মুনসীর উপর পড়েছে। মুখ হাঁ, আধ খোলা চোখে নিশ্চরণ চাউনি। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ নেই! আমি খুন করব কি? সে

লোক তো অলরেডি, ডেড, ডেড, ডেড !

তৃতীয় 'ডেড' কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে একটা ধূপ করে শব্দ হল। সেটার কারণ হচ্ছে ডাঃ মুনসীর শালা চন্দ্রনাথবাবু। তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে চেয়ার থেকে উঠে মেঝেতে পড়েছেন।

সোম তাঁর দিকে দৌড়ে গেলেন। আর সেই সঙ্গে ফেলুদা বলে উঠল, 'দেখে নিন, মিঃ মুনসী। আপনার মামা, আপনার মা-র যমজ ভাই। হি কিল্ড ইওর ফাদার !'

'মানে ?' হঠাৎ থাকতে না পেরে চৈঁচিয়ে উঠলেন জটায়ু 'মোটিভ ?' ফেলুদার দৃষ্টি আবার শঙ্করবাবুর দিকে গেল। 'আপনি বলতে পারেন না, শঙ্করবাবু ? আপনি তো ডায়রিটা পড়েছেন ?'

শঙ্করবাবু ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

'মানুষকে চেনা অত সহজ নয়, শঙ্করবাবু', বলল ফেলুদা। 'জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের আসল তফাত, জানোয়ার ভান করতে জানে না, অভিনয় জানে না, মনের ভাব লুকোতে জানে না। ...ডাঃ মুনসী আপনার মা সম্বন্ধে মোটেই উদাসীন ছিলেন না। থাকলে ডায়রিটা তাঁকে কখনই পড়তে দিতেন না। কখনই সে ডায়রি তাঁকে উৎসর্গ করতেন না। ব্যাপারটা আসলে উষ্টো। ওদাসীন্য যদি কারুর তরফ থেকে হয়ে থাকে তিনি হলেন আপনার বিমাতা, যিনি তাঁর সমস্ত স্নেহ, ভালোবাসা, চিন্তা, ভাবনা, ঢেলে দিয়েছিলেন তাঁর অকর্মণ্য ভাইয়ের উপর।'

...এবার খুনের মোটিভটা কী? সেটা কি একবার সমবেত সকলকে বলবেন? প্রায় যান্ত্রিক মানুষের মতো কথা বেরোল শঙ্করবাবুর মুখ থেকে।

'বাবার উইলে চার ভাগ পাবে মনস্তাত্ত্বিক সংস্থা, চার ভাগ আমি, আর আট ভাগ আমার মা।'

ইতিমধ্যে মিঃ সোমের পরিচর্যায় চন্দ্রনাথবাবুর জ্ঞান ফিরেছে। ফেলুদা তাকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করল, 'খুন করার সিদ্ধান্ত কি আপনার ?'

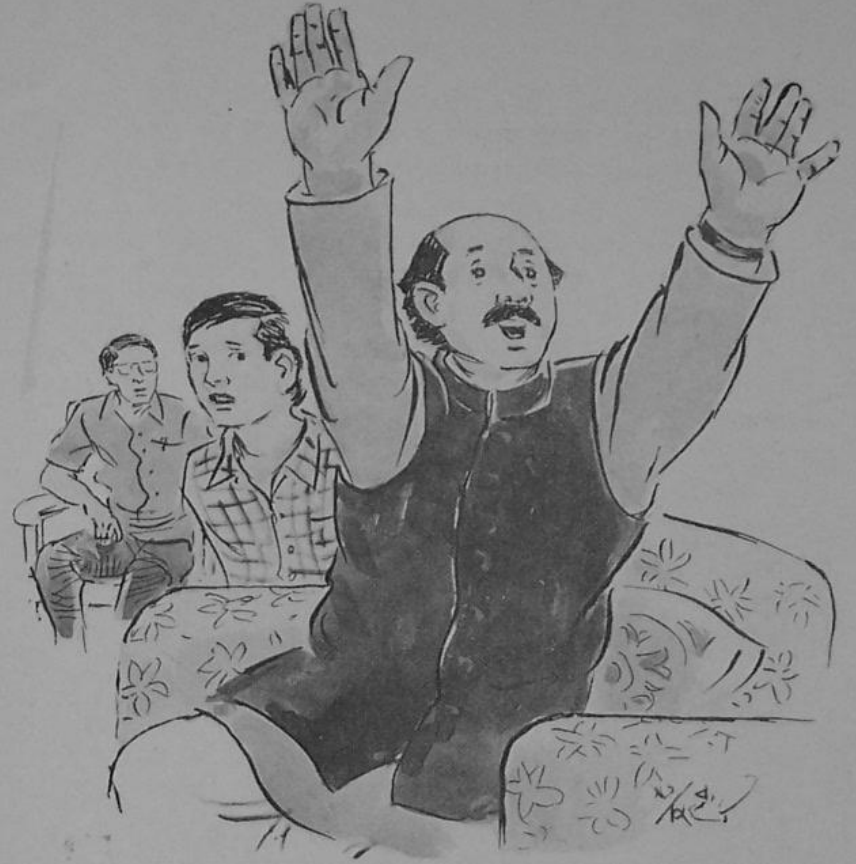
চন্দ্রনাথবাবু মাথা নাড়ালেন, তাঁর দৃষ্টি মেঝের কার্পেটের দিকে। একটা দীর্ঘশ্বাসের পর কথা বেরোল, এত স্কীণ, যে বেশ কষ্ট করে বুঝতে হয়।

'না। সিদ্ধান্ত... ডলির। ডলিই আমার হাতে... হামানদিস্তা তুলে দেয় !'

'হুঁ, বুঝছি।' ফেলুদা যেন বেশ ক্লান্তভাবেই চেয়ারে বসে পড়ল। 'শুধু একটা আপসোস, গভীর আপসোস... ডায়রিটা বেরোলে নিঃসন্দেহে সাহিত্যিক হিসাবে ডাঃ মুনসীর সুনাম হত। সেই ডায়রি এখন সলিলগর্ভে !'

'অ্যাটেনশন ! স্পটলাইট !'

ঘর কাঁপিয়ে সবাইকে চমকে দিয়ে চৈঁচিয়ে উঠলেন জটায়ু। সবাই তাঁর দিকে



দেখছে দেখে একটা অদ্ভুত হাসি হেসে কাঁধের ঝোলা থেকে একটানে একটা ফাইল বার করে সেটাকে মাথার উপর তুলে ঝাঙার মতো নাড়াতে নাড়াতে বললেন, 'জলে যায়নি ! জলে যায়নি ! হিয়ার ইট ইজ !'

'ডাঃ মুনসীর পাণ্ডুলিপি ?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল ফেলুদা। 'সেটা কী করে হয় ?'

'ইয়েস স্যার ! থ্যাঙ্কস টু বিজ্ঞানের অগ্রগতি। একদিনে পড়া হবে না বলে এটা জিরঞ্জ করিয়ে রেখেছিলাম, জিরঞ্জ ! এক্স ই আর ও এক্স !... নিন সুখময়বাবু, টাইপিং শুরু করে দিন, শেষ হলে পর সোজা নর্থ পোল !'

এখানে অবিশ্যি একটা জটায়ু মার্কা ভুল হল, পেঙ্গুইন নর্থ পোলে থাকে না, থাকে সাউথ পোলে।